রঙীন ফানুস

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আড়াই টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নমো নারায়ণায়

কল্যাণীয়া

কুমারী শ্রীমতী অপরাজিতা রায়

নিরাপদাসু

হের খুকু,

কলেজের পাঠশ্রম-শ্রান্ত, রুগ্ন দুর্ব্বল দেহের দারুণ অবসন্নতা পেক্ষা করে,—সেই জ্যৈষ্ঠের ঠিক-দুপুরে চুঁচ্‌ড়া থেকে মেমারি ছুটে সেছিলে,—এই অপদার্থ মাসিমাকে দেখ্‌তে! মনে পড়ে সে দিনের থা? ·কাহিল মেয়ের দুঃসাহসে আমি যখন ভয়ত্রস্ত, শুশ্রূষার আয়োজনে দ্বগ ব্যস্ত,—হতবুদ্ধি হয়ে দেখি মেয়ে-আমার তখন পরম নিরুদ্বেগে,—ঙীন ফানুসের" অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি পাঠে তন্ময় বিভোর! আজও ন পড়ে সেই অবসাদক্লান্ত ছোট্ট মেয়েটির—অপূর্ব্ব সুন্দর ধ্যানমগ্নতার বি! ধন্য আমি, সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি!

অন্তর ভরা স্নেহের সঙ্গে আজ "রঙীন ফানুস" তোমার নামে সর্গ করছি।

আশীর্ব্বাদ করি, জীবনের মহৎ কর্ত্তব্যক্ষেত্রে নিজগুণে মহত্তর ও। তোমাদের জ্ঞানসাধনা যেন বিশুদ্ধ চিত্তে অনুষ্ঠিত—সুন্দর যোগে পূর্ণ সাফল্য লাভ কর। দীর্ঘায়ু হও। ইতি—

একান্ত শুভার্থিনী

তোমাদের আদরের

'সন্ন্যাসিনী মাসিমা'

শ্রাবণ। ১৩৪১

মেমারি।

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৯	১৬	হয়ে রয়ে	হয়ে বয়ে
১৮৬	২৪	সও	সেও
১৮৯	১৯	তোমার এই	তোমার চেয়ে এই
২৪০	১৯	রঙ্গিত	বঞ্জিত
২৬৬	৮	তাচ্ছীল্যের	তাচ্ছল্যের
২৭০	৪	তাচ্ছীল্য	তাচ্ছল্য
২৭৭	১৭	জল	ড'লে
৩০৫	১১	ঘমাইত	ঘুমাইত
৩১৫	১২	তাহার বিলাসিতা	আহার বিলাসিতা

রঙীন ফানুস

১

ফাল্গুন সুরু হইয়াছে।

উত্তর বিহারে পাহাড়ে-শীত তখনও যথেষ্ট। এই কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যা, তায় আকাশে অকালমেঘগাম্ভীর্য্যের ঘটা। কোলাহলমুখর নগরের বুকে অলস বিষাদভরা স্বপ্নজাল বিছাইয়া কুয়াশার মত হিম ঝরিতেছে।

অদূরে জনতা-বহুল গয়া ষ্টেশন।

রেল কর্ম্মচারী বাবুদের বাসার পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে মনোরমা চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "বাবাঃ, কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যা রাতেই আজ সব নিঝুম।"

সঙ্গিনী বিহারী-দাসী সভয়ে বলিল, "যেতে ডর্ লাগছে।"

"সঙ্গে আছি ত। ভয় কি?"—নির্ভীক দৃঢ়তায় উত্তর দিয়া মনোরমা স্নিগ্ধ স্বরে জানাইল "কাকাবাবু এখানে কতকাল আছেন। আমাদের সবাই চেনে। চলো ত।"

মনোরমার বয়স আঠারো উনিশ। নিঃসন্তান, বিধবা। অতি সুন্দরী, সুশ্রী আকৃতি। সুকোমল মুখে দ্বিধাহীন স্নেহভরা পবিত্র সরলতা। দৃষ্টিতে অকুণ্ঠিত করুণা দীপ্তি। দেখিলে মনে হয়, সুগভীর সহৃদয়তায়

সে সকলের আপন জন। কিন্তু দুর্ব্বলতায় সকলের সমান নয়। একটা অদৃশ্য সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যের দৃঢ় আবেষ্টনে মেয়েটি আপাদমস্তক সুরক্ষিত। সে স্বাতন্ত্র্যের সীমা লঙ্ঘনের সাহস কোনো মূঢ় [illegible]তার নাই।

দাসীর বয়স বাইশ তেইশ। বিহারী-সুলভ লম্বা চওড়া সবল দেহ। কোমল ক্ষীণাঙ্গী, বাঙালী তরুণীর পাশে সে মূর্ত্তি অনেকটা কঠিন কর্কশ দেখাইতেছিল। শ্যাম বর্ণ। সুগঠিত মুখ। চোখে মুখে বুদ্ধি-হীনতা-ব্যঞ্জক শ্রান্ত নির্জ্জীবতা। সঙ্গে সঙ্গে কোমল ভাবপ্রবণতার আবেশ। ন্যায় অন্যায়ের, যুক্তি তর্কের বিচার বিশ্লেষণ, যাহারা মস্তিষ্কের জোরে পারে না, যাহাদের হৃদয়বৃত্তি অতি বেগবান, প্রবৃত্তির আকর্ষণে সহজে বিক্ষিপ্ত-চেতা হয়, এই নারী সেই শ্রেণীর জীব।

মেয়েটির পরণে শাড়ী, কুর্ত্তা। গলায় রূপার হাঁসুলি, হাতে কাঁসার চুড়ি। মুখে, হাতে উল্কির কারুকার্য্য। রুক্ষ কেশপাশ অযত্ন বিশৃঙ্খল। একটা আধ ময়লা মোটা গায়ের কাপড়ে বুক পিঠ মাথা ঢাকা। সিঁথিতে সিঁদুর নাই। বোঝা যায় অভাগিনী অকালে পতিহীনা।

মনোরমা নিরাভরণা। ফ্লানেলের মোটা সেমিজ, মটকার থান, ও কাল রঙের শালে দেহ আবৃত।

চলিতে চলিতে মনোরমা বলিল, "কি ঠাণ্ডা, পা দু'খানা যেন কেটে নিচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে বাবুয়ার মা?"

"না। ডর্ লাগ্‌ছে, বড় আঁধার।"

"লণ্ঠনটা উস্কে দাও।"

পিছনের পথে 'লোহার নাল' বাঁধানো নাগ্‌রা জুতার শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণে পথের এক পাশ ঘেঁষিয়া নতশিরে তাহাদের অতিক্রম করিয়া, একজন পথিক দ্রুতপদে আগে আগে চলিল।

পাশের বিদ্যুৎ বাতির আলো লোকটির উপর পড়িল। মনোরমা সাগ্রহে বলিল "থন্তর, নয় ?"

"জী, হাঁ।" অন্যমনস্ক পথিক চমকিয়া দাঁড়াইল।

পেশী-সবল সুগঠিত যুবা-মূর্ত্তি। মুখে সচ্চরিত্র সংযমী ভদ্রজনোচিত স্নিগ্ধ লালিত্য। দেখিলে মনে হয় লোকটি স্বভাবতঃ শান্ত নম্র, উন্নত প্রকৃতির মানুষ। চোখে মুখে বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বস্ততার উজ্জ্বল দীপ্তি। বোঝা যায়, এ শ্রেণীর মানুষের উপর সহজেই বিশ্বাস নির্ভরতা রাখা চলে।

লোকটির পরণে আসন্ন বসন্তোৎসব নির্দ্দেশক,—গোলাপী রঙের ধূতি, পাঞ্জাবী। মাথায় বাসন্তী রঙের বৃহৎ মুরেঠা। পায়ে মজবুত নাগরা। কাঁধে লাঠি।

আয়ত উজ্জ্বল চোখে চাহিয়া লোকটি স্মিত মুখে বলিল, "কে মুন্না বাবা ? দিদিমণি ? কোথা গিয়েছিলে ?"

"বুড়ো মেমের সঙ্গে দেখা করতে। সেই কালো মেম, ছোটবেলা মিশন স্কুলে যাঁর কাছে পড়েছি। শরীর ভাল নেই, কাল চলে যাচ্ছেন। পুরানো ছাত্রীরা অনেকেই দেখ তে গেছ্ল।"

"তার পর ? এ দিকে কোথা ?"

"ছোটবাবুর স্ত্রীর অসুখ। দেখে যাই একটু। অনেকদিন পরে তোমায় দেখলুম। আছ কেমন ?"

কুশল প্রশ্ন বিনিময় হইল। দাসীর দিকে একটা অস্পষ্ট উপেক্ষা-দৃষ্টি হানিয়া, থন্তর নিজের ক্ষৌর মসৃণ গালে হাত বুলাইয়া সসঙ্কোচে নিম্ন স্বরে বলিল, "সঙ্গে কান্‌হাইয়ালালকে আননি কেন ?"

কানহাইয়ালাল মনোরমাদের পুরাতন প্রৌঢ় চাকর।

অপ্রসন্ন মুখে মনোরমা বলিল, "সে বাপু দিনে দিনে যা হচ্ছে,—ভদ্র সমাজের অযোগ্য ! আজ সন্ধ্যায় মদ গিলে পাশের বাড়ীর চাকরটার

সঙ্গে ঝগড়া জুড়েছে। কাকাবাবু বাসায় নেই, কাকে ভয় করবে? পুরানো লোক, ঢের সওয়া গেছে। ওকে তোমাদের রেল কোম্পানির টিকিট কালেক্টার করে দাও। দিব্যি গুণ্ডামি করে যাত্রীদের জ্বালিয়ে খাবে, খোশনাম পাবে।”

বলিয়া স্মিত মুখে হাসিল। গ্রাম সম্পর্কে কানহাইয়ালাল খশুরের 'নানা'। নানার উপদ্রবে অনেক বিদ্রূপ তাহাকে সহিতে হয়।

লাঠিতে ভর দিয়া খশুর স্মিতমুখে ঋজু হইয়া দাঁড়াইল। মাতামহের পদোন্নতির দায়িত্ব গ্রহণে কোন আপত্তি জানাইল না। বলিল, "ঘরে যাচ্ছি। চল তোমাদের পৌঁছে দিয়ে যাই।”

“বাঁচলুম। এ বেচারা নতুন লোক, যেতে ভয়ে থতমত খাচ্ছে। মানুষের মত কেউ একজন সঙ্গে না থাক্‌লে পথ চলা মুস্কিল।”

স্পষ্ট স্বীকারোক্তি! রাগের মাথায় সঙ্গে আনিলেও দাসীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে মেয়েটির ভরসা নাই।

খশুর নিঃশব্দে হাসিল। গয়ালী পাণ্ডাদের প্রতাপ এখন ইংরাজ শাসনে সংযত। সন্ধ্যায় সজাগ ষ্টেশনের পথে ভয়ের আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ যাহার কাকা ষ্টেশনের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী।—বাবুদের গৃহিণীরাও এমন সময়ে পায়ে হাঁটিয়া পাড়া ঘরে বেড়াইতে যান, দোষ নাই। কিন্তু মনোরমার মত অবস্থার একটি অল্প বয়সী মেয়ের···পক্ষে?

ছিদ্রান্বেষী লোক-সমাজের সন্দিগ্ধ ক্রূর দৃষ্টির আক্রমণ জানা আছে। অসংযত-প্রকৃতি মানুষের কুৎসিত কল্পনার দৌড়,—ঘৃণ্য ভাষার নিষ্ঠুর আঘাত, দুর্দ্দান্ত পাপীকে ছুঁইতে ডরায়। কিন্তু দুর্ব্বল, নিরীহ, নিষ্পাপকে অসঙ্কোচ-ক্রূরতায় পিষিয়া মারে। এইত পৃথিবীর নিয়ম!

অসতর্ক মেয়েটিকে নিজের সুনাম রক্ষায় সচেতন করা উচিত।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া খশুর বিনয়নম্র স্বরে বলিল, “সন্ধ্যার পর

বেরুলে, গিন্নিবান্নি মানুষদের সঙ্গে একটা চাকর নিয়ে বেরিও বাবা। মেয়েমানুষ তুমি···। দাও ত লণ্ঠনটা।”

দাসীর দিকে ফিরিয়া, হাত বাড়াইল।

মুহূর্ত্তে চমকাইল! অচেনা নারী ব্যগ্র কৌতূহলে তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছে! অদ্ভুত বুভুক্ষাভরা বিহ্বল খেয়ালি দৃষ্টি! এ কি শিশু? না অপ্রকৃতিস্থ উন্মাদ?

একটু বিরক্ত বিব্রত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইল। অচেনা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে অসঙ্কোচ ব্যবহারে সে অনভ্যস্ত। তার পর ঐ দৃষ্টিতে এমন অদ্ভুত কিছু দেখিল, যা না দেখিলেই স্বস্তি পাইত।

থতমত খাইয়া নিজের পানে চাহিল। কি দেখিতেছে নারী?···বত্রিশ বৎসরের ঝড় ঝঞ্ঝা সহিষ্ণু এই যুবা দেহটা? না রঙীন সাজ পোষাক?

মনে মনে লজ্জিত হইল।··দোষ নিজের! এ বেশে বন্ধুদের সঙ্গে হৈ চৈ করা চলে, মেয়েদের সামনে দাঁড়ানো উচিত নয়। উহাদের কৌতূহলী চোখে সহজেই কৌতুক জাগে।

কিন্তু মনোরমা?

আঃ, এ তো ঘরের মেয়ে! এতটুকু বেলা হইতে যাহাকে বুকে পিঠে লইয়া মানুষ করিয়াছে, তাহার কাছে এ সব তুচ্ছ ত্রুটি ক্ষমার্হ! হয়ত সে লক্ষ্যই করে নাই।

হঠাৎ মনোরমার দিকে ফিরিয়া কৈফিয়ৎ চ্ছন্দে বলিল “আজ পাহাড়ে গিয়েছিলাম বাবা।”

পশ্চিমাসুলভ অভ্যাস বশে, ইহারা অকারণে ব্যাকরণ বহির্ভূত রীতিতে “বাবা” শব্দটা ব্যবহার করে।

অদূরে লাইনে সগর্জ্জনে একখানা ট্রেণ যাইতেছিল। মনোরমা সেটার গতিবেগ লক্ষ্য করিতেছিল। ফিরিয়া বলিল, “কোন পাহাড়ে?”

"বরম্‌যোনি।"—থামিয়া বলিল, "ছুটি ছিল। ছোঁড়ারা এসে টেনে নিয়ে গেল, হোলির গান গাইতে। সে হল্লা কি ভাল লাগে? ছুট দিলাম পাহাড়ে। চমৎকার এক বুড়া সাধু দর্শন করে এলুম।

"আহা আগে যদি বল্‌তে! আমরাও সঙ্গে যেতাম। তার্‌ বাবুর মা বোন সকলের ইচ্ছে একদিন পাহাড়ে যান, লোকের অভাবে—হয় না। এবার যখন যাবে, বোল বাপু।"

"যা সুখী-দুব্‌লা মানুষ তোমরা!"—শঙ্কর সবিনয়ে করুণা ভরে হাসিল। বলিল, "উঠ্‌তে পার্‌বে?"

মনোরমা সাগ্রহে বলিল, "পার্‌তেই হবে। পাঁচজনে পারে, আমরা পারব না? এত অপদার্থ? তার্‌ বাবুর মা বোন, বড় ডাক্তার বাবুর দিদি, আমি।—আর কাকিমাকে একটু টেনে টুনে নিয়ে গেলেই হবে। তিনি ভারি মানুষ, মুস্কিল ওই। কিন্তু সবাই মিলে না গেলে, কি বেড়িয়ে আনন্দ হয়?"

"আচ্ছা বাবুদের হুকুম নাও, তারপর জানিয়ো আমায়।" দাসীর দিকে না চাহিয়া বলিল, "লণ্ঠনটা—"

২

দাসী গুটি গুটি চরণে গিয়া লণ্ঠনটা শঙ্করের কাছে নামাইয়া দিল। ঘোমটা কপালের নীচে টানিয়া, মনোরমার পিছনে নতমুখে দাঁড়াইল। বিদ্যুৎ বাতির আলোয় এবার স্পষ্ট দেখা গেল, সে—পূর্ণ যৌবনা, সুশ্রী শ্যামলা নারী। মুখে অস্বাভাবিক বিষাদ করুণ ভাব। মনে হয় অনেক দুঃখের ঝড় অভাগিনীর জীবনের উপর বহিয়া গিয়াছে।

শঙ্করের শোকাহত মনে সমবেদনার সাড়া অলক্ষিতে জাগিল—আহা!

হঠাৎ গম্ভীর হইল। আলো লইয়া অগ্রসর হইল।

"শীত রয়েছে, গায়ে তুমি গরম জামা দাও নি কেন?"

"হাঁ, এই যে যাচ্ছি।"—অন্য মনে খন্তর উত্তর দিল। কথাটার অর্থ কি কতদূর দাঁড়াইল, প্রথমে মনোযোগ দেয় নাই, পরে হয়ত সেটা উপলব্ধি গোচর হইল। আত্ম-সংশোধনের জন্য পুনশ্চ বলিল, "দুপুরে রোদের সময় বেরিয়েছি এতক্ষণে ঘরে যাচ্ছি।"

মনোরমা বলিল, "আজকাল ছুটির দিনে পাহাড় জঙ্গলে গিয়ে খুব না কি সাধুসঙ্গ করছ? সাধন ভজনও বেশ করছ শুনি।"

চলিতে চলিতে কুণ্ঠিত প্রতিবাদের সুরে খন্তর বলিল, "গরীবের আবার সাধন ভজন!"

"ভগবানের দিকে এগোবার পথে, গরীব বড় লোকের বিচার নাই বাবা,—চাই শুধু পবিত্র মন, নিষ্কপট অনুরাগ। চলবে না শুধু ভণ্ডামি। রাখ রাখ, রাখতে হয়ত কিছু পবিত্র খেয়ালই রাখ। শুনে বড় সুখী হয়েছি। এখন ত লাইনের মিস্ত্রি হয়েছ?"

"জী।"—কৃতজ্ঞতার স্বরে বলিল, "সবই বড় বাবুর কৃপা। চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম বেয়ারা হয়ে তাঁর অফিসে ঢুকি, তুমি তখন দু তিন বছরের বাচ্চা। কাঁধে নিয়ে কত বেড়িয়েছি।"

"মনে পড়ে, রাগ হলে তোমার চুল ধরে টানতুম। জ্বালাতন করতুম। মেয়ে খুব লক্ষ্মী ছিলুম, না খন্তর?"

"কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা ছিল বড় সাফ্।"

"এই রে বাবুয়ার মা পেছিয়ে পড়ছে। তোমার লম্বা পা থামাও বাবা, ও পায়ের সঙ্গে তাল রেখে চলা আমাদের কায নয়।"

লজ্জিত হইয়া খন্তর দাঁড়াইল। দেখা গেল অদূরে বাবুয়ার মা যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি আসিতেছে। নিম্নস্বরে বলিল, "এ নতুন দাই কতদিন এসেছে?"

"মাস তিন চার হবে। দানাপুরে বাড়ী।" বলিয়া সনিঃশ্বাসে দুঃখিত ভাবে মনোরমা পুনশ্চ বলিল, "আহা বেচারা যমের জ্বালায় দেশত্যাগী। স্বামী পুত্র সব গেছে, শোকে পাগল! ভগবান কার কর্ম্মে যে কি লিখেছেন,"—

হঠাৎ খন্তরের মুখ পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইল। শোচনীয় বিষাদ গাম্ভীর্য্যে সে মুখ আঁধার! লাঠিতে ভর দিযা মাটীর দিকে চাহিয়া সে নিস্পন্দ, স্থির।"

ব্যথিত হইল।···এ অভাগাও সেই যন্ত্রণার আসামী! ইহারও সাজানো সংসার চুরমার্ হইয়াছে। অল্পদিন হইল, অকালে পত্নী পুত্র গিয়াছে, স্নেহময়ী জননী গিয়াছেন। লোকে বলে, সেই অবধি খন্তর যেন কেমন উদাসীন হইয়াছে। চাকরি করে, রাঁধে খায়, লোকের দায়ে-ঘায়ে উপকার করে—ওই পর্য্যন্ত। তারপর বাকী সময় নিজ্জন কুটীরে পূজাপাঠ লইয়া থাকে। স্বভাব চরিত্র অনিন্দ্য সুন্দর, বয়স অল্প, স্বাস্থ্য ভাল, উপার্জ্জন ভাল,—বিবাহের জন্য আত্মীয় বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করে, খন্তর অটল। স্বভাবতঃ সে চাপা প্রকৃতির মানুষ। নিজের শোকাচ্ছন্ন মনের বিষাদ ব্যাকুলতা লইয়া লোকের কাছে কাঁদুনি গাহিবার পাত্র নয়। সোজা জানায়—দিন ত কাটিতেছে, অচল নাই। রোগ দুর্দ্দিনে সেবার আবশ্যকতার কথা স্মরণ করাইলে জবাব দেয়, "রাজার হাঁসপাতাল আছে।"

কাযের কথা নয়। সকলে বিরক্ত হয়।

একমাত্র বড় ভাই গুজন্তি ষ্টেশনে চাকরি করে। সপরিবারে সেখানে থাকে। জয়পালের ভ্রাতৃস্নেহ প্রবল, খন্তরের সসম্মান বাধ্যতা যথেষ্ট। অবাধ্যতা শুধু বিবাহের প্রস্তাবে। ভাইয়ের সন্তানগুলির উপর গভীর মমতা, তাহাদের দেখিবার জন্য আগে প্রায় সেখানে যাইত। কিন্তু ভাই ভাজ সেখানকার কুর্ম্মিসমাজে পাত্রী খুঁজিতেছে শুনিয়া এখন সে পথ ছাড়িয়াছে। ভাইপো দু'টির পড়ার খরচ ইত্যাদি মাসে মাসে পাঠায়।

কিন্তু ভাই বিবাহের প্রস্তাব লইয়া পত্র লিখিলে উত্তর পায় না, দেখা করিতে আসিলে, দেখা দেয় না। শোনা যায় শ্বশুর তখন পরোপকাররূপ পুণ্য অর্জ্জনে বা সাধু সেবায় ব্যস্ত। লোকে তাহার দুরভিসন্ধি আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়, গতিবিধি অনুসরণ করে, কাল্পনিক দুর্নাম রটায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেহ 'হালে পাণি' পায় না। হতাশ হইয়া লোকে বলাবলি করে, "ধর্ম্মের বাতিকে ছোঁড়াটার মাথা বিগ্‌ড়াইয়াছে। জুয়াচোরদের পাল্লায় পড়িয়া ঠকিতেছে।"

ঝি চাকরদের মারফৎ কুর্ম্মিপল্লীর এ সব আন্দোলন ভদ্রপল্লীতে পৌঁছিয়াছে, মনোরমাও শুনিয়াছে। মৃত স্ত্রীপুত্রের স্মৃতির সম্মান করিয়া, শ্বশুর ভোগ বাসনা ছাড়িতে চায়, ইহা মনোরমার রুচির পক্ষে তৃপ্তিপ্রদ। ভোগ উপভোগের মোহে সারা সংসারই ত উন্মত্ত। তার মাঝে ত্যাগ-শক্তি-সৌন্দর্য্য-পূত দুই একটা বলিষ্ঠ-মনের চেহারা দেখিলে তাহার আনন্দ হয়। থাক নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত আবেষ্টনে, তবু লোকটির মন ত ভদ্র উন্নত। না হউক সে পার্থিব সুখ স্বার্থের মোহে আকৃষ্ট, করুক আত্মিক-কল্যাণ সাধনে বাকী জীবনটা উৎসর্গ, ক্ষতি কি?

এমনি একটা সিধা হিসাব মনে অস্পষ্ট ভাবে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এবার গোল ঠেকিল।...লোকটি বাহিরের চোখের অশ্রু দমন করিয়াছে, কিন্তু মনের চোখের...?

দয়া হইল।...বেচারা মায়ামুগ্ধ জীব! নিজের অসতর্ক ভাষার জন্য অনুতাপ হইল।

বাবুয়ার মা নিকটে আসিল। আবার চলা সুরু হইল।

অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিবার জন্য মনোরমা আবার প্রশ্ন জুড়িল, শ্বশুরের রান্না খাওয়ার কথা, গৃহস্থালী কাযের কথা, গরু বাছুরের কথা। জানিতে চাহিল, একা সব দিক সামলাইতে কষ্ট হয় কি?

খন্তর সম্পূর্ণ অন্যমনস্কতার সহিত সংক্ষেপে জবাব দিল,—বিশুয়ার মা বুড়ি আছে। ঝাঁট-পাট, হাট-বাজার করে। 'চাচেরা ভাই' শনিচর, সুমার আছে, উহাদের সাহায্যে গরু বাছুরের তদারক সব চলে। অচল থাকে না কিছু।

বাবুয়ার মা মৃদুস্বরে মনোরমার উদ্দেশে বলিল, "কোন্ শনিচর? যার বহু দানাপুরের মেয়ে?"

কথাটা কাণে গেল। খন্তর অন্যমনে বলিল, "হাঁ।"

"সে আমার চাচার জামাই।"—বাবুয়ার মা আগ্রহের সহিত জানাইল।

এই কুটুম্বিতার প্রীতিকর সংবাদে খন্তর উল্লাস জানাইল না, সাড়া দিল না। নির্লিপ্তভাবে যেমন চলিতেছিল, চলিল।

মনোরমা বলিল, "তোমরা ত তাহলে আপনা-আপনি লোক। খন্তর জান্‌তে?"

"না, এই শুন্‌ছি।"—খন্তর উদাসভাবে উত্তর দিল।

বাবুয়ার মা চুপি চুপি আবার কি বলিল। মনোরমা সহাস্যে বলিল, "খন্তর, বস্তির লোকেরা তোমায় সাধুজী বলে?"

খন্তর নিরুত্তরে হাসিল। বোঝা গেল কথাটা সত্য।

"অপরাধটা কি? ফের বিয়ে কর নি বলে বুঝি?"

খন্তর নীরব।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মনোরমা বলিল, "সত্যি আর বিয়ে-থা করবে না খন্তর?"

কথায় কথায় সকলে ছোটবাবুর বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িল। মনোরমার প্রশ্নটা যেন শুনিতে পায় নাই—এমনি ভাবে খোলা দুয়ারের দিকে হাত বাড়াইয়া খন্তর বলিল, "যাও বাবা। ফের্‌বার সময় এবাড়ীর চাকরকে পাবে ত?"

"হাঁ পাব।। বেঁচে থাক, ভাগ্যে এসে পড়েছিলে। পথটা পার করে দিলে। ছোটবাবুর স্ত্রী রোগা মানুষ, কদিন থেকে দেখ্‌তে চেয়েছেন। কিন্তু এই গুণধর লোকজনদের দুঃখে বাড়ী থেকে বেরুতে ভরসা হয় না।"

"মাইজীকে আমার 'পরণাম' জানিও। আসি তাহলে এখন ?"

"এস বাবা। গোবিন্দ মঙ্গল করুন। ধর্ম্মে মতি হোক। বাড়-বাড়ন্ত হোক। ফের বিয়ে-থা কর, সুখী হও"—

বাধা দিয়া ম্লান হাস্যে খন্তর বলিল "সুখের কামনা ?—দুর্ম্মতি ! ও আশীর্ব্বাদ কোর না বাবা, আসি।"

আলোটা দুয়ারের কাছে নামাইয়া দিয়া দীর্ঘ দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

মনোরমা নিঃশ্বাস ফেলিল। বেচারা বুঝিয়াছে ভাল। তবে শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার বুদ্ধিটুকু টিকিলে হয়।

বলিল, "আলো নাও, এগোও বাবুয়ার মা। ছাখো বাড়ীর কর্ত্তা-ব্যক্তিরা কোথায় ?"

বাবুয়ার মা হতবুদ্ধি বিহ্বলের মত খন্তরের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া ছিল। জড়িত স্বরে বলিল, "এই সাধুজী ? লোকে এর কথাই বলাবলি করে ? মানুষটি কেমন দিদিমণি ?"

"কে, খন্তর ? খুব ভাল ছেলে। ওদের ঝাড়টা ভাল। ওর মার কাছে আমি ছোটবেলায় মানুষ হয়েছি। আহা কি ভালই বাসত বুড়ি। তার কথা মনে হলে এখনো আমার মন কেমন করে। ছোট বয়সে আমার মা বাপ গিয়েছেন। তাকে আর কাকিমাকেই মা বলে জানতুম। চল, রাত বাড়ছে।"

বাবুয়ার মা অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কি ভাবিতেছে বোঝা গেল না।

মনোরমা বিস্মিত হইল। তাড়া দিয়া বলিল, "চল, চল। হুঁস্ রাখো, কাকিমা একা।—দু'টি ছেলে নিয়ে বাড়ীতে আছেন। শীঘ্র ফেরা চাই।"

৩

মাঝে কয়দিন অত্যন্ত বর্ষা বাদল গিয়াছে। শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক পুলের রেল লাইনে কি একটা গোলযোগ ঘটায়, ইঞ্জিনীয়ার ওভারসিয়ার, মিস্ত্রী মজুরের দলের সঙ্গে খন্তরকেও সেখানে ছুটিতে হইয়াছিল। দুঃসাহসী মিস্ত্রী বলিয়া সে দলে খন্তরের একটা খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। লাইন মেরামত করিবার সময় কি একটা বিপজ্জনক কায সমাধা করিয়া, বাঁ পায়ের হাঁটুতে হঠাৎ ভয়ানক আঘাত পায়। হাঁসপাতালে কয়দিন শয্যাগত থাকিয়া, সম্প্রতি নিজের কুটিরে আসিয়াছে। শনিচর, সুমার, ঝমরু প্রভৃতি ভাই বেরাদারগণ তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছে। রেলের ছোট ডাক্তার বাবু প্রত্যহ আসিয়া সযত্নে তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থা করিতেছেন।

শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার সময় মানুষের মন স্বভাবতঃই নিজেকে অসহায় বোধ করে, অপরের সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়,—বিশেষতঃ যাহাদের একান্ত ভাবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হয়। এ দুর্ব্বলতা খন্তরকেও ইদানিং আক্রমণ করিয়াছিল। আত্মীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গ সে অপছন্দ করিত, এড়াইয়া চলিত,—আজ সামাজিক কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহারা দেখা করিতে আসিলে খন্তর কৃতার্থ হইত।

তাহাদের বসাইয়া দু'টা কথা বলিতে পারিলে আনন্দিত হইত।—নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ দুর্দ্দশার কথা লইয়া সে কাহারও সহিত কোন আলোচনা করিতে ভালবাসিত না। বরঞ্চ কেহ সে প্রসঙ্গ তুলিলে খন্তর অন্য কথায়, সেটা চাপা দিত। তাহার সব চেয়ে প্রিয় আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল,—ধর্ম্মের কথা, ভগবানের রূপ, রস, লীলার কথা। পরহিতে আত্ম-কল্যাণ সাধনের কথা। জীবসেবায় পুণ্য সঞ্চয়ের কথা। জন্মান্তর ও কর্ম্মফলের কথা ইত্যাদি।

এ সব আলোচনায় মহা উৎসাহে যোগদান করিতেন ছোট ডাক্তার বাবু। লোকটি বাঙালী, ব্রাহ্মণ সন্তান। বয়স অল্প, পাশ করিয়া সম্প্রতি চাকরি লইয়া এখানে আসিয়াছেন। এখনও বিবাহ হয় নাই। নিজের খরচ চালাইয়া উপার্জ্জনের বাকী পয়সাগুলি পিতার দুই পক্ষের বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের জন্য দেশে পাঠাইয়া দিয়া রিক্ত হস্ত নিঃসম্বল হইয়া থাকেন। লোকটি অতিশয় পরিশ্রমী, কর্ম্মতৎপর! বাহিরের 'কলে' সময় সময় প্রচুর রোজকার করেন। শোনা যায় সে অর্থগুলা না কি গোপন দানধর্ম্মে ব্যয় হইয়া থাকে। দুঃখী দরিদ্রদের প্রতি ডাক্তারের অন্তরের টান অত্যন্ত। নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ডাক্তারটি না কি খুব জনপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তারের ভদ্র শ্রেণীর বন্ধুরা বলাবলি করিয়া থাকেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে এই 'উড়ন চণ্ডে' ডাক্তারটির গুপ্ত সংস্রব আছে।

এ অপবাদ সত্ত্বেও ডাক্তার আভিজাত্য রক্ষার চেষ্টায় আদৌ বিব্রত নহেন। নির্ভয়ে ইতর ভদ্র সব শ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া সকলের যথাসাধ্য মঙ্গল চেষ্টা করিয়া চলিতেন। সম্প্রতি পায়ে আঘাত পাওয়া উপলক্ষে খন্তরের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ঘটিয়াছে। খন্তর না কি তাঁহার গভীরতর স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

সেদিন দুপুর বেলা সুনার নিজের বাড়ী হইতে ডাল রুটি আনিয়া খন্তরকে খাওয়াইয়াছিল ! কুটীরের বাহিরে, আধা রৌদ্রে খাটিয়া পাতিয়া তাহাকে রাখিয়া গিয়াছিল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আহত পাখানা একটা বালিশে রাখিয়া, আর একটা বালিশে হেলান দিয়া বসিয়া খন্তর সুর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেছিল। পাড়ার দুই চারিটি ছোট ছেলেমেয়ে খাটিয়ার চারপাশে দাঁড়াইয়া গভীর কৌতূহলে ভক্তরাজ হনুমানজীর বীরত্ব-গাথা শ্রবণ করিতেছিল।

অদূরে পথ দিয়া যাইতে যাইতে মনোরমাদের ভৃত্য কান্‌হাইয়ালাল ডাকিয়া বলিল, "কি রে খন্তরা, কি কর্‌ছিস্ ?"

খন্তর পাঠ বন্ধ করিয়া কান্‌হাইয়ালালের দিকে চাহিল। আহত পায়ের দিকে আঙুল দেখাইয়া ক্লিষ্ট হাস্যে বলিল, "জব্দ করে রেখেছে। এস নানা।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গ্রাম সম্পর্কে কানহাইয়ালাল খন্তরের মাতামহ স্থানীয় ব্যক্তি।

কান্‌হাইয়ালাল তাহার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড মুখের পাকা গোঁফ যোড়াটা বাঁকাইয়া, গভীরতর অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করিল। স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "যা আর একবার চারতলা উঁচু থেকে লাফ্ দিয়ে পড়্। বড় মরদ্ ! এবার হোল্ল ত ?"

বলিতে বলিতে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কান্‌হাইয়ালালের কাল মুখ, লাল চোখ, পাকা গোঁফ, এবং রূঢ় কর্কশ স্বভাব পল্লীর ছোট ছেলে-মেয়েরা ভীতির চক্ষে দেখিত। তাহার আবির্ভাবে শিশুগুলি অপ্রসন্ন চিত্তে গুটি গুটি চরণে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

কানহাইয়ালাল খাটিয়ার এক প্রান্তে বসিল। কর্ত্তৃত্বের সুরে বলিল, "আর বাহাদুরী কর্‌বি ?"

খন্তর পরিহাস ভরে সবিনয়ে বলিল, "পা-টা আগে ভাল হোক।"

কানহাইয়ালাল সগর্জ্জনে বলিল, "মর্‌বি কোন দিন অপঘাতে। থাক্‌ত ছেলে পরিবার, তাহলে 'জানের' মায়া ছেড়ে কেমন 'মর্দ্দানি' কর্‌তিস্‌ তা দেখতুম। বিয়ে কর খন্তরা, তোর ভাল হবে। এই যে একাটি পড়ে ভুগ্‌ছিস্‌, এ সময় একটা 'বহু' থাক্‌লে, কত উপকার হোত ভাব দেখি?"

ম্লান হাস্যে খন্তর বলিল, "ভাব্‌লেই ভাবনা বাড়ে। ফকীরের জীবনে আমীরির স্বপ্ন না দেখাই ভাল। থাম।"

হুঁকা টানিতে টানিতে সুমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সে খন্তরের সমবয়স্ক, সংসারী ব্যক্তি। তাহার পিতা, মাতা, স্ত্রী, কন্যা, চাকরি, অভাব-অনটন সবই বর্ত্তমান। সময়-শিরে খন্তর অর্থে সামর্থ্যে তাহাদের উপকার করিত বলিয়া,—দুর্দ্দিনে আজ তাহারা যথাসাধ্য প্রত্যুপকার করিতেছে।

সুমার তাহার মন্তব্য শুনিয়া, কানহাইয়ালালের উদ্দেশে অনুযোগের স্বরে বলিল, "বড় এক রোখা, জিদেল মানুষ! কাল জয়পাল-ভাইয়া ওকে দেখ্‌তে এসেছিল, দু'টো হাতে ধরে কেঁদে গেল। আমাদের বলে গেল, 'তোরা বুঝিয়ে-পড়িয়ে ওর মত কর। দেখে-শুনে একটা সাগা লাগিয়ে দে; ওর দায়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।' কিন্তু কে মত করাবে করাও।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে খন্তরের দিকে চাহিয়া কানহাইয়ালাল বলিল, "কেন অমতটা কিসের? ঘরে মা বোন নেই, খুড়ি জ্যাঠাই নেই, একটা ছেলে মেয়ে নেই। বুড়ো বয়সে অদিনে দুর্দ্দিনে তোর কল্পনা কর্‌বে কে শুনি?"

"পয়সা থাক্‌লে ভূতে এসে কর্‌বে। না থাক্‌লে নিজের আত্মীয় স্বজনরাও মুখ দেখ্‌বে না। আমাদের ছোট সাহেব হাজার টাকা

কামায়, খরচে কুলবে না বলে সাগা কর্‌তে ডরায়। ছোট্ট ডাক্তার বাবু একশো দেড়শো কামায়—তাঁরও ঐ কথা। আমি ত মোটে পঁচিশ ত্রিশ টাকা কামাই, নিজের খরচে সব উড়ে যায়”—

বাধা দিয়া সুমার সসঙ্কোচে বলিল—“ওড়াস্ তাই উড়ে যায়! মদ গাঁজাই খাস না, কিন্তু সাধু সন্তের নেশা যা ধরেছে তোকে, সে ত মদের বাবা! তার চেয়ে বৌ আন”—

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া কান্‌হাইয়ালাল বলিল, “বেঁচে যাবি! তুই ছোট সাহেবও নয়, ছোট ডাক্তার বাবুও নয়, তোর অত নবাবীর ঝাঁজ কেন? গরীব লোকে অল্প আয়ে সংসার চালায় না? তুই আগে চালাস্ নি?”

খন্তর অধোবদন হইল। নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রামায়ণের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বিষাদভরে বলিল, “তাকে কি সংসার চালান বলে? প্রতি মাসেই ধার কর্জ্জ, হা—হা, নেই, নেই! আবার কেঁচে গণ্ডুষ করে, সংসার বাড়াব? সেই দুঃখ ডেকে আন্‌ব? না, আমার দিল্ নারাজ! সম্বন্ধ জীবনাবধি,—কোন দিন আছি, কোন দিন নেই। কেন আর ঝঞ্ঝাট বাড়াই? তার চেয়ে চাকরীর ধান্ধায়, ভগবানের চিন্তায় বেশ দিন কেটে যাচ্ছে। ও সব কথা ছেড়ে দাও।”

সুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, “একদিন বুধগয়া বেড়াতে যাবি সুমার?”

বিদ্রূপভরে সুমার বলিল—“খোঁড়া পায়ে? হেঁটে?”

খন্তর বলিল—“আরে না। একটা এক্কা ভাড়া করে।”

“ভাড়া দেবে কে? তুই?”

খন্তর সসঙ্কোচে বলিল—“তা না দিলে হবে কেন? তোরা ছাপোষা মানুষ, পাবি কোথা?”

ইঙ্গিতসূচক কটাক্ষসহ কান্‌হাইয়ালালের উদ্দেশে সুমার বলিল, "বাঁজে খরচের বেলায় দরাজ হাত!"

অপ্রস্তুত হাস্যে খস্তর শ্রান্তভাবে বলিল—"কি করি? চুপ চাপ পড়ে থাক্‌তে আর ভাল লাগ্‌ছে না, মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমার পা না ভেঙে, যদি একখানা হাত ভেঙে যেত, তাহলে এই ছুটিতে আমি মনের সুখে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতাম। যেদিন ছুটি পড়ে, কাজ থাকে না, আমার সেদিন—ভয় করে। মনে হয়, তাই ত, এইবার কি নিয়ে সময় কাটাই?"

কানহাইয়ালাল বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"হবেই ত, যোয়ান বয়স! খস্তরা, তবু তুই একটা 'বহু' ঘরে আন্‌বি না?"

একে ত বিবাহের নামে মন বিমুখ, তার উপর এইভাবে বয়োধর্ম্মের ইঙ্গিতে মন অপমানে উষ্ণ হইয়া উঠিল। তাহার বয়সের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কেহ বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে খস্তরের গায়ে সেটা গালাগালির মত লাগিত।···কেন রে বাপু? মানুষ কি ছাগল ভেড়ার সম-পর্য্যায়ভুক্ত? প্রিয়জনের শোকস্মৃতির জ্বালা কি তাহার মনকে সংসার সুখের প্রতি ঘৃণায় বিমুখ করিয়া তুলে না? তাছাড়া, যৌবনের তৃষ্ণা চাঞ্চল্য,—জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে জয় করিবার সাধনা যে, মানুষের পরম ধর্ম্ম,—মহত্তর মনুষ্যত্ব!—এ কথা মানুষ হইয়া সে ভুলিবে কেন?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে খস্তর বলিল, "একটা 'বহু' ঘরে এসে কি আমাকে চতুর্ভুজ কর্‌বে বল ত? এসেছিল ত একজন, হয়েছিল ত দু'দুটো ছেলে। তারপর লাভ ত এই হাহাকার? যাবেই যদি,—খামকা জ্বালাবার জন্যে বেইমানগুলো এসেছিল কেন?"

উচ্ছ্বসিত অশ্রু দমনের চেষ্টায় খস্তরের চোখের সূক্ষ্ম শিরাগুলা নিমেষ মধ্যে লাল হইয়া উঠিল।

কানহাইয়ালাল ও সুমার অবাক্ হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল! এ, বলে কি? আসা-যাওয়াটা কি তাহাদের ইচ্ছাধীন? কাহার অবিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য খন্তর নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ? এ কি-কথায়, কোন-কথা আসিয়া পড়িল? এতটার জন্য ত প্রস্তুত ছিল না! দু'জনেই অপ্রস্তুত ভাবে স্তব্ধ রহিল।

নিজের উষ্ণতায় পর মুহূর্তে খন্তর লজ্জা বোধ করিল। একটু হাসিয়া বলিল, "তোমরা খামকা আমায় ত্যক্ত কোর না। ও সব কথা আমার ভাল লাগে না। এই ঠিক দুপুরে নানা এদিকে এলে কেন বল ত?"

কানহাইয়ালাল নরম হইয়া বলিল, "মাইজীরা মালবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন, তাই সঙ্গে এসেছি। কিন্তু খন্তরা, তোর রকম-সকম ভাল নয়। মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বুঝলি? তুই আমাদের বাবুয়ার মার মত আবোল তাবোল বক্‌ছিস্! তার স্বামীটা মরে গেছে, দু-তিনটে ছেলে মেয়ে ছিল, তারাও গেছে। সেই শোকে সে যেন আধ পাগ্‌লা হয়েছে। সেও থেকে-থেকে এম্নি করে যা-তা বকে! তুইও দিনে দিনে তাই হচ্ছিস্!"

খন্তর একটু হাসিল। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ভাল। পাগল বলে আমায় 'সাটিফিকিট' দিয়েছ, আর সাগার কথা কেউ মুখে এনো না। পাগলের সাগা মানে, আর একটা অভাগা জীবকে 'চাম্‌চিকে-জবাই' করা ত? তার উপর ছেলে মেয়ে পয়দা হয় ত, সোনায় সোহাগা!"

খন্তর পরিহাসভরে কথাটা আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উপসংহারের দিকে কি একটা কথা মনে পড়ায়, সহসা আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পল্লীর পশ্চিম দিকে হাত বাড়াইয়া রুষ্ট স্বরে বলিল, "ওই বিজুয়া শূয়ারটা এক পাগল ছিল। হাঁ, পাগল নয় ত ওকে কি বলব? ষ্টেশনে

কুলির কায করে যা পেত, সব বদ্‌খেয়ালিতে উড়াত! সে কি সুস্থ মানুষের আক্কেলের পরিচয়? ও একা মর্‌ছিল, ওকে একা মর্‌তে দেওয়াই উচিত ছিল। তোমরা পাঁচ শয়তান জুটে কাণ ভাঙানি দিয়ে তাকে সাগা করালে। একটা নিরপরাধ মেয়ের পরকাল নষ্ট কর্‌লে! আজ গ্যাখগে যাও, ওদের কি দুর্দ্দশা হয়েছে। অসংযমের ফলে শরীর ভেঙেছে, খেটে-খুটে দু'পয়সা রোজকার কর্‌বার উত্তম নষ্ট হয়েছে। এক পাল রুগ্ন-নিৰ্জ্জীব ছেলে মেয়ে পথে পথে ভিক্ষের জন্যে ছুটোছুটি করছে,—ঘর যেন নরককুণ্ড! আমিও এই বুড়ো বয়সে, আবার সাগা করে অম্নি একটা নরক তৈরী করি, আর তোমরা দূর থেকে গাঁজা টেনে আরামসে ধোঁয়া ছেড়ে বল—'আহা, খন্তরার বরাতে এত দুঃখ ছিল!"

একটু থামিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিল, "হাঁ, দুঃখ আমার কপালে আছে, তা জানি। পরমেশ্বর যার বরাতে সুখের কথা লিখতে ভুলে গেছেন, তাকে সুখী করে কে? বুদ্ধির দোষে সুখের লোভে, ফের সংসার পাতালে,—উঃ, বাপ্‌!"

উত্তেজনার আতিশয্যে আহত পায়ের দুর্দ্দশার কথা ভুলিয়া সজোরে পা সরাইতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার স্থানে তীব্র মোচড় লাগিল! একটা অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি করিয়া, একপাশে হেলিয়া পড়িল, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিল। কথাটা শেষ হইল না।

সুমার ত্রস্তে কান্‌হাইয়ালালের হাতে হুঁকা দিয়া,—খন্তরের কাঁধে হাত দিল। বলিল, "ধরে শুইয়ে দেব?"

প্রবল চেষ্টায় নিঃশব্দে যন্ত্রণা সাম্‌লাইয়া লইয়া খন্তর সজোরে বলিল, "নাঃ। আমি ঠিক আছি।"

কুটীরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, "বিছানায় বিড়ি, দেশলাই, আছে। আন ত ভাই।"

"হুঁকোটা নে-না।"

"না। নানা থাক্।"

সুমার কুটীর হইতে বিড়ি দেশলাই এবং একটি তাজা গোলাপ ফুল লইয়া আসিল। খন্তরকে বিড়ি দেশলাই দিয়া ফুলটা নাকের কাছে ধরিয়া বলিল, "খাসা গন্ধ। তোর বিছানায় এটা কে দিয়ে গেল রে?"

কান্হাইয়ালাল হুঁকা টানা বন্ধ করিয়া, উৎসুক দৃষ্টিতে খন্তরের পানে চাহিল। খন্তর সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিল। বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে বলিল, "নানাকে জিজ্ঞাসা কর। নানা এখুনি বুক-ঠুকে কত জনের নাম বাৎলে দেবে।"

অপ্রতিভ হইয়া কান্হাইয়ালাল বলিল, "তুই ত বদ্ চালের মানুষ নোস্, কেন বদ্নাম দেব?"

"রোগে। পরনিন্দা রটনা না-করলে যে তোমাদের ধর্ম্ম বাজেয়াপ্ত হয় নানা। কিন্তু দোহাই তোমাদের! আমার কুৎসা যদি করতে চাও, আমার সামনে কর। আড়ালে নয়।"

রাগিয়া উঠিয়া 'নানা' বলিল, "ঐ তোর নষ্টামি! সাগা সাদি করিস না বলে, না-হয় ঠাট্টা তামাসা করি। তা বলে সত্যি বদনাম দেব?"

"দিলেই হোল। সে ত তোমাদের অনুগ্রহ।"

সে কথায় কর্ণপাত-না করিয়া নানা বলিতে লাগিল, "বিজুয়ার সাগার কথা ভুলে তুই আমাদের গাল দিলি। কিন্তু সাগা না দিলে ও-যে আরও বয়ে যেত। বৌ ঝি নিয়ে বস্তির মধ্যে বাস করা যে লোকের দায় হোত!"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া খন্তর বলিল, "বটে! আমরা মরে গেছি? ও সব জানোয়ারি-কীর্ত্তি এখানে চল্‌বে না। ঘাড় ধরে বস্তি থেকে দূর করে দেব-না?"

"ক' জনকে ?"

"যে কজনকে হাতের কাছে পাব। ওরকম সব ইতর জানোয়ারকে খুন করে ফাঁশি গেলেও পুণ্য আছে।"

কানহাইয়ালাল ব্যঙ্গ ভরে মুখ বাঁকাইয়া হাসিল। বলিল, "খস্তরা, তুই সাবধান হ'। অত পুণ্যের লোভ, অত পরোপকারের লোভ করিস্ নি। এমন কলঙ্কের ঢাক বেজে উঠবে, শেষে লোকালয়ে মুখ দেখাতে পার্‌বি না। তোকে চিনি, তাই বল্‌ছি,—বয়স হলে কি হবে? তুই আজও কাণ্ডজ্ঞানহীন বালক! নইলে বলতুম—তুই পাকা শয়তান! স্ত্রী পুত্র মরে গেছে, তাদের শোক বুকে পুষে একরোখা খেয়ালে দিন কাটাচ্ছিস্। তুই কি বুঝ্‌বি সাধারণ মানুষগুলোর মনের খবর? কাল যদি তোর মন বিগড়ে যায়—"

সুমার সমর্থনের সুরে বলিল, "ঠিক কথা। যদি মন্দ খেয়ালের ভূত মাথায় চাপে, তাহলে ওই খস্তরা যে কাল কোথায় ঠিক্‌রে গিয়ে পড়্‌বে, কে বল্‌তে পারে? দুনিয়া বড় কঠিন ঠাঁইরে!"

খস্তর হাসিল। ধীরভাবে বলিল, "মানুষ যখন মন্দ খেয়ালের পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দেয়,—নিজের কাছে নিজেকে অবিশ্বাসী করে,—তখন মন এম্নি অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় ভরে উঠে! দুনিয়া কঠিন ঠাঁই, অস্বীকার করি না। কিন্তু পরমেশ্বরের উপর নির্ভর রাখ্, ধৈর্য্য ধরে ধর্ম্ম পথে চল্। দেখ্‌বি কঠিন দুঃখগুলা সাধনার জোরে সহজেই জয় করা যায়।"

বিরক্তির সহিত কানহাইয়ালাল বলিল, "থাম থাম খস্তরা। তুই বালকের ছেলে, দুধের বাচ্চা। দুনিয়ার কতটুকুই বা এর মধ্যে দেখেছিস্? কতটুকুই বা বুঝেছিস?"

খন্তর স্নিগ্ধহাস্যে বলিল, "বেশী নয়। কিন্তু যেটুকু দেখি, মন দিয়েই দেখি।"

তারপর বিড়িতে একটা সুদীর্ঘ টান দিয়া নিজ মনে বলিতে লাগিল, "আমাদের ছোট ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে সুমার দেখেছিস ? ছোট ডাক্তার বাবুকেও দেখেছিস ? কি দুঃসাহসী, সদানন্দ, মহৎপ্রাণ মানুষ ওরা! কি পবিত্র উন্নত স্বভাব ওদের ? ওদের দিকে চেয়ে দেখি, আর তোদের কথা মনে করি। আমার হাসি পায়! কি নাই তাদের ? রূপ, যৌবন, অর্থ, স্বাস্থ্য, শক্তি—আমাদের তুলনায় তাদের অনেক—অনেক বেশী! তাদের হাজার দিকে হাজার ভোগ সুখের, হাজার সুবিধার দুয়ার খোলা। হাজার দিকে হাজার লোভের ফাঁদ পাতা। কিন্তু ওদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার সময় নেই। নিজের কাযের নেশাতে মেতে আছে। ক্লাবে যায়, খেলা ধূলা করে। ওদের মেয়েদের সঙ্গে মেশে, হাসে গল্প করে,—যেন সবাই ওদের মা, বোন, আপনার লোক। ওরা ভোগীদের ভিতর বসে, ভোগলালসা জয় করে খাঁটি সোনার মত চমক্ মার্‌ছে। আর তোরা ? আমরা ?"

কানহাইয়ালাল প্রতিবাদের সুরে বলিল, "ওদের কথা ছেড়ে দে। ওরা ভদ্দর আদ্‌মি। ওদের বিদ্যে বুদ্ধি আছে, নিজের মনকে বশে রাখ্‌বার সুলুক-সন্ধান জানে। এই যে আমার মনিববাড়ীর বিধবা কন্যা রয়েছে—দিদিমণি। এক ফোঁটা, দুধের মেয়ে। রূপ ফেটে পড়্‌ছে, যেন মা-দুর্গা! ওদের আর বিয়ে দিতে নেই। বুঝেছে উপায় নেই।

কাযেই, নিজের মনে মনকে বুঝিয়ে ঠিক করে নিয়েছে। বার ব্রত উ...
তিরেব নিয়ে খালি ধর্ম্মের ধান্ধায় মেতে আছে”—

খন্তর শান্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, “ঠিক কর্‌ছেন। নিজের উপযুক্ত কর্‌ছেন। যার যেমন অবস্থা, তার পক্ষে তেম্নি পথে চলাই নিরাপদ। ঐ জন্যে দিদিমণিকে আমি ভক্তি করি। কি বল্‌ব? পেটের দায়ে আমাকে খাট্‌তে হচ্ছে। যদি পয়সা থাক্‌ত,—আমিও সব ছেড়ে নিজের কায নিয়ে উধাও হতাম!”

পরক্ষণে একটু হাসিয়া আত্ম-ত্রুটি সংশোধন করিয়া বলিল, “নাঃ, স্বার্থপরের মত শুধু নিজের কায নিয়ে উধাও হতেও তত ভাল লাগে না। বরঞ্চ বড় ঘরে জন্মে, ওই ছোট সাহেব, কিম্বা ছোট ডাক্তার বাবুর মত—”

ব্যঙ্গভরে ঠোট বাঁকাইয়া কানহাইয়ালাল বলিল, “থাম্। বড় ঘরে জন্মালে সবাই ছোট সাহেব, ছোট ডাক্তার বাবুর মত হয় না। আমিও এই বয়েসে ঢের দেখেছি। কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কত মুনি ঋষি তলিয়ে গেছে! তুই আমি ত কোন ছার!”

মুচ্‌কি হাসিয়া সুমার বলিল, “হাতে রামায়ণ ত রয়েছে; পড়্‌ছেও ত দিন রাত। ব্রহ্মা বিষ্ণুদের খবর খন্তরা ভালই জানে। মুনি ঋষিরাও ওর অচেনা নয়।”

খন্তর নিরুত্তরে হাসিল; একটু অন্যমনা হইল। তাই বটে,··· দেবতাদেরও বিস্তর দুর্ব্বলতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র, পরাশর, কণ্ব মুনি কাহারও উপর বেশী ভরসা রাখা চলে না। তার চেয়ে চোখের সামনে ছোট সাহেব ও ছোট ডাক্তার বাবুর দৃষ্টান্ত যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আপাততঃ অনেকখানি সাহস পাওয়া যায়! কিন্তু ভবিষ্যতে ইঁহারা কে কি হইয়া দাঁড়াইবেন, তাই বা কে বলিতে পারে?

খন্তরের অন্তরের অন্তঃস্থানে বিবেক ধমক দিয়া বলিল, “সাবধান খন্তর,

ং বা মানুষের দুর্ব্বলতার ইতিহাসটা দিনরাত মনের ভিতর নাড়া-চাড়া না। উহাতে নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিবে, নিজের অনিষ্ট সাধন করিবে। তাঁহারা কে কোথায়, কতখানি প্রলোভন শ্বর জন্য কত বড় চিত্ত-সংযমের পরিচয় দিয়াছেন—তাহা চিন্তা কর। উপকৃত হইবে।”

দূর দিক্-চক্রবালের দিকে সুদূরগামী দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া ঊর্দ্ধে উড়ন্ত একটা শঙ্খ-চিলের দিকে চাহিয়া খন্তর নিজ মনে কি ভাবিতে লাগিল।

সুমার অদূরে পাকা রাস্তার দিকে চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, “নানা, তোমার মানববাড়ীর সেই মেয়েটি দাইয়ের সঙ্গে যাচ্ছে।”

উঠিতে উদ্যত হইয়া, কানহাইয়ালাল পুনরায় বসিল। বলিল, “নাঃ, তার বাবুর বাসায় গেল। দাই-টো খোকা বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে। শনিচরের বহুর কাছে আসছে বুঝি? ওরে সুমার ডাক্—ডাক। বল্ ‘বাবুয়ার মা, বাবুয়াকে আমার কাছে দিয়ে যাও’।”

তাহার ব্যস্ত উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে চমকিয়া খন্তর সেই দিকে চাহিল। দেখিল পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া, মাঠের পথ ধরিয়া মনোরমার সেদিনের সেই সঙ্গিনী দাসী বস্তির দিকে আসিতেছে। আজ তাহার বেশভূষা অনেকটা পরিষ্কার। হোলির উৎসব নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় সেও আজ অপর সকলের মত বাসন্তী রঙে ছোপানো কুর্ত্তা শাড়ী পরিয়াছে। শ্যামল অঙ্গে বাসন্তী রং যে এত নয়ন-তৃপ্তিকর শোভাদায়ক হয় খন্তর তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করে নাই! একটু বিস্ময়ের সহিত কৌতুক-স্মিত-মুখে চাহিয়া রহিল। মেয়েটির মুখখানি আজ অত্যন্ত হর্ষ-প্রফুল্ল বোধ হইল। বছর খানেক বয়সের সসজ্জ সুন্দর প্রভু-পুত্রকে কোলে লইয়া নিজ মনে আদর করিতে করিতে সে আসিতেছে। ইহাদের প্রতি তাহার লক্ষ্য নাই।

কান্‌হাইয়ালালের উপরোধে সুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “না, না। কারুর কাছে ছেলে দেয় না, বলা মিথ্যে। বেচারীর নিজের ছেলেগুলা মরে গেছে, কাযেই পরের ছেলের উপর বড় মায়া। আহা, নিজের যদি একটা থাকত?···ওর···একটা সাগা লাগিয়ে দাও-না।”

মাথা নাড়িয়া কান্‌হাইয়ালাল বলিল, “ওর মন নেই। কিন্তু ওই বয়েস, স্বামী, পুত্র, বাপ, ভাই কেউ নেই। বস্তির মধ্যে বাস করে, এটায় গোলযোগ হচ্ছে।”

প্রসঙ্গটা খন্তরের ভাল লাগিল না। বালিশে কুন্থইয়ের ভর দিয়া, নতমুখে ঝুঁকিয়া, নীরব রহিল।

পল্লীর ইতস্ততঃ অবস্থিত কুটীরগুলার পাশ দিয়া আঁকা বাঁকা সরু পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে দাসী খন্তরের কুটীরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। সহসা ইহাদের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে সসঙ্কোচে দাঁড়াইল। মাথায় কাপড় টানিয়া, ঘুরিয়া অন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

কানহাইয়ালাল হঠাৎ চেঁচাইয়া ডাক দিল,—“এ বাবুয়ার মা, বাবুয়াকে দিয়ে যাও। খন্তরা চাইছে।”

তাহার নষ্টামি দেখিয়া খন্তর অবাক! সে চিরদিন শিশুপ্রিয়, শিশুরাও তাহাকে ভালবাসিত। কানহাইয়ালাল ওই শিশুটিকে লইয়া প্রায়ই খন্তরের কাছে আসিত। আদর পাইয়া শিশুটি অতিরিক্ত মাত্রায় খন্তরের প্রতি অনুরক্ত ছিল। এতক্ষণ ছেলেটি অন্য দিকে চাহিয়া নিজের আঙুল চুষিতেছিল। এবার খন্তরের নাম শুনিয়া চমক-ব্যগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। কানহাইয়ালালের ধৃষ্টতার উত্তরে প্রতিবাদ করিতে উদ্যত খন্তরের দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র প্রবল উল্লাসে হর্ষধ্বনি করিল! দূর হইতে দু-হাত বাড়াইয়া, ঝাঁপাইয়া লাফাইয়া খন্তরের

কাছে যাইবার জন্য বিষম আস্ফালন জুড়িল। তাহাকে সামলানো দাসীর পক্ষে দুঃসাধ্য হইল!

খন্তর থতমত খাইল। প্রতিবাদ করিতে ভুলিয়া গেল। শিশুটির এত আগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিতে তাহার স্নেহপ্রবণ চিত্ত বিমুখ হইল। কিন্তু চাহিয়া লইতেও ভরসা হইল না। নিরুপায়-করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

শিশুর দৌরাত্ম্যে দাসী ব্যাকুল হইয়া উঠিল! চকিতে অতি সন্তর্পণে, —ভীতভাবে খন্তরের দিকে অনুনয়ভরা দৃষ্টিতে চাহিল।—সে দৃষ্টির অর্থ যেন,—"দোহাই ছেলে-ধরা ভূত মহাশয়! শিশুটিকে কাড়িয়া লইও না।"

সেই ভয়-সঙ্কোচ-ব্যাকুলতা-মাখা, ত্রস্ত-চঞ্চল দৃষ্টি—নিমেষ মধ্যে খন্তরকে কেমন যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল! তাহার অন্তরে একটা আশ্চর্য্য কোমল দয়ার ভাব জাগিয়া উঠিল।—সেটাকে সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানীর ভাষায় হয়ত মায়া বলা চলে! নিজের অজ্ঞাতেই করুণা-শীতল কণ্ঠে বলিল, "না, না। আমি খোকাবাবুকে চাই নি। ওরা তামাসা করছে। নিয়ে যাও।"

দাসী মুহূর্ত্তে অদ্ভুত তৎপরতায় নিজের আঁচল টানিয়া শিশুর চোখে ঢাকা দিল। উদ্দেশ্য, শিশু যেন আর খন্তরকে দেখিতে না পায়, তাহার কাছে যাইবার বায়না না করে! তারপর শিশুকে বুকে চাপিয়া, কাক বক সংক্রান্ত কি সব ভয়াবহ রহস্যের বাণী বলিতে বলিতে, ক্ষিপ্র চরণে দ্রুত প্রস্থান করিল।

খন্তর বিমূঢ়ের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিল! কানহাইয়ালাল ও সুমার হাসিতে লাগিল।

ক্ষণ পরে দৃষ্টি ফিরাইয়া খন্তর বলিল, "ওকে বাবুয়ার মা বল কেন?"

কান্হাইয়ালাল বলিল, "মাইজীর হুকুম। খোকাবাবুর ভারী অসুখের সময়, ওই মেয়েটা প্রথম আসে। উঃ, কি সেবা করেই যে বাঁচিয়েছিল, সে যদি দেখতিস্! সেই থেকে খোকাবাবুকে 'বাবুয়া' বলে। মাইজী হুকুম দিয়েছেন ওকে সবাই বাবুয়ার মা বলে ডেক।"

তার পর বিনা প্রশ্নে সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত করিল। একদিন রাত্রি বারোটার ট্রেণে ওই মেয়েটা গয়া ষ্টেশনে একা আসে। তখন সে পুত্র শোকে উদ্‌ভ্রান্ত, ছন্নছাড়া পাগলিনীর মত। সে কি করিবে কোথা যাইবে কিছু বলিতে পারে না। তাহার কান্না দেখিয়া 'বড়বাবু' দয়া করিয়া নিজের বাসায় লইয়া যান। সেখানে খোকাবাবু তখন দারুণ রোগে শয্যাশায়ী। রুগ্ন শিশুকে দেখিয়া পাগলিনীর মাথায় কি খেয়ালের উদয় হইল, কে জানে,—হঠাৎ ব্যাকুল আগ্রহে শিশুকে বুকে তুলিয়া লইল। তার পর দিনের পর দিন, প্রাণপণে সেবা করিয়া শিশুকে সুস্থ করিল। কৃতজ্ঞা গৃহিণী সযত্নে তাহাকে বাড়ীতে রাখিলেন।

পরে শনিচরের স্ত্রীর সহিত তাহার আত্মীয়তা প্রকাশ পাইল। উহারা দরিদ্র নারীর চাকরিতে আপত্তি করে না। কিন্তু সামাজিক নিন্দার ভয়ে, যুবতী আত্মীয়াকে এখন রাত্রে প্রভুগৃহে থাকিতে দেয় না। নিজেদের বাড়ীতে লইয়া যায়। সমস্ত দিন প্রভুগৃহের কায কর্ম্ম লইয়া, বাবুয়াকে নাড়িয়া চাড়িয়া মেয়েটি বেশ স্বচ্ছন্দ থাকে, কিন্তু অবকাশ সময়ে সে সন্তান শোকের ব্যথা আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। শোনা যায় আত্মীয় গৃহে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত নিঃশব্দ ব্যাকুলতায় কাঁদিয়া

কাটায়। শনিচরের স্ত্রী ও মাতা কত সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু অভাগিনী শান্ত হয় না।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে শস্তুর আত্মীয় স্বজনদের পারিবারিক সংস্রব এড়াইয়া চলিত। বাহিরে পুরুষ মহল হইতে সংক্ষেপে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। এত খবর জানিত না, আজ নূতন সংবাদ শুনিল।

মাথায় হাত দিয়া নতমুখে স্তব্ধ রহিল। এক শোকার্ত্তা জননীর করুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে, আর এক শোকার্ত্তা জননীর স্মৃতি মনে পড়িল! তাহার প্রথম সন্তান, চার বছরের হৃষ্ট পুষ্ট, সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ বালক যখন হঠাৎ ধনুষ্টঙ্কার হইয়া চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মারা গেল, তখন আঃ পরমেশ্বর! সেদিন তরুণী মাতার কি মর্ম্মন্তুদ যাতনা শস্তুর দেখিয়াছিল! সে কি ভয়াবহ উদ্‌ভ্রান্ত ক্ষিপ্ততা! কি দুঃসহ দৃশ্য!

শস্তুর নিজেও সেদিন আকস্মিক শোকে বিহ্বল বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে পুরুষ। বহির্জগতের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে মিশিয়া, জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার জন্য, পরিবারের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের জন্য, তাহাকে কঠিন পরিশ্রমের কাযে আত্ম নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। নিশ্চিন্ত হইয়া নিভৃতে বসিয়া, বুকের মাঝে শোক ব্যথাকে পালন করিবার অবকাশ পায় নাই। কাযের ভিড়ে মানুষের ভিড়ে মিশিয়া শোকের আক্রমণ শীঘ্র পরাস্ত করিয়াছিল। বাহিরের কাযে বেশ সময় কাটাইত। কিন্তুবাড়ীতে ঢুকিলে মন অসহ্য হাহাকারে ভরিয়া উঠিত। শস্তুরের বৃদ্ধা জননী তখন বর্ত্তমান। পৌত্র-শোকাতুরা বৃদ্ধার কাছে গিয়া "মা" বলিয়া ডাকিতে ভয় হইত। শোকাচ্ছন্না স্ত্রীর বিষাদ-ক্লিষ্ট মূর্তির দিকে চাহিলে, অব্যক্ত যাতনায় বক্ষঃ চূর্ণ হইয়া যাইত। শোকার্ত্তার মাতৃ-হৃদয়ের অবস্থা ভাবিয়া, তাহার কঠোর চিত্ত—গভীর সহানুভূতিতে এমন

ভাব-প্রবণতায় অভিভূত হইত, যে—একটা কথা বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে পারিত না। নতমুখে স্তব্ধ হইয়া শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িত। জগতের আবহমানকাল প্রচলিত নিয়মগুলা সব ভুলিয়া যাইত। শুধু মনে হইত পৃথিবীতে তাহাদের যেমন সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, এমন আর কখনও কাহারও ঘটে নাই।

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় পরে বুঝিয়াছিল, পৃথিবীতে এমন অনেকের ঘটে। কালের নিয়মে মানুষ আবার সব ভুলিয়া যায়। কালের অনুশাসনে ক্রমে তাহাদেরও শোক কমিল। কিছুকাল পরে আবার তাহাদের একটি সুকুমার শিশু হইল। সকলে পুরাতন শোক ভুলিল, নূতন অতিথিকে লইয়া আনন্দ করিল। খন্তর মুগ্ধ-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—স্ত্রীর বিষণ্ণ শুষ্ক মুখে আবার হাসি ফুটিয়াছে!—ক্লান্ত ম্লান চক্ষে, উন্মাদ বাৎসল্য-স্নেহের জীবন্ত লীলা ক্রীড়া করিতেছে!

আজ অতর্কিতে সেই দৃষ্টি নূতন করিয়া দেখিল—ওই অপরিচিতা শিশু-বৎসলা নারীর ভীতি-ব্যাকুল দৃষ্টির মাঝে! খন্তরের মনে হইল,—উহা সেই একজাতীয়,—অন্ধ-মমতার উত্তেজনা! অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য!

কানহাইয়ালালের কথা শুনিতে শুনিতে খন্তর ক্রমে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। বহুকাল পরে অতীতের অনেক বিস্মৃত স্মৃতি আপনা-আপনি মনে পড়িতে লাগিল।—মনে পড়িল, সেই শিশু-বৎসলা স্নেহময়ী মাতাটি দ্বিতীয় শিশুর দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, একদণ্ড স্থির থাকিতে পারিত না। বুভুক্ষিত স্নেহ ব্যগ্রতার প্রবল উত্তেজনায়, তাহার আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ঘুচিয়া যাইত। স্বাস্থ্য নষ্ট হইত।—মনে পড়ে, কতদিন গভীর রাত্রে ষ্টেশনের কায সারিয়া খন্তর আসিয়াছে। দুয়ার খুলিয়া দিবার জন্য মাকে বা স্ত্রীকে ডাকিতে গিয়া পথের পাশে গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়াছে।—অবাক হইয়া দেখিয়াছে,—নিস্তব্ধ কুটীর মধ্যে খন্তরের

মাতা ঘুমাইতেছেন, ক্ষুদ্র শিশুটা সুস্থ শরীরে অগাধে ঘুমাইতেছে। আর শিশুর জননী—ঘুমন্ত শিশুর মুখের কাছে প্রদীপ ধরিয়া, অতৃপ্ত আকুল দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে! খন্তর ডাকিতে ভুলিয়া যাইত। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটিত। স্নেহময়ী জননীর ধ্যানমগ্নতা টুটিত না। হায়, কোথায় আজ সেই স্নেহের শিশু? কোথায় সেই অন্ধ-মমতাময়ী মাতা? কোথায় সেই স্বর্গীয় বাৎসল্য লীলা?

খন্তর ভুলিয়া গেল, পশু-জননীও সদ্যোজাত শাবক সম্বন্ধে প্রচণ্ড আগ্রহে উন্মাদ বাৎসল্য স্নেহের পরিচয় দিয়া থাকে। সেটা স্বর্গীয় ব্যাপার মনে করিলে অজ্ঞানীর হয়ত আপত্তি করিবার কিছু নাই, জ্ঞানীর হয়ত আপত্তি করিবার কিছু আছে,—সে তর্ক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তব জগতে দেখা যায়, সদ্যঃ প্রসূতা পশু জননীর অন্তরে, অন্ধমমতাভরা বাৎসল্য স্নেহ যথেষ্ট আছে। তাহার প্রাথর্য্যও উদ্দাম উৎকট!

খন্তর অন্যমনে ভাবিতেছে, সুমার সহসা ফুলটা তাহার কোলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "কি ভাব্‌ছিস খন্তরা?"

খন্তর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। ঢোঁক গিলিয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "কই? কি আর…?"

কিন্তু তাহার বিষণ্ণ-ম্লান মুখে চোখে যে গভীর শোকের নীরব-দাহ-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সঙ্গী দু'টির দৃষ্টি এড়াইল না। কানহাইয়ালালের প্রগল্‌ভতা চকিতে স্তব্ধ হইল। সুমার সসঙ্কোচে দুঃখের সহিত বলিল, "কেন মন খারাপ করিস্‌ ভাই? যারা চলে গেছে, তারা ত দুষ্‌মন! ভুলে যা, তাদের কথা ভুলে যা।"

খন্তর সনিঃশ্বাসে ম্লান হাসি হাসিল। সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এবার শিবরাত্রির উপবাস কবে?"

"কর্‌বি না কি ?"

"হাঁ—ঘা যদি শুকিয়ে যায়।"

"এত ভুগ্‌লি, শরীর কাহিল। এর উপর উপবাস ? ডাক্তার শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন যে।"

ক্লেশ ভরে হাসিয়া পরিহাসের সুরে খন্তর বলিল, "করেন ধনপৎ সিংয়ের মত জবাব দেব। উকীল বলেছিলেন 'বাপু তুনিত দু'পয়সার ছাতু আর লঙ্কা খেয়ে দিন কাটাও। থলে থলে টাকা দণ্ড দেবার জন্যে পরের মাথা ফাটাও কেন ?' ধনপৎ সিং জবাব দিলেন—'হুজুর, আমি যদি পরের মাথা না ফাটাই, তাহলে আপনার পেট ভর্‌বে কি করে ?' আমরাও যদি দোষ ঘাট করে রোগ না ধরাই—ডাক্তাররা খাবেন কি ?"

বলিয়া পুনরায় হাসিতে চেষ্টা করিল।

নিজের মনের বেদনা গাম্ভীর্য্যের গুমট কাটাইবার জন্য,—নিজেকে ভুলাইবার জন্য খন্তর বড় কষ্টে রসিকতার চেষ্টা করিতেছে, লঘু কৌতুকে হাসিতে চাহিতেছে, সঙ্গীরা তাহা বুঝিল কি না বলা যায় না। কিন্তু কেহ সে কৌতুকে যোগ দিল না।

সুমার নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দূর রাস্তার দিকে অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল। কানহাইয়ালালও সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা সুমার বলিল, "ছোট ডাক্তারবাবু। নয় রে ?"

খন্তর হেঁট হইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া ছিল। এবার পথের দিকে চাহিল। দূর হইতে স্পষ্ট ঠাহর হইল না, কিন্তু পাঁশুটে রঙের পোষাক-পরা একজন সাইকেল আরোহীকে দেখিয়া অনুমানে বুঝিল তিনিই আসিতেছেন বটে। তার বাবুর বাড়ীর কাছে গিয়া তিনি নামিলেন। কাহাকে যেন ডাকিলেন। একজন চাকর আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেল।

তার বাবুর পুত্রের অসুখ শোনা গিয়াছিল। তিন জনে সেই কথা আলোচনা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ডাক্তার বাহিরে আসিলেন। সাইকেল চাপিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া একবার ইহাদের দিকে চাহিলেন। কি একটু ভাবিলেন। তার পর মাঠের পথে নামিয়া দ্রুত বেগে গাড়ী চালাইয়া এই দিকে আসিতে লাগিলেন।

কুটীরের দিকে হাত বাড়াইয়া খন্তর বলিল, "কুর্সি টা বের কর সুমার।"

সুমার চেয়ার বাহির করিয়া আনিল।

সুমারের বৃদ্ধ পিতা সেই সময় নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স ও সম্পর্কের দিক হইতে বৃদ্ধটি পল্লীর সকলের মুরুব্বিস্থানীয় ছিলেন।

ডাক্তার আসিয়া সাইকেল হইতে নামিলেন। সুশ্রী সুন্দর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যুবা। উৎসাহ, উদ্যম, প্রফুল্লতা এবং দৃঢ় স্বাস্থ্যের যেন জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। মুখমণ্ডলে শিশুসুলভ সরলতা এবং আনন্দপ্রিয়তার সঙ্গে—অনমনীয় বলিষ্ঠ-মানসিক শক্তির পরিচয় পরিস্ফুট।

সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। প্রত্যভিবাদন করিয়া তিনি বলিলেন, "কি হে ক্ষেত্রপাল? পা' কেমন?"

ক্ষেত্রপাল অর্থাৎ বিহারী ভাষায় 'খন্তর' উত্তর দিল "আগের চেয়ে টাটানি কমেছে। তার বাবুর ছেলেকে কি রকম দেখ্‌লেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "সুবিধা নয়। সকালে দেখে সন্দেহ হয়েছিল, এখন তাই আবার দেখ্‌তে এসেছিলাম। বাড়ীর লোক এখনও বুঝ্‌তে পারেনি। কাল পারবে। বসন্ত বেরিয়েছে। তোমরা সাবধানে থেক। ওষুধ খাও, কিম্বা টিকে নাও। চারিদিকে বেশ বসন্ত হচ্ছে।"

বসন্তের প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পল্লীর শিশুদের এ সময় যেরূপ সাবধানে রাখা উচিত, সে বিষয়ে সকলকে বিশেষ সতর্ক হইতে অনুরোধ করিলেন।

সুমার চেয়ারটা আগাইয়া দিয়া বলিল, "বসুন হুজুর।"

ডাক্তার বলিলেন, "না। বসন্ত রোগীর বিছানায় বসেছিলাম। এ পোষাকে ও-চেয়ারে বস্‌ব না। সাবধান হওয়াই ভাল।"

তার পর খন্তরের দুধের বরাদ্দ বাড়িয়াছে কি-না, ঔষধ-পথ্যাদি ঠিক মত খাইতেছে কি-না,—ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া উৎসাহসূচক স্বরে বলিলেন, "ভাল করে খাও, চট্‌পট্‌ সেরে উঠ্‌বে। ভয় কি? যোয়ান ছেলে তুমি, স্বাস্থ্য ভাল, মন পবিত্র, সদাচারে থাক। তোমার সেরে উঠার ভাবনা কি? হপ্তা খানেকের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসি এখন?"

বিদায় সম্ভাষণ করিয়া ডাক্তার প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

সুমারের বৃদ্ধ পিতা এতক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে ডাক্তারের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এবার সবিনয়ে বলিলেন, "হুজুরের কাচ্চা বাচ্চা ক'টি?"

ডাক্তার প্রসন্ন স্মিত মুখে বলিলেন, "ভগবানের অনুগ্রহে কিছু নেই বাপু।"

বৃদ্ধ গভীর পরিতাপের সহিত বলিলেন, "আহা হা! কিচ্ছু নেই?"

অবস্থা শোকাবহ হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া খন্তর বিব্রত হইল। বৃদ্ধের উদ্দেশে নিম্নস্বরে বলিল, "উনি এখনও বিয়ে করেননি।"

বৃদ্ধের শোক যদি বা দূর হইল, বিস্ময়ের উত্তেজনা এত বাড়িয়া উঠিল যে, সেটাকে বিরক্তির রূপান্তর বলা চলে। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিলেন, "কেন? বয়েস হয়েছে, স্বাস্থ্য ভাল, এমন চমৎকার চেহারা! রোজকার করছেন। তবু?…সে কি? কেন?"

বৃদ্ধের উত্তেজনা দেখিয়া ডাক্তারের মুখ চকিতে প্রচ্ছন্ন কৌতুক হাস্যে

উজ্জ্বল হইল! পর মুহূর্ত্তে মুখ গম্ভীর করিয়া বৃদ্ধের উদ্দেশে সবিনয়ে বলিলেন, "গ্যাখো বাপু, ভাগ্যে তুমি ছিলে! বড় কৃতজ্ঞ হলুম। পুরানো মানুষরা ছাড়া, আর কেউ আমার দুঃখে সহানুভূতি বোধ করে না। তোমাদের পাড়ার এই বেয়াড়া ছোক্‌রাগুলা—"

বলিয়া শুস্তরের দিকে আঙুল দেখাইয়া পরম দুঃখে, অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "এরা বলে কি জান? বলে 'আপনি বিয়ে করেননি, কাচ্চা বাচ্চা নেই—আপনি বেশ শান্তিতে আছেন।' কিন্তু তুমিই বল ত বাপু, নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিতে জীবন কাটান,—সে কি সহজ ঝঞ্ঝাট? তোমাদের শুস্তরার না হয় পা'ই খোঁড়া হয়েছে। তা বলে ওই কথা বলাই কি ভাল? বল তুমি?"

অনুরুদ্ধ বৃদ্ধ সখেদে বলিলেন, "শুন্‌বেন্ না। ও ব্যাটা, দুনিয়া-ছাড়া মানুষ! আমার কথা শুনুন, বিয়ে করুন। সুখে থাকবেন। আপনারা ব্রাহ্মণ?"

ডাক্তার এবার ঈষৎ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "বাপ্! আবার জাত কুলের খবর চাই? পাত্রী টাত্রী সন্ধানে আছে না-কি?"

ডাক্তারের অনুযোগ অভিযোগের ছটায় বৃদ্ধ মুরুব্বিটির আত্মসম্মান-জ্ঞান ক্রমশঃ প্রখর হইয়া উঠিতেছিল। এবার মহা উৎসাহে সদর্পে বলিলেন, "হুকুম দিন্! সন্ধান নিতে কতক্ষণ? বলুন-না, ক'টা চাই? আপনার দেশের বামুন, কায়েত, বদ্যি, এখানে ঢের আছে। তাদের ঘরে ঘরে কত সুন্দরী পাত্রী রয়েছে—"

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, "থাক্‌বে বই কি। আপত্তি কর্‌বার অধিকার নেই। কিন্তু তুমি কার উপর রাগের ঝাল্ ঝাড়বার জন্যে,—হঠাৎ আমাকে জবাই করতে ক্ষেপে উঠ্‌লে, তা ত বুঝ্‌লাম না। শুস্তরের উপর বুঝি?"

খন্তর নতমুখে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কান্হাইয়ালাল যেখানে যত বাকচাতুরী করুক, ইংরেজি পোষাক পরা ভদ্রলোক দেখিলে আর তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত না। সুতরাং সসঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। সুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া কি যেন বলিতে গেল।—বৃদ্ধ বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "খন্তরার উপর রাগ্‌ব না? একশো বার রাগ্‌ব। ও কালকের ছেলে, দুধের বাচ্ছা। ওর মত বয়েসে কত লোকের বিয়েই হয় না। মাথার উপর মা ভাই ছিল,—অল্প বয়েসে বিয়ে দিয়েছিল, ছেলে পুলে হয়েছিল। তার পর ঈশ্বরাধীন কায, অসময়ে না-হয় গেছেই সব। তা বলে, ও ছোঁড়া আমাদের চোখের উপর এই বয়স থেকে সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে? সাগা কর্‌বে না?"

"কি মুস্কিল!" বলিয়া পকেট হইতে নস্যের কৌটা বাহির করিয়া ডাক্তার নস্য টানিতে মনোযোগী হইলেন। আর কথা কহিলেন না।

বৃদ্ধ জেদের সহিত বলিলেন, "আপনারা পাঁচজন ভদ্র লোক আছেন। ওকে বুঝিয়ে বলুন। সাগা করুক।"

ডাক্তার রুমালে নাক পরিষ্কার করিতে করিতে নির্লিপ্ত ভাবে বলিলেন, "আগে শরীরের উন্নতি করুক। খেটে খুটে পয়সা কড়ি জমাক্। তা' পর ইচ্ছা হয়, বিয়ে কর্‌বে, না ইচ্ছা হয়, করবে না। তার জন্যে আমারও ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, তোমাদেরও বিরক্ত হওয়ার দরকার নেই। নিজের অবস্থা বিবেচনা করে,—খন্তর ঠিক পথে চল্‌বে। হিতাহিত বোঝবার মত বুদ্ধি ওর আছে বলেই বিশ্বাস করি।"

বৃদ্ধ হতভম্ব হইয়া সুমারকে দেখাইয়া বলিলেন, "হুজুর, আমি যদি কাল মরি,—আমার এই ছেলে রয়েছে। আমার নাম রাখ্‌বে। কিন্তু ঈশ্বর না করুন, খন্তরার যদি কাল কিছু হয়—"

নস্যের কৌটা পকেটে ফেলিয়া ডাক্তার বলিলেন, "বুঝেছি। কিন্তু

হাজার হাজার বৎসর ধরে যাঁদের নাম জগতে অক্ষয় অমর হয়ে আছে, তাঁরা ত পুত্র নামে খ্যাত ন'ন।—সকলেই স্বনাম খ্যাত। বংশ পরিচয় যিশু খৃষ্টকেও দাবিয়ে রাখেনি, শঙ্করাচার্য্যকেও ঠেলে তোলেনি। তোমাদের বুধ গয়ার বুদ্ধ দেবকে চেন ত? তাঁর অত বড় নামটা, ছেলে রাহুল বাবাজীর অনুগ্রহে সুবিখ্যাত বলে শুনিনি। শুনেছি নিজের সাধন বলেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ। খামকা কুতর্ক কর কেন?"

তার পর—বোধ হয় এ প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্যই, খন্তরের ফুলটার দিকে চাহিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "সকালে ওই ফুলটা দিয়ে গিয়েছিলাম, নয়? বাঃ, এখনো টাট্‌কা আছে! খাতির করে রেখেছ দেখ্‌ছি। ধন্যবাদ! কাল আবার ফুল আন্‌ব। আসি তাহলে এখন?"

ডাক্তার সাইকেলে উঠিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

একটা নির্ম্মল পবিত্র সৌরভময় দম্‌কা বাতাস যেন এই নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলার নীচ-ধারণা-ক্লিষ্ট মনের উপর দিয়া বহিয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য সকলেই কেমন একটা অজ্ঞাত পরিতৃপ্তির আভাস অনুভব করিল। সম্ভ্রমমুগ্ধ দৃষ্টিতে ডাক্তারের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া খন্তর বলিল, "হাঁ! একটা মানুষ!"

কানহাইয়ালাল ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া খাটিয়া ছাড়িয়া এতক্ষণ নিরীহভাবে এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। এবার পূর্ব্বস্থানে জাঁকিয়া বসিল। তর্জ্জন করিয়া বলিল, "সব ভাল! তোকে ফুল দিয়ে খুশী করেন, তাও ভাল। কিন্তু নিজেও বিয়ে করব না, অপরকেও তাই সলা দেব, এ মতলব ভাল নয়। খন্তরা ঐসব দলে ঢুকে বখা হয়ে গেছে। তাই সাগা করতে চায় না, বটে!"

ঠিক সেই সময় দেখা গেল,—মনোরমা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া একটি ছোট মেয়েকে সঙ্গে লইয়া মাল বাবুর বাড়ীর দিকে যাইতেছে। সেই

দিকে কানহাইয়ালালের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থন্তর ত্রস্তে বলিল, "যাও যাও, সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দাও। রোগা ছেলেটিকে হয়ত উনি নাড়া চাড়া করে যাচ্ছেন। ডাক্তারের কথা জানিও। সাবধান করে দিও।"

কানহাইয়ালাল উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

স্থানীয় আবহাওয়া সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনার পর থন্তর বলিল, "ওরে সুমার, বেলা পড়ে এসেছে। তোর ডিউটিতে যাবার সময় হোল। আমাকে ঘরে তুলে দিয়ে যা ভাই।"

থন্তরকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া সুমার কাযে চলিয়া গেল। নির্জ্জন কুটীরে একা শুইয়া থন্তর তুলসীদাসের দোঁহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

৬

বিছানায় পড়িয়া, কিছুক্ষণ দোঁহা আওড়াইয়া থন্তর শ্রান্ত হইল। পাশের খোলা গবাক্ষ দিয়া বৈকালের ম্লান আলো আসিতেছিল। সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া হিন্দী অক্ষরে ছাপা শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা খুলিয়া নীরবে পাঠ করিতে লাগিল।

থন্তরের বাড়ীখানি পল্লীর অপর সাধারণ বাড়ী অপেক্ষা কিছু ভাল। উঁচু দাওয়ার উপর দু'খানি শয়নকক্ষ। খাপ্‌রার চাল। ওদিকে গোশালা ও রান্নাঘর পাশাপাশি। আঙিনাটি প্রশস্ত। চারিদিকে মাটীর প্রাচীর। 'বিশুয়ার মা' নামে পরিচিতা, এক দরিদ্র বৃদ্ধা প্রতিদিন আসিয়া থন্তরের জল তোলা, বাসন মাজা, ঘর দুয়ার পরিষ্কার করা, এবং হাট বাজার ও খুচরা ফাই ফরমাস খাটিয়া যাইত। বাকী সমস্ত কায, স্বাবলম্বী থন্তর নিজে করিয়া লইত। তাহার জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল অনাড়ম্বর সরল। দীন দরিদ্র প্রতিবেশীদের মত তাহার আহারের ব্যবস্থা

হার, একান্ত সাদাসিধা। যাহা সহজে পাওয়া যায়, সহজে প্রস্তুত করা যায়, সহজে পরিপাক করিয়া দেহ সুস্থ সবল রাখা যায়, এইরূপ আহার্য্যের সে পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং কোন কিছুর জন্য সে কাহারও মুখাপেক্ষী ছিল না, অভাব বলিতে কোন চিন্তাকে মনে ঠাঁইও দিত না।

এত দিন এই ভাবে বেশ চলিয়াছিল। কিন্তু এবার গোলযোগ বাধিয়াছিল এই রোগশয্যায় পড়িয়া। হাঁসপাতাল হইতে আসিতে চায় নাই। শনিচর সুনার প্রভৃতি ভাই বেরাদারগণ জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছে। খন্তরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহারা যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। কিন্তু ইহারা সকলেই দরিদ্র, অন্নচেষ্টায় সর্ব্বদা বিব্রত। তার পর দরিদ্র গৃহের যাহা নিত্যধর্ম্ম—পারিবারিক অসুখ অশান্তিতে সকলেই অল্পবিস্তর কাতর। খন্তর ইহাদের অবস্থা বোঝে। অক্ষম হইয়া আজ প্রতিপদে ইহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে মনে মনে ক্লেশ বোধ করিতেছে। তবে সান্ত্বনার কথা এই, কাহারও কাছে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই, বরঞ্চ সে বিষয়ে ইহারাই খন্তরের কাছে সাহায্য পায়। ইহাতে খন্তর স্বস্তি বোধ করে।

ধৈর্য্যসংহত চিত্তে নিজের বর্ত্তমান অবস্থাটা নীরবে সহ্য করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু প্রতিবেশীরা উত্তরোত্তর অসহিষ্ণু হইতেছিল। তাহাদের সশব্দ প্রতিবাদ ক্রমশঃ মাত্রা ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। অর্থ সামর্থ্য থাকিতে খন্তরের মত একজন যুবা কেন পত্নী-পুত্রহীন জীবনের ক্লেশ ভোগ করিবে, কেহ তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছিল না।

খন্তর নীরবে গীতা পাঠ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সুনারের পিতা হুঁকা হাতে, ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন, "কি করছিস্ রে?"

খন্তর লজ্জিতভাবে বহি বন্ধ করিয়া সোজা হইয়া বসিল। বিছানার পাশে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, “বস, চাচা।”

বৃদ্ধ বসিয়া বলিলেন, “ওখানা কি বই পড়্‌ছিস?”

খন্তরের ধর্ম্মনিষ্ঠার উৎসাহ তাহার চিত্তের পবিত্রতা বা উন্নতি সাধনের হেতু বলিয়া বৃদ্ধগণ স্বীকার করিতেন না। উহা তাহার আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা বা আত্মপ্রবঞ্চনার কৌশল বলিয়া মনে করিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত ছিল, অত্যন্ত জটিল অস্পষ্ট এবং দুর্ব্বোধ্য। ধর্ম্মচর্চ্চা যে আত্মোন্নতি সাধনের উপায়, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা যখন গঞ্জিকারক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উদারভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে বসিতেন, তখন আর কেহ না হউক, খন্তর মনে মনে বিলক্ষণ শঙ্কিত হইত। সুতরাং কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, “গীতা।”

বৃদ্ধ আর কিছু বলিলেন না। গম্ভীর হইয়া তামাক টানিতে টানিতে ঘরের চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঘরে আসবাব পত্র সামান্যই, তবু যাহা আছে তাহা অপর সাধারণ দরিদ্র গৃহের তুলনায় অসামান্য। বিশেষতঃ আনলায় টাঙানো, খন্তরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রঙ্‌ বেরঙের জামা কাপড় পাগড়ি এবং পূজাহ্নিকের আসবাব ও ঠাকুর দেবতাদের পটের বাহার সকলের আগে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই সব সৌখিনতায় বাজে খেয়ালে পয়সা নষ্ট করার দুর্নাম খন্তরের ছিল। পাড়ার বৃদ্ধগণ সেজন্য তাহাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেন না। পুরুষানুক্রমিক দারিদ্র্যে, দুর্গন্ধময় অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে কায়ক্লেশে বহু পরিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে যেখানে জীবন কাটায়, সেখানে একজনের এই সচ্ছলতা এবং পরিচ্ছন্নতা রুচিজ্ঞান মার্জ্জনীয় নয়। খন্তর জানিত অনেকের চক্ষে সেটা অসহনীয় বিলাসীতার মত ঠেকে।

বৃদ্ধের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া খন্তর আরও কুণ্ঠিত হইল।

সসঙ্কোচে বলিল, "সুমারের বাচ্চা বেটীটা কি কর্‌ছে? তাকে নিয়ে এলে না কেন?"

তাহার মাতা এ সময় গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিত বলিয়া বৃদ্ধ পৌত্রীকে আট্‌কাইয়া রাখিতেন। প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "সে আজ ঘুমিয়েছে। তুই একা কি কর্‌ছিস তাই দেখ্‌তে এলুম। রাতের খাবার শনিচরের ওখান থেকে আস্‌বে ত? কে আনে?"

"বিশুয়ার মা আনে। কোন কোন দিন শনিচব কি চাচিও আনে।"

এই সময় শনিচর ঘরে ঢুকিল। লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। মুখে সর্ব্বদা প্রগল্‌ভতা-ব্যঞ্জক হাসি। চক্ষে গঞ্জিকাভক্তের আরক্ত আভা। কিন্তু সে উগ্র প্রকৃতির মানুষ নয়। প্রায়শঃ খোশ মেজাজে থাকিত।

শনিচরের হাতে গরম দুধের বাটি ছিল। খন্তরকে দুধ খাওয়াইয়া বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া তক্তপোষের প্রান্তে বসিল। বলিল, "ওরে, আমি রাতে লাঠি খেল্‌তে থানায় কনেষ্টবলদের ওখানে যাব। বিশুয়ার মাকে বলিস যেন খাবারটা আনে।"

"আচ্ছা।"

কিছুক্ষণ এ-কথা ও-কথার পর বৃদ্ধ বলিলেন, "হ্যাঁরে শনিচর, বড়বাবুর বাড়ীর ওই দাই,—বহুর বহিনের কথা বল্‌ছি, বুঝেছিস? ওকে দেশে পাঠাবার কি হোল?"

বক্র কটাক্ষে খন্তরের দিকে একবার চাহিয়া শনিচর নিস্পৃহের মত বলিল, "যেতে চায় না। থাকেই বা কার কাছে? দেশেও মা ভাই কেউ নেই। এখানে আমার ছেলে মেয়েরা আছে, বাবুর ছেলেটিকে মানুষ করছে। ওদের মায়ায় পড়েছে। এখানে থাক্‌তে চায়।"

বৃদ্ধ উষ্ণভাবে বলিলেন, "থাক্‌তে চায় ত সাগা করুক। ও বয়সের

মেয়ে, রূপ আছে,—একা বস্তির মধ্যে বাস করা চলবে না! শেষে একটা কেলেঙ্কারী হবে?…।”

পল্লীর উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বৃদ্ধ এ সম্বন্ধে আরও কতকগুলা অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

ইহাই এ পল্লীর চিরন্তন রীতি। এই নিম্নশ্রেণীর সমাজে দীর্ঘকালের কুসংস্কার মাহাত্ম্যে, মানুষের দৈহিক যৌবন—শুধু ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল বিলাসিতার জয়গানে মাত্র পর্য্যবসিত। নরনারীর দেহেন্দ্রিয়-গত বাসনা-বিকারের উদ্দাম মত্ততা,—ইহাই তাহাদের জীবনে, আনন্দলোকের আবাহন উৎসব। ইহাই যৌবনের জয়যাত্রার একান্ত সার্থকতা। অবশ্য সকল সমাজের মত ইহাদের সমাজেও ধর্ম্মপ্রাণ, সংযম-পূত চরিত্রের নর-নারী কতকগুলি আছে। অনাচারের দণ্ডভোগ করিয়া, রোগ শোক দারিদ্র্যের কশাঘাতে আহত হইয়া জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক হইয়াছে, এমন লোকের সংখ্যাও ইহাদের মধ্যে অনেক। তবু সুশিক্ষা সুদৃষ্টান্তের অভাবে, অনভিজ্ঞ মূঢ় প্রকৃতির মানুষ এখানে প্রচুর। তাহাদের দুর্ব্বৃত্ততা দমনের জন্য পঞ্চায়েত বিচার, অর্থদণ্ড, আরও বহুবিধ রূঢ় শাস্তির ব্যবস্থা আছে। পরিণত বয়স্ক মুরুব্বিগণ গাঁজা ভাং খাইয়া, নেশার ঝোঁকে প্রবল দর্পে সর্ব্ববিধ সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করেন। পুলিশ হাঙ্গামা ইহারা সাধ্যপক্ষে এড়াইয়া চলে।

অধুনা খন্তর প্রভৃতি জনকয়েক যুবা ‘মাথা ধরা’ হইয়া উঠিয়াছে, পল্লীর নেতৃবৃন্দ আজকাল পরামর্শ সভায় তাঁহাদেরও ডাকেন।

পল্লীবাসী অবিবাহিত বা বিপত্নীক যুবা এবং বিধবা যুবতীদের মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ ঘটাইয়া দিয়া, সামাজিক জীবনের অনাচার নিবারণ করাই ছিল পল্লীর চিরাচরিত প্রথা। সে অবস্থায় কেহ বিবাহে অনিচ্ছুক হইলে ইহাদের ক্রুদ্ধ শাসনের শেষ থাকিত না। খন্তর না কি উপার্জ্জনশীল

পরোপকারী সংস্বভাবের ছেলে, তাই আপত্তি সত্ত্বেও তাহার প্রতি উপদ্রব চলে নাই। কিন্তু কোথাকার কে,—একটা দূরের কুটুম্ব-কন্যা আসিয়া পল্লীর সামাজিক শান্তিভঙ্গ করিবে, ইহা নিতান্ত দুঃসহ।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু কাণে গিয়াছে। আবার সেই আলোচনা? খন্তর বুঝিল অনাথা নারীর বিরুদ্ধে রীতিমত ঘোঁট পাকাইয়া উঠিতেছে। মনে মনে বিরক্তিবোধ করিল।

ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। লণ্ঠনটা নিকটে টানিয়া, হেট মুখে দেশলাই জ্বালিতে জ্বালিতে খন্তর বলিল, "মেয়েটির কোন দোষ ঘাট কেউ দেখেছ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না, না। কিন্তু হতে কতক্ষণ? অল্পবুদ্ধি মেয়ে ত? মাথার উপর তেমন মুরুব্বি বা কই?"

পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অসৎ প্রভাবের কথা খন্তরের মনে পড়িল। শনিচর বয়সে খন্তরের চেয়ে বড়। ঘরে মাতা আছে, স্ত্রী কন্যা আছে, আর্থিক অভাব আছে। তথাপি সে নিজে শিথিল-চরিত্র ব্যক্তি। তাহার অভিভাবকত্বে ভরসা কই? পল্লীও ভাল নয়। এরূপ আবেষ্টনের মধ্যে একজন পতিপুত্রহীনা যুবতী নিরাপদে বাস করিতে পাইবে, ভাবিতে সাহস হইল না। চুপ করিয়া রহিল।

শনিচর বলিল, "ভিখুয়া ওকে সাগা করতে চাইছে। জগুয়ার বহু, ছুটো তিনটে ছেলে রেখে মরে গেছে। তার বুড়ো মা সাধাসাধি করছে জগুয়ার সঙ্গে সাগা দেবার জন্যে। কিন্তু পার্ব্বতিয়া ঝেড়ে জবাব দিয়েছে। কাউকে সাগা করবে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "শোকে দুঃখে মেজাজ খারাপ হয়েছে। ওরকম বলে সবাই। ওদের ধরে-বেঁধে সাগা দেওয়াই ঠিক। আজ মনের গতি এক রকম আছে, কাল অন্য রকম হতে পারে।"

একটু অসন্তুষ্ট ভাবে খন্তর বলিল, "নাও হতে পারে। ভবিষ্যতের কথা কে বল্‌তে পারে? এত পীড়াপীড়ি করা কেন?"

বৃদ্ধ অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, "তুই নিজের মত সবাইকে মনে করিস্?"

আলোর সামনে গীতা খুলিয়া, সেই দিকে ঝুঁকিয়া খন্তর বলিল, "আমার চেয়ে ভাল লোক সংসারে ঢের আছে। সে কথা নয়। কিন্তু সন্তান-শোক, মার প্রাণে কেমন লাগে, সে ত জানা আছে। এ অবস্থায় ও কথা তুলে কষ্ট দেওয়া কেন?"

"শেষ পর্য্যন্ত যা কর্‌তেই হবে, তার জন্যে কষ্ট বলে পেছিয়ে থাকা ভাল নয়। সাহসের সঙ্গে করাই ভাল। তোকেই জিজ্ঞাসা করি খন্তরা, শেষ পর্য্যন্ত এই জিদ্ বজায় রাখ্‌তে পার্‌বি?"

কুণ্ঠিত-ক্ষীণহাস্যে অনুনয়ের স্বরে খন্তর বলিল, "তোমরা সেই আশীর্ব্বাদ কর।"

উত্তেজিত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "কেন তোর তেমন সর্ব্বনাশ কর্‌ব? বরঞ্চ বলে রাখছি, দেখে নিস বুড়োর কথা ফলে কি না? এই যে আমাদের কথা শুনছিস না, দেখিস্ পরে এমন দিন আস্‌বে, যখন এর জন্যে তোকে অঝোরে কাঁদতে হবে!"

কথাটা নিতান্ত অভিশাপের মত শুনাইল। কিন্তু এই অসহিষ্ণু বৃদ্ধদের এই ধরণের মন্তব্য শোনা খন্তরের অভ্যাস ছিল, সুতরাং অবিচলিতভাবে গীতার পাতা উল্টাইতে লাগিল। কিছু বলিল না।

শনিচর বলিল, "খন্তরা, বুড়ো মানুষের কথা রাখতে হয়। শোন, বিজুয়ার মামা অমন সুন্দর মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি করছে—"

দৃঢ় স্বরে খন্তর বলিল, "না—।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না কেন? মেয়েটি সুন্দরী ত।"

বিরক্তির সহিত খন্তর বলিল, "হোক।—আমার আক্কেল নেই?

এই বয়সে একটা বার তের বছরের ছোট মেয়েকে সাগা করব কি? বরঞ্চ ভিখুয়ার সঙ্গে দিতে বল। ছোকরার বয়স অল্প, রোজকার পত্র কর্ছে, দেখতে শুনতে মন্দ নয়—”

শনিচর বলিল, “কিন্তু এর মধ্যে ভয়ানক গাঁজাখোর বদরাগী হয়ে উঠেছে।”

“তা হলে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিতে বল।”

“তারা তোকেই ভাল পাত্র বলে—”

“আহা,—জানিয়ে দিও আমি গাঁজা না খেয়েও ভিখুয়ার চাইতে বদ্‌রাগী। বিয়ের নাম শুনলে আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন ছড়িয়ে দেয়।”—বলিতে বলিতে অপ্রসন্ন মুখে খন্তর বিছানার সরু পাশ হাতড়াইয়া আর একখানি বহি টানিয়া লইল। বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল, “তুলসীদাসের দোঁহা পড়ব। চাচা শুনবে?”

বৃদ্ধ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, “রাখ্ রাখ্ খন্তুরা, ঢের শুনেছি। কাঁচা বয়স তোদের! এখন ও সবের সময় তোদের নয়। ওতেই তোর মন বাউরা হয়েছে। যে কথা হচ্ছে, সে কথায় মন দে।”

“বল।”—বলিয়া খন্তুর বহির পাতার দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধ অতিশয় নরম সুরে বলিলেন, “ছোট মেয়ে যদি তোর আপত্তি—ভাল। বড় বয়সের মেয়ে সাগা কর। শনিচরের বহুর বহিনকে দেখেছিস ত? মন্দ নয়। মত দে, ওর সঙ্গে ঠিক করি।”

গৃহিণীহীন গৃহের অসুবিধার কথা, সেবা শুশ্রূষার অভাবের কথা, বার্দ্ধক্যের আশা ভরসা সন্তানের কথা, অনেক কথাই বৃদ্ধ বলিলেন। খন্তর নীরবে সব শুনিল। তার পর মাথা নাড়িয়া ধীরভাবে বলিল, “সব ঠিক। কিন্তু একটা কথা তোমরা ভেবে দেখ্ছ না? আমিই বা ক’দিন বাঁচব? কেন এত হাঙ্গামা? এর চেয়ে সাধন ভজন নিয়ে, মনকে অন্য পথে

চালাচ্ছি,—মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। এতেই আমার পরম আনন্দ, আমি নির্ভয়! পৃথিবীতে আমার জন্যে কাঁদতে কেউ নেই, আমিও কারুর জন্য কাঁদতে চাই না। আবার সংসার পাতব? না, সে ইচ্ছা মোটে নেই। ও কথা ভুলো না কেউ। আমার ভয়ানক মন খারাপ হয়ে যায়।"

বৃদ্ধ হতাশভাবে শনিচরের মুখ পানে চাহিলেন। শনিচর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তুই বুঝ্‌ছিস না। সংসারে মন দে, মন ঠিক হয়ে যাবে। কে বল্‌তে পারে, তোকে এখন কতদিন বাঁচতে হবে? এখনো যদি তোকে তিরিশ বছর বাঁচতে হয়, এমন করে ক'দিন কাট্‌বে? একা বেঁচে থাক্‌তে হলে অশেষ দুর্গতি হবে। ক্ষেপে যাবি যে?"

খস্তরের চোখে জল আসিতেছিল,—চট্ করিয়া সামলাইয়া লইল। ম্লান-হাস্যে বলিল, "ক্ষ্যাপামিতে যাদের জন্মগত অধিকার, তারা সব-থাক্‌তেও নিজের মন বুদ্ধির দোষে সহজে ক্ষেপে যায়। অনেক দেখেছি।"

তার পর বালিশে মুখ গুঁজিয়া ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু সাগার কথা কেউ তুললে আমার বড় কষ্ট হয়। পুরান কথা সব মনে পড়ে।··· না, সে সব ভুলে যাচ্ছি, আমায় ভুলে যেতে দে। পৃথিবীতে কেউ কারুর নয়। একা এসেছি, একা যাব।—এই ভাল। নারায়ণ, নারায়ণ!"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আত্মসম্বরণের জন্য সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। দু-হাতের আঙুলগুলা দিয়া মাথার চুল নাড়া চাড়া করিতে লাগিল।

শনিচর স্তব্ধ হইল। বৃদ্ধ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "শোককে বুকের ভিতর পুষে, এই যে গুম্ খেয়ে থাকিস্ এতে ভয় করে। হঠাৎ একটা দারুণ অসুখ ধরাবি যে।"

নত মুখে ধীরভাবে খস্তর বলিল, "কিছু না। ভগবানের দিকে তাকিয়ে

থাক্‌লে সব সহ্য করা যায়। আমাদের সব চেয়ে বড় শাস্তি, ভগবানকে ভুলে যাওয়া! না, তাঁর বিচারের উপর আমার নালিশ নাই। তিনি ভাল বুঝেছেন, তাই আমার সব পিছ্‌টান্‌ ঘুচিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে অবস্থায় আমায় ফেলেছেন, এতেই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সুখের লোভ আমায় দেখিও না, ফের সংসার পাত্‌লে তার ফল আমার পক্ষে ভাল হবে না।"

অসন্তুষ্ট ভাবে শনিচর বলিল,—"এই গুলো তোর একগুঁয়েমি! আমি বাজি রেখে বল্‌ছি, তুই সাগা কর। একটা গিন্নি-বান্নি দেখে বড় মেয়ে ঘরে আন্‌, না হলে তোর মন স্থির হবে না। বল্‌ তুই, আমি এই মাসেই পার্‌বতিয়ার সঙ্গে—"

তাহার মুখ পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া খন্তর বাধা দিয়া বলিল, "তাই, তুই চাচাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে ধরে এনেছিস্‌, না?"

শনিচর বিচলিত হইয়া বলিল, "বাঃ, তা কেন?"

বৃদ্ধ অধিকতর বিচলিত হইয়া বলিলেন,"আর তাই যদি হয়, তাতে দোষ কি? বিয়ের যোগ্য ছেলে মেয়ে থাক্‌লে—সাগার কথা এমন হয় বৈ কি। তারও সব গেছে, আবার সব চাই। তোরও সেই অবস্থা। তোরা দু'জনেই শোকা-তাপা,—দু'জনে দু'জনের সান্ত্বনার আশ্রয় হতে পারিস্‌। পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌তে হলে সবই চাই বাবা। মেয়েটারও একটা আশ্রয় চাই, ওর কথা ভেবে দ্যাখ্‌।"

খন্তর নীরবে মাথা নাড়িল। মনে মনে বলিল, না, সে কাহারও কথা ভাবিবে না। ভাবনা হইতে পৃথিবীর সকল মঙ্গল, সব অমঙ্গল ডাকিয়া আনা যায়। নিজের চিন্তাকে সে জন্য সর্ব্বদা শাসনে রাখে।

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বগতোক্তির মত বলিলেন, "এমন একগুঁয়েমি কি চিরকাল চলে? কোন দিন মন বিগ্‌ড়ে যাবে, খেয়ালের ঝোঁকে

হয় ত কোথাকার-কে একটা মেয়ে ধরে আন্‌বি। তাতে হয় ত আমাদের মাথা হেঁট হবে। এ জানা-শোনা কুটুমের মেয়ে, এর সঙ্গে সাগা হলে সব দিকে ভাল। শনিচর, তুই বুঝিয়ে বল্।”

বৃদ্ধ হুঁকা টানিতে টানিতে প্রস্থান করিলেন।

শনিচর মুচ্‌কি হাসিয়া মিটি মিটি চক্ষে চাহিয়া বলিল, “তোর খাবারটা আজ তাকে দিয়ে পাঠাব? নিরিবিলিতে একটু মন জানা-জানি করেই ভ্যাখ্ না।···পছন্দ হবে।”

তিরস্কারের স্বরে খন্তর বলিল, “বকিস্ নি, যাঃ। তুই না হয় তার ভগিনীপতি কিন্তু আমার বড় ভাই নয়? ঠাট্টা কর্‌তে লজ্জা হয় না?”

“ঠাট্টা? তোর দিব্য নয়! তোর ভৌজি আমায় শিখিয়ে দিয়েছে। তার বড় ইচ্ছা, তুই তার বোনটার ভার নিস্!”

সহজ কথা বলিতে বলিতে সহসা তাহার কদভ্যাস-দীক্ষিত অসংযত রসনা, স্ত্রীর জবানিতে আরও এমন কিছু অশিষ্ট পরিহাসের বাণী বর্ষণ করিল, যাহা খন্তরের সংযম-শান্ত চিত্তকে নিমেষে তীব্র চমকে ত্যক্ত করিয়া তুলিল!

শব্দ ব্রহ্ম,—তাহার প্রভাবে উচ্চ দিকেও যেমন, নীচ দিকেও তেমন, মানুষের মন অসামান্য শক্তিতে আকর্ষিত হইয়া থাকে। দৃঢ়চেতা ব্যক্তি তাহার প্রভাব জয় করিতে পারে, দুর্ব্বল-চিত্ত তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়ে!

“রাম রাম” বলিয়া খন্তর কাণে হাত দিল। চকিতে আত্মদমন করিয়া অপ্রসন্ন মুখে বলিল, “একটা অভাগিনী স্ত্রীলোক, পতিপুত্রশোকে আধমরা হয়ে রয়েছে। তাকে নিয়ে এ সব ঠাট্টা তামাসা করতে লজ্জা হয় না? রুচিজ্ঞান খুব!”

“তা হোক, তোর খাবার নিয়ে তাকে আজ পাঠিয়ে দেব।”

"খবরদার্! যা, আজ খাব না।" খন্তর অত্যন্ত রুষ্ট হইল।

সন্ত্রস্ত হইয়া শনিচর বলিল, "মাপ কর খন্তরা, কসুর মাপ কর। সে নয়, বিশুয়ার মাকে দিয়ে পাঠাচ্ছি। রাগ করিস্ নি ভাই।"

"বিরক্ত করিস্‌নি যা। এমন অসংযত কথা বলিস শুনলে দিক্ ধরে।"—আহত পা খানা সরাইয়া খন্তর পাশ ফিরিয়া শুইল।

শনিচর আর তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিল না। বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া ত্রস্তে পলায়ন করিল।

৭

শনিচরকে ও সুমারের পিতাকে জবাব দিয়া খন্তর সে প্রসঙ্গ মন হইতে দূর করিল। কিন্তু আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ব যাহারা তাহাকে রোগশয্যায় দেখিতে আসিল, তাহারাই বার বার সে প্রসঙ্গটা ঝালাইয়া গেল। সকলের সেই এক কথা—"খন্তরের মত অবস্থার যুবকের শীঘ্র বিবাহ না করা মহা অন্যায়!"

মন বিপ্লব-পীড়িত হইল। সমাজের সংস্রব এড়াইবার জন্য খন্তর ব্যাকুলতা বোধ করিল।

চার পাঁচ দিন কাটিল। সেদিন সকালে উঠিয়া লাঠিতে ভর দিয়া ছোট ডাক্তার বাবুর কাছে গেল।

ডাক্তার তখন একজন রুগ্ন কুলি যুবকের হৃদ্‌পিণ্ড পরীক্ষা করিতেছিলেন। খন্তরকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া এক মনে নিজের কায করিতে লাগিলেন।

একটু পরে কাণ হইতে যন্ত্র খুলিয়া, ডাক্তার রোগীর কোটরগত চক্ষুর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে খানিক চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন, "উঁহুঁ, শুধু কুটুম-

বাড়ীর ভোজ নয়। আরও গুরুতর অত্যাচার করেছ। বল হাঁ কি না?"

স্নায়বিকদৌর্ব্বল্যপীড়িত রোগী নতশিরে ম্লান মুখে স্বীকার করিল, "হাঁ।"

ডাক্তার নিজের চেয়ারে বসিলেন। যৌবনের অসংযম অনাচারের বিষময় ফল, মানুষের দেহ, মন, বুদ্ধি এবং বংশাবলী কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, রুগ্ন, পঙ্গু করিয়া ফেলে, তাহার বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ বলিতে লাগিলেন।

শঙ্কর গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল। আশ্চর্য্য হইল—বিজ্ঞানের এই মূল নীতিগুলার সঙ্গে, ধার্ম্মিকদের সদাচার নিষ্ঠার সামঞ্জস্য ত খুব। কিছু রকম-ফের হইয়া হয় ত বা কিছু বাহ্যিক স্থূল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া, এই নীতির সূক্ষ্ম ধারা, তাহারা ধর্ম্মজীবনের কল্যাণের জন্য পালন করিবার উপদেশ পায়। বলা হয়, উহাতে লক্ষ্মী শ্রী সংসারে আসে। আত্মার মঙ্গল হয়।

ডাক্তার সদাচার সুনিয়ম পালনের জন্য রোগীকে উপদেশ দিলেন। ব্যবস্থাপত্র লিখিলেন। তাহাকে বিদায় দিবার সময় শঙ্করকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই লোকটিকে ছাখ। বেচারা পায়ে ভয়ানক চোট্ খেয়েছিল। সে চোট্ তোমার পায়ে লাগলে, তুমি তিন মাস পড়ে থাক্‌তে। এ লোকটি সদাচারী, সংযমী। তাই পনের দিনে খাড়া হয়েছে। যাতনায় ক'দিন খুব কষ্ট পেয়েছে, তবু দেখ এর মুখে চোখে কি সুন্দর স্বাস্থ্যের লাবণ্য!—রোগ দুঃখ এড়াতে চাও ত মিতাচারী হও। মন পবিত্র কর, অসংগত উপভোগের লোভকে সংযত কর। খাসা সুস্থ সবল হয়ে বেঁচে থাকবে।"

অভিবাদন করিয়া লোকটা প্রস্থান করিল।

ডাক্তার দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "ছ মাস আগে এই লোকটাকে দেখেছিলাম, যেন পাথরে কোঁদা একটা নিখুঁত নিটোল, দৈত্য মূর্ত্তি! তার

পর একটা হীনবুদ্ধি মেয়ের সঙ্গে শুভ বিবাহ,—আর শুভ উচ্ছন্ন যাত্রা! এত অধঃপাতে গেছে যে সৎপরামর্শ ধারণা করবার বুদ্ধি পর্য্যন্ত লোপ! এখন একে বাঁচানো শক্ত। খন্তর, যদি কখনো বিয়ে কর,—সুবুদ্ধিমতী মেয়ে দেখে বিয়ে কোর। নইলে মোটে কোর না।"

"ইচ্ছা তাই। গোটাকতক আহাম্মক পিছনে লেগেছে—সাগার জন্য জ্বালিয়ে মারছে। কাল থেকে কাযে বেরুবার হুকুম দেন ত, এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই।"

ডাক্তার তাহার আহত স্থান পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন, "আর দু'দিন সবুর কর।"

ঘরে আসিয়া খন্তর শুইল। কুলি যুবকটির কথা বার বার মনে পড়িতে লাগিল। কদাচারের ক্রীতদাস বেচারা! সব আত্মশক্তি হারাইয়াছে! দেখিলে দুঃখ হয়। আহা, আজ যদি খন্তরের বড় ছেলেটি বাচিয়া থাকিত,—তবে নিজে সুশিক্ষা দিয়া ছোটবেলা হইতে তাহাকে এমন সুগঠিত চরিত্রের মানুষ করিয়া তুলিত, যেন তার চরিত্র-প্রভাবে সমাজের দূষিত আবহাওয়াও বদলায়! ছোট ছেলেটি কয়মাসেই মস্তিষ্ক বিকার পীড়িত হইয়া মারা যায়। মনে হয় জননীর শোকাচ্ছন্ন অসুস্থ অবস্থার সন্তান বলিয়া সে অমন ক্ষীণজীবী ছিল। বাঁচিলে, হয় ত তেমন সুস্থ সবল কাযের লোক হইত না। সেটার জন্য তত কষ্ট হয় না। বুক ভাঙিয়া যায়, বড় ছেলের কথা মনে পড়িলে! পিতা-মাতার উৎকৃষ্ট শারীরিক মানসিক অবস্থার সন্তান।—যেমন স্বাস্থ্য-সবল দেহ, তেমনি সুশ্রী মূর্ত্তি, তেমনি গভীর বুদ্ধিমত্তা! মৃত্যুও শোচনীয় দুর্ঘটনায়! নারায়ণ, জন্ম-জন্মান্তরের কোন্ মহাপাপে খন্তর তাহাকে হারাইল!

শোকার্ত্ত পিতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল! অধীর ভাবে খন্তর বাহিরে আসিল। মাঠে কতকগুলা পল্লীশিশু খেলা করিতেছিল।

তাহাদের কাছে গিয়া বসিল। ছেলেদের লইয়া আদর করিতে লাগিল, খেলা করিতে লাগিল।

শোকের তীব্রতা সে এমনি ভাবে সামলাইত। বেশ জানে, নিজে নিজেকে শান্ত না করিলে উপায় নাই।

দোল পূর্ণিমা ঘনাইয়া আসিয়াছে। ফাগুয়া উৎসবে পল্লীর নর-নারী মাতিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে নাচ গান বাজনার প্রবল ধূম।

খন্তর এ সব হৈ চৈ পছন্দ করিত না, সাধ্য পক্ষে ওগুলা এড়াইয়া চলিত। নিজের কার্য্যব্যস্ততাও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন নিষ্কর্ম্মা। খোঁড়া পা ভাল আছে,—যেহেতু তাহাকে আজ ডাক্তারখানা যাইতে লোকে দেখিয়াছে। হউক লাঠিতে ভর দিয়া চলা, তবু চলা ত?

বৈকালের দিকে পল্লীর যুবকদল আসিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িল।—আজ খন্তরকে তাহারা ছাড়িবে না। গান গাহিবার জন্যে আড্ডায় যাইতে হইবে।

খন্তর অনেক ওজর আপত্তি করিল। কিন্তু নাছোড়বান্দা বন্ধুরা ছাড়িল না। কয়দিন ক্রমাগত চীৎকার করিয়া তাহাদের গলা ভাঙিয়া গিয়াছে, আজ খন্তরকে তাহাদের মুখ রক্ষা করিতে হইবে। খন্তর খোঁড়া পায়ের দুর্দ্দশার কথা তুলিতে একজন বলিষ্ঠ যুবক তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া চলিল।

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রমোদমত্ত বন্ধুদলের সহিত গানের আসরে হৈ চৈ করিয়া, সে যখন নিজের নির্জ্জন কুটীরে ফিরিল, তখন সবিস্ময়ে অনুভব করিল তাহার চিত্তের অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটিয়াছে। সেই গভীর নির্জ্জনতার মাঝে, নিজের অনাবৃত মনের দিকে চাহিয়া খন্তর নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিল। কোন রকমে খাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি ঘুমাইতে গেল, কিন্তু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম হইল না।

ভোরে উঠিয়া সে প্রাত্যহিক নিয়মমত নিজের নির্জ্জন কুটীরে পূজা-পাঠ করিল।

বস্তির প্রান্তে এক বহুকালের জীর্ণ শিব মন্দির ছিল। কোন প্রাচীন কালে, কোন এক অর্থবান ভক্ত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, সে কথা আজ সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। নিকটস্থ পল্লীর এক ব্রাহ্মণ-বংশ মন্দিরের ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগ করিতেন এবং তাঁহাদেরই কেহ না কেহ দিনের মধ্যে যখন হউক আসিয়া শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালিয়া, দুইটা ফুল বেলপাতা চাপাইয়া দিয়া যাইতেন। মন্দিরে সর্ব্ব সাধারণের প্রবেশ ও পূজার অধিকার ছিল। খন্তরদের বস্তির অনেকেই স্নানান্তে এখানে আসিয়া শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালিত, পূজা করিত, ভোগ-নৈবেদ্য নিবেদন করিত।

সুস্থ অবস্থায় খন্তর প্রায় প্রত্যহ স্নানান্তে এখানে আসিয়া শিবলিঙ্গের মাথায় জল দিয়া স্তব স্তোত্র পাঠ করিয়া যাইত। পা খোঁড়া হওয়ায় কয়দিন মন্দিরে যাইতে পারে নাই। আজ স্নানান্তে জলের ঘটি লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মন্দিরে গেল।

মন্দির দুয়ারের শিকল খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল। যথারীতি পূজা করিয়া অভ্যস্ত ভাষায় স্তব স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল। অশান্তির সহিত অনুভব করিতে লাগিল—মন আজ বড় অস্থির! কেবল অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে উধাও হইয়া ঘুরিতেছে!

কিন্তু খন্তর ধৈর্য্যশীল। মানসিক চাঞ্চল্যে ভ্রূক্ষেপ করিতে চাহিল না। অভ্যস্ত সংস্কার বশে যথাসাধ্য সাবধানতার সহিত পূজা অর্চ্চনা করিতে লাগিল।

চারিদিক নির্জ্জন। কোথাও কিছুমাত্র সাড়াশব্দ নাই। এত সকালে এ-মন্দিরে কেহ আসে না। তবু কেন বলা শক্ত, কিছুক্ষণ পরে,

ঠিক যেন কোন অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া—নিজের অজ্ঞাতে ঘাড় ফিরাইয়া বাঁ দিকে মুক্ত দ্বার পথে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। মুহূর্ত্তে সে ভয়ানক চম্‌কাইয়া উঠিল !

দেখিল—প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে সামনে পথের ধারে গাছতলায় দাঁড়াইয়া, কে-একজন নারী মুগ্ধ-বিহ্বল দৃষ্টিতে, একাগ্র মনোযোগে, তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে !

অতটা দূর হইতে খন্তরের নিম্নস্বরের স্তব পাঠ শোনা যায় না। অতএব পাঠ শুনিবার জন্য সে নিশ্চয় ওখানে অপেক্ষা করিতেছে না। সে শুধু খন্তরের অবয়বটা লক্ষ্য করিতেছে। খন্তর বিস্মিত হইয়া দেখিল, সে দৃষ্টিতে এক দুর্জ্জেয় ব্যগ্র-ব্যাকুলতা ঝলসিয়া উঠিতেছে !—ক্ষণ মধ্যে চিনিল, সে নারী···সেই !·· শনিচরের স্ত্রীর ভগিনী !

চকিতে খন্তর দৃষ্টি ফিরাইল। কিন্তু মূঢ় চিত্ত অকস্মাৎ অভাবনীয় ভাবে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল !

পথে ঘাটে এমন কত অপরিচিতের বা স্বল্প পরিচিতের—অকারণ কৌতূহলী-দৃষ্টি ত কত দেখিয়াছে. সর্ব্বদাই সেগুলা অবহেলা ভরে উপেক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আজ হঠাৎ এ কি হইল ? ওই নারীর দৃষ্টির প্রতি, পলকের জন্য দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া অকস্মাৎ এ কি তীব্র মাদকের নেশায় তাহার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় উত্তেজনা-বিহ্বল হইয়া পড়িল ! এ কি ভয়াবহ মূঢ়তা ! তাহার সর্ব্বাঙ্গের শিরায় শিরায় আচম্বিতে এক অভুতপূর্ব্ব তরল অগ্নি-স্রোত হুহুঙ্কারে গর্জ্জন করিয়া উঠিল !

খন্তর আত্মসম্বরণের জন্য যেমনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, নিজের মূঢ় ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তেমনি ভীত ও বিস্মিত হইল ! বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ড দ্রুত তালে স্পন্দিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, জিভ জড়াইয়া আসিতে লাগিল !—তবু প্রবল চেষ্টায় অতি কষ্টে কোন রকমে

আত্ম-নিবেদনের শেষ শব্দ কয়টা জড়িত স্বরে উচ্চারণ করিয়া দেবোদ্দেশে মাথা নোয়াইয়া উঠিয়া পড়িল। শূন্য ঘটিটা লইয়া, মন্দিরের বাহিরে আসিল। দুয়ারে শিকল লাগাইয়া দিল। তার পর কোন দিকে না চাহিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে নিজের কুটীরে আসিল। নারী রহিল কি গেল,—ফিরিয়া চাহিল না।

নিজের উপর রাগ ত হইলই, দেবতার উপরও বড় কম অভিমান হইল না।

কিছুক্ষণ পরে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং স্বাভাবিক বিচারশক্তি বলে যখন নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল, তখন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার অন্তরের মধ্যে এ রাক্ষসী বুভুক্ষা আবির্ভূত হইল কোথা হইতে? সে শপথ করিয়া বলিতে পারে,—ঐ স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে কোন আকর্ষণ চিত্তে স্থান দেয় নাই। বরঞ্চ প্রথম দিনের পরিচয় মুহূর্ত্তে তাহার মূঢ়-কৌতূহল-ব্যগ্র, বুভুক্ষিত দৃষ্টি খন্তরের মনে অপ্রসন্ন বিরাগ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। আর বিবাহ প্রসঙ্গে ত রীতিমত রাগই হইয়াছিল! তথাপি এ কি বিভ্রাট!

অকস্মাৎ চিন্তাগতি স্তব্ধ হইল। মনের ভিতর জাগিয়া উঠিল—প্রথম দিনের প্রথম পরিচয়ের সেই স্মৃতি! খন্তর স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ সেই অদ্ভুত দৃষ্টির কথা ভাবিল। শেষে সংশয়ান্বিত চিত্তে ভাবিল,· · তাই কি? একজন নির্ব্বোধ, অসতর্ক নারীর চিত্তের মোহ-মুগ্ধতা আর একজনের অসতর্ক চিত্তে এত বড় প্রচণ্ড মূঢ়তা জাগাইয়া তুলিতে পারে?··· জীবনে এ অভিশপ্ত-অভিজ্ঞতা এই প্রথম!

আবার ভাবিল, হয় ত সেই নিরপরাধ ভগবানের জীব বেচারীর কোন অপরাধ নাই। খন্তরও ইচ্ছাকৃত অপরাধী নয়। ইহা মনুষ্য-প্রকৃতিগত সাধারণ ভ্রান্তি-দৌর্ব্বল্য মাত্র!

অন্তরে বিবেকবুদ্ধি গর্জ্জন করিয়া বলিল 'তবু ইহা জড়ত্ব পাপ! এই কুৎসিত বাসনা-বিকারের তৃষ্ণা আকর্ষণেই মানুষ নিম্নস্তরের পথে ধাবিত হয়। যদি সে জ্ঞান-বলে এই ঘৃণিত তৃষ্ণা দমন করিতে পারে—তবে অনন্ত কল্যাণ সম্ভাবনা। নচেৎ, মানুষের পশুত্ব লাভ অনিবার্য্য! সে পশুত্বের দণ্ডও অতিশয় ভয়ানক!'

খন্তর সত্রাসে ডাকিল "রক্ষা কর নারায়ণ! এই মূঢ় কামনার করাল গ্রাস হইতে তাহাকে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি দাও!"

হাঁ, কিন্তু ··শক্তিলাভের জন্য সাধনা চাই। অলসের জন্য, অশক্তের জন্য, আত্মজয়ের ব্রতে সাহায্য করিতে কোন ভগবান নাই!

মনে পড়িল, খোঁড়া পায়ের জন্য কয়দিন অলস-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে, দেহ মনে সেজন্য অশান্তিকর অবসাদ জমিয়াছে। মনে পড়িল, নানা চরিত্রের লোক সঙ্গ তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে!—হাঁ, ইহাই তাহার চিত্ত-বিকৃতির অন্যতম হেতু! ··সংসারাসক্ত মানুষগুলার সঙ্গ,—চাপল্য-প্রিয় অসংযমী বন্ধুদের সঙ্গ,—ইহাদের সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করিয়া এই মুহূর্ত্তে প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে যাওয়া উচিত।

খন্তর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। দেহ মন যতই অসুস্থ, যত অশান্তি-পীড়িত হউক,—মনের অন্যায় আদর আব্দারে সে দৃক্‌পাত করিবে না। মানসিক অধঃপতন, মনের জোরে সংশোধন করিবে-ই।

কঠোর পরিশ্রমে সে দৈনন্দিন কার্য্য সাধনে লাগিল।

খাওয়া দাওয়ার পর শ্রান্তভাবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, উঠিল। পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিল। বাক্স খুলিয়া ফর্শা পোষাক পরিচ্ছদ বাহির করিল। জামা জুতা পরিয়া, পাগড়ি বাঁধিয়া, লাঠি লইল। ঘরে চাবি দিয়া বাহির হইল।

শনিচরের বাড়ীর দুয়ারে গিয়া ডাক দিল। সে বাহিরে আসিল। বিস্মিত হইয়া বলিল, "এত রোদে কোথা যাচ্ছিস ?"

খন্তর বহিঃপ্রকৃতির পানে চাহিল,—তাই ত আজ দুপুরের রোদ ত ভয়ানক চড়া।…কিন্তু ছোট সুখ সুবিধার কাঙাল সে নয়। কঠিনতর জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়াই যে তাহার লক্ষ্য! উপেক্ষাভরে বলিল, "হোক গে! জরুরী দরকার, সাহেবের কাছে যাচ্ছি। রান্না ঘরের চাবিটা ভৌজিকে দে। বিশুয়ার মা কায করতে এলে দেবে।"

চাবি দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল।

বৈকালে ফিরিয়া চাবি লইতে গেল। শনিচর তখন বাড়ীতে ছিল না। তাহার স্ত্রী বড় ছেলেকে সঙ্গে লইয়া চাবি দিতে আসিল। উপযুক্ত দেবর বলিয়া খন্তরকে সমীহও করিত, ঘোমটার আড়াল হইতে রসিকতাও করিত।

চাবি দিয়া, খন্তরকে শুনাইয়া শুনাইয়া শনিচরের স্ত্রী, ছেলেকে বলিল, "তোর চাচাকে জিজ্ঞাসা কর,—সাগা করবে বৌ আনতে চায় না, কিন্তু বরের মত সেজে গিয়েছিল কোথা ?"

পরিহাস বুঝিবার বয়স ছেলেটির হইয়াছিল। সলজ্জ হাস্যে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাচার মুখপানে চাহিল। কিছু বলিল না।

"অন্ন চেষ্টায়। সাহেবের কাছে।"—বক্র কটাক্ষে ভাইপোর দিকে চাহিয়া খন্তর অনুযোগের স্বরে ভ্রাতৃজায়ার উদ্দেশে বলিল, "তোমাদের বিচারে এটা বরের সাজ,—আমার বিচারে মনিবের মান বাঁচানো। ছেলেরা এখন বড় হয়েছে, এদের সামনে কি যে ছাই পাঁশ কথা কও,—শুনলে হাড় জ্বলে যায়। সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এলুম।.. চল্লুম, জামালপুর কারখানায়। তোমাদের কব্জি থেকে খসলুম। এবার নিশ্চিন্ত হও।"

জামালপুরের বিখ্যাত কারখানা স্থানীয় শ্রমজীবী পল্লীতে কাহারও অজানা নয়। কিন্তু এখানকার পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া, উচ্চ বেতনের চাকরি ছাড়িয়া খন্তর হঠাৎ সেখানে যাইবে—বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। বধূ বিদ্রূপ করিয়া পুত্রের উদ্দেশে বলিল, "তোর চাচাকে বল্, অত রাগ জানাতে হবে না। যাতে জল্দি বহু ঘরে আসে, তার ব্যবস্থা কর্ছি।"

"আমিও শুভক্ষণে পাহাড় টপ্‌কে ওপারে! ভেইয়া এলেই আমার কাছে পাঠিও, জরুরী কথা আছে। আসি তাহলে। আবার কতদিনে ফিরব, মর্‌ব কি বাঁচ্‌ব ঠিক নেই। চাচিকে প্রণাম জানাচ্ছি বোলো।"

বলিয়া খন্তর প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফিরিল। হঠাৎ চোখ পড়িল—সামনে! এ কি! ভৌজির বহিন্!

পথের পাশে সে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পরণে সেই বাসন্তী রঙের শাড়ী, মাথায় একটু ঘোমটা। কোলে খোকাবাবু। বৈকালিক ভ্রমণের জন্য বোধ হয় ভগিনীর বাড়ীতে আসিতেছিল। খন্তরকে দুয়ারের কাছে দেখিয়া, সসঙ্কোচে অদূরে অপেক্ষা করিতেছে।

খন্তর সন্ত্রস্ত হইল। থমকিয়া দাঁড়াইল। মাথার ভিতর কেমন গোলমাল বাধিল।

পিছন হইতে ভ্রাতৃজায়ার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের বিদ্রূপ শোনা গেল,—"যাওয়ার পথে বাধা পড়্‌ল, নয়?"

মনের অবস্থা কাহিল, তবু রোখ চড়িল। মনে মনে সদর্পে বলিল, "আটকায় কার সাধ্য?"

প্রকাশ্যে কিছু বলিল না। কিন্তু অত্যন্ত বিচলিত চিত্তে উপলব্ধি করিল সামনের পথটা খুব সঙ্কীর্ণ। সেখান দিয়া একজন স্ত্রীলোকের পাশ কাটাইয়া যাওয়া শোভনও নয়—ভদ্রতাসঙ্গতও নয়। অতএব—?

খোঁড়া পায়ের ব্যথা মনে রহিল না। সহসা এক লাফ দিয়া পাশের উঁচু দাওয়ায় উঠিল। পায়ে তীব্র যন্ত্রণা জাগিল, গ্রাহ্য করিল না। স্ত্রীলোকটিকে অতিক্রম করিয়া নিঃশব্দে দাওয়ার অন্য পাশে নামিল।

ভ্রাতৃজায়া আর এক প্রস্থ পরিহাসবাণী বর্ষণ করিলেন, "খোঁড়া পায়ে অত জোর লাফ্! পড়্লে যে ঘাড়্মুড়্ ভেঙে যেত!"

"যাক্। তবু চেষ্টায় কসুর থাক্‌বে না।"—চলিতে চলিতে খন্তর ফিরিয়া চাহিল। হয় ত বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে—হয় ত বা অজ্ঞাত কৌতূহলবশে স্ত্রীলোকটির দিকে চোখ পড়িল।—দেখিল তাহার দুই চোখে অজ্ঞাত উদ্বেগভরা গভীর বিষাদ ব্যাকুলতা ঘনাইয়া উঠিয়াছে! মুখে তীব্র বেদনার চিহ্ন! সে যেন এইমাত্র দারুণ আঘাত পাইয়াছে!

চকিতে দৃষ্টি ফিরাইল। নিজের পথে দ্রুত চলিল। নাঃ, কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা গ্রহণ করিয়াছে,—পুরুষোচিত প্রবল উদ্যমে একান্ত নিষ্ঠায় তাহা পালন করিবে। কাহারও ম্লানমুখ দেখিয়া যদি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, তবে তাহার পুরুষত্বে ধিক! মনুষ্যত্বে ধিক!

৮

সন্ধ্যার পর শনিচর তাহার ছোট ছেলেকে কোলে লইয়া যখন খন্তরের গৃহে দেখা করিতে গেল, তখন সেখানে হুলস্থুল চলিতেছে। খন্তর ষ্টেশন হইতে কুলি আনিয়া, নিজের বিছানা-পত্র বাঁধিয়া, অস্ত্রের বাক্স, জামা কাপড়ের বাক্স, তাহাদের মাথায় তুলিয়া ষ্টেশনে পাঠাইতেছে। রোদন-পরায়ণা বিশুয়ার মাকে প্রাপ্য বেতন মিটাইয়া দিতেছে। ক্ষুদিরামকে গরুর খড় খইলের দাম বুঝাইয়া দিতেছে। সে মহা ব্যস্ত।

ঝমরু ও কয়েকজন যুবক আঙিনায় বসিয়া, হতবুদ্ধির মত তাহার কাণ্ড

দেখিতেছিল। শনিচরকে দেখিয়া তাহারা উত্তেজিত অভিযোগের সুরে বলিল, "খন্তরার মাথায় হঠাৎ কি ভূত চাপ্‌ল? কাউকে বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ দেশ-ভূঁই ছেড়ে জামালপুরে পালাচ্ছে কেন? আমরা কাওয়া গাইবার জন্যে ওকে নিতে এসে, কাণ্ড দেখে অবাক্ হয়েছি! ওর হোস কি?"

শনিচর ডাকিল—"খন্তরা"—

খন্তর নিকটে আসিয়া তাহার কোল হইতে শিশুটিকে লইয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল। সেই কৃষ্ণকান্তি শিশুর স্নিগ্ধ-কোমল মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।—মনে পড়িল নিজের প্রিয় পুত্রের কথা। হায়, আজ যদি সে বাঁচিয়া থাকিত, তবে তাহার মুখ চাহিয়া—হাঁ, সে সুকুমার শিশুর পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়া, খন্তর এ পৃথিবীর সব প্রলোভনের আকর্ষণ অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত! নিজেকে ভুলিবার জন্য, ভুলাইবার জন্য,—আজ আজন্মের পরিচিত, প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া কোথাও পলাইতে বাধ্য হইত না!

কিন্তু পরক্ষণে মনে হইল—এ অনুযোগ বৃথা! মানুষ নিজের দুর্ব্বলতা ত্রুটি ঢাকিবার জন্য মনকে চোখ ঠারিয়া এমন অন্যায় অসঙ্গত বাহানা অনেক কিছু করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ওগুলার মূল্য বিশেষ কিছু নাই। ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তায়, যত্ন-শীল মানুষ নিজের পুরুষকার-বলে এ জগতে কত অসাধ্য সাধন করিতেছে। সে একটা তুচ্ছ ভ্রান্তি চাঞ্চল্য দমন করিতে পারিত না?

শনিচর বলিল, "হ্যাঁরে তুই সত্যি জামালপুর চল্‌লি? এ কুবুদ্ধি কেন?"

খন্তর শিশুকে তাহার কোলে ফিরাইয়া দিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "আরে ভাই, পা ভেঙে সাহেবকে ভয়ানক খুশী করেছি। আজ

দেখা করতে গিয়েছিলাম। বললেন, "মিস্ত্রি, জামালপুর ওয়ার্কশপে মাস ছয়েক থেকে কতকগুলো কায শিখে আসতে পার? স্ত্রী পুত্রের ওজর তোমার নাই, প্রাণের ভয়ও তুমি রাখ না। তোমার মত সাহসী, বিশ্বাসী লোকের দায়িত্ব আমি নিতে পারি। যদি রাজী থাক, বল। কোম্পানীর খরচায় তোমার শেখার ব্যবস্থা করে দিই। ফিরে এলেই মাইনে বাড়বে।" জবাব দিলাম "হুজুর, আজই যেতে রাজী।" ব্যস্, তখনি চিঠিপত্র লিখে সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দিলেন।"

শনিচর ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "তোর ভাই,—জয়পালকে একবার জানালি না?"

মাথা নাড়িয়া খন্তর বলিল, "না। জানলে সে বাধা দিত। সেখানে গিয়ে একেবারে চিঠি লিখব। গরুটার ভার তোকে দিয়ে যাব মনে করেছিলাম, সেই জন্যে ডেকেছিলাম। তা সুমার ওটার ভার নিয়েছে। ঘর-দোর রইল, দেখিস্। কে কেমন রইলি মাঝে মাঝে খবর দিস্।"

সুমার বলিল, "কিন্তু ছ' মাস পরে তোর এখানে আসা চাই খন্তরা। আস্‌বি ত?"

খন্তর কয়েক মুহূর্ত্ত গুম্ হইয়া রহিল। নিরতিশয় অন্যমনস্কতার সহিত শুষ্ক স্বরে উত্তর দিল, "বল্‌তে পারি না। যদি বেঁচে থাকি, মনের অবস্থা ভাল থাকে,—হয় ত ফিরব। নইলে, কোথায় যাব, কি করব, কিচ্ছু ঠিক নেই। যদি একান্ত না ফিরি, গরুটা গুজস্তিতে পাঠিয়ে দিস্।"

বিদায় লইয়া খন্তর ষ্টেশনে চলিল। যুবকেরাও সঙ্গে চলিল। বেচারাদের নৃত্য গীত বাদ্যোৎসব সেদিন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

যখন ট্রেণ ছাড়িল, তখন বন্ধুদের অশ্রু-সজল দৃষ্টির দিকে চাহিয়া খন্তরের চোখ ঝাপ্সা হইয়া আসিল।

কর্ম্মক্ষেত্রে পৌঁছিয়া, প্রবল উদ্যমে কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার জীবনে অতীত বলিতে যাহা কিছু ছিল তার স্মৃতি সমূলে মুছিয়া ফেলিবার জন্য, দেহ মন প্রাণের সমস্ত শক্তি বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য-সাধনে নিযুক্ত করিল। একাগ্র অধ্যবসায় কখনও নিষ্ফল হয় না। শীঘ্র খন্তর অতীতকে ভুলিল। বর্ত্তমানও তাহার কৃতিত্বের পুরস্কার ঘোষণা করিল। তাহার বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতায় উপরওলাদের সন্তোষ, ও সহকর্ম্মীদের বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিল। কয়েকজন হিংস্র-স্বভাব সহকর্ম্মী, খন্তরকে অপদস্থ করিয়া কারখানা হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য, কিছু কৌশল-জাল বিস্তার করিতেও ত্রুটি করিল না। কিন্তু দৈবক্রমে ঘটনাটা একজন ফিরিঙ্গী মেকানিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষানবিশ যুবকের চোখে ধরা পড়িল। যুবক ব্যাপারটা উপরওলাদের কর্ণগোচর করিল। গুণগ্রাহী ন্যায়পরায়ণ কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারী ব্যাপারটার যথারীতি তদন্ত করিয়া,—চক্রান্তকারীদের দণ্ডিত করিয়া, অন্যত্র সরাইয়া দিলেন।

ব্যাপারটা লইয়া কারখানায় বেশ একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইল। খন্তরের উপর অনেকের সুদৃষ্টি ও কুদৃষ্টি পতিত হইল।

এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ফলে খন্তরের মন অশান্তি পীড়িত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল—তাহার জীবনে এত হাঙ্গামার প্রয়োজন কি? দণ্ডিত মানুষগুলা নিজেদের দুর্ব্বুদ্ধির উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে সত্য, কিন্তু খন্তর কেন নিমিত্তের ভাগী হয়? সংসারে তাহার প্রয়োজন মাত্র দিনান্তে দুইখানা রুটির! তার জন্য যদি এতগুলা মানুষের মনঃপীড়া সৃষ্টি করিতে হয়, তবে কর্ম্মজীবনে তাহার সাফল্য লাভের চেষ্টা করিয়া কায নাই! কায নাই! ইহার অপেক্ষা,—লোকালয়ের সব ঈর্ষা বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব কোলাহলের বাহিরে পাহাড় জঙ্গলে গিয়া বনের ফল নদীর জল খাইয়া

নিরুপদ্রব জীবন যাপন করা ভাল! তাহাতে আর কিছু না হউক, পর-পীড়নের পাপ ত নাই!

খন্তরের উৎসাহ নিস্তেজ হইল।

কোনরূপে শেষ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, খন্তর যখন শুনিল তাহাকে উচ্চ-বেতনে ইঞ্জিনের মিস্ত্রী পদ দিয়া পাটনায় বদলি করা হইয়াছে, তখন তাহার নিরুদ্যম-ক্লান্ত চিত্ত, সে প্রস্তাবে আদৌ সন্তুষ্ট হইল না। আবার নূতন স্থানে গিয়া, নূতন আবেষ্টনের মধ্যে নূতন জীবন যাপন করিতে হইবে? যদি ভাগ্য-বলে সেখানেও কৃতিত্বের জন্য খ্যাতি লাভ করে, তবে আবার সেখানে ঈর্ষা বিদ্বেষের কোলাহল জাগিবে, আবার শত্রু জুটিবে? না, তার চেয়ে পরিচিত মিত্রগণের ভিতর ফিরিয়া যাওয়া ভাল। সেখানে খন্তরের মাথা উঁচু হইলে, তাহারা লাঠির আঘাতে উচ্চতা হ্রাস করিতে চাহিবে না। খন্তরকে তাহারা তাহাদের প্রিয় 'খন্তরা' হিসাবেই গ্রহণ করিবে, এ ভরসা আছে।

খন্তর গয়ায় বদলি হইবার জন্য আবেদন করিল। কর্তৃপক্ষ উত্তর দিলেন এখন সেখানে পাঠাইলে চলিবে না। পাটনায় এখন লোকের আবশ্যক। অন্ততঃ ছয় মাস সেখানে থাকিয়া তার পর গয়ায় বদলি হইতে পারে।

অগত্যা পাটনায় চলিল।

কিছুদিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল। কিন্তু কুর্মি-সমাজে জন্মিয়া যে লোক মাসে চল্লিশ চুয়াল্লিশ টাকা কামায়, অথচ না থাকে স্ত্রী-পুত্র, না থাকে নেশার উপদ্রব, তাহাকে লইয়া লোকসমাজ সহজেই উৎকণ্ঠিত হয়। সন্ধান পাইয়া স্বজাতীয়গণ বিবাহ প্রস্তাব আনিল। অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল।

খন্তর দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল—"এখন সময় নাই। নূতন চাকরি, অনেক খাটুনি।"

জয়পাল আসিল। তর্ক উপদেশ অনুরোধ উপরোধ চলিল। শেষে বেচারা অশ্রুবর্ষণ পর্য্যন্ত করিল। খন্তর দমিল। বলিল, "আচ্ছা যাক কিছুদিন, পয়সা জমাই। তার পর—"

জয়পাল বলিল, "বুড়ো বয়সে বিয়ে করার চেয়ে না করাই ভাল। অসময়ে ছেলেপিলে হলে মানুষ কর্‌বি কখন ?"

খন্তর ম্লান মুখে চুপ করিয়া রহিল। বলিতে ইচ্ছা হইল সন্তান তাহার অল্প বয়সে হইয়াছিল। মানুষ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছিল কি ?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল তাহার বড় ছেলেকে জয়পাল অত্যন্ত ভালবাসিত। বলিত "পিতা ফিরিয়া আসিয়াছেন।" ছেলেটার মৃত্যুশোকে সে বড় কষ্ট পাইয়াছিল।

সুতরাং সে কথা তুলিলে ভাইয়ের প্রাণে ব্যথা দেওয়া হইবে, তাহা মনে মনে বুঝিল। নীরবে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

জয়পাল অনুমানে তাহার মনোভাব কতকটা বুঝিল। ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সময়ের ছেলেরা যদি বেঁচে থাকত, তা হলে আজ আমাদের ভাবনা কি ? নিজেদের বরাত মন্দ, তাই তাদের হারিয়েছি।"

শ্রান্তভাবে খন্তর বলিল, "বরাতে না থাকে ত অসময়ের ছেলেরাও বাঁচবে না। তখন ?···কেন তোমরা হাঙ্গামা করছ, বুঝতে পার্‌ছি না। মনে হচ্ছে, ফের সংসারে জড়িয়ে পড়লে, আমার অনিষ্ট হবে।"

ভ্রাতা বিষণ্ণ হইয়া পূর্ব্বকথা পুনরাবৃত্তি সুরু করিল। খন্তর বিরক্ত বিব্রত হইয়া বলিল, "ভাল, তোমাদের কথাই রাখ্‌ব। 'দশ-নারায়ণের' পরামর্শ শুন্‌লেই ভাল হয় ত, হোক। যেখানে তোমাদের পছন্দ হয়, পাত্রী ঠিক কর।"

জয়পাল হৃষ্টচিত্তে ভাই-বেরাদারগণকে সংবাদ দিয়া, নানাস্থানে পাত্রী সন্ধান করিতে লাগিল। ভ্রাতার বৈরাগ্য-প্রবণ চিত্ত, সংসার ধর্ম্মে আকৃষ্ট

করিবার জন্য বয়স্থা-সুন্দরী পাত্রী আবশ্যক, মনে করিল। অনেক খুঁজিয়া বাছিয়া দানাপুরে এক পাত্রী মিলিল। অবস্থাপন্ন পিতার কন্যা, বয়স বছর চৌদ্দ। তবে কুর্ম্মির ঘরে যাহাকে বলে পরমাসুন্দরী, মেয়েটি তাই। জয়পাল সেইখানেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিল।

বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ সুরু হইল। বিবাহের পনের দিন মাত্র বাকী,—এমন সময় সহসা সংবাদ আসিল পাত্রী প্লেগ হইয়া মারা গিয়াছে।

খন্তর তখন একটা ইঞ্জিনের কলকব্জা আঁটিতেছিল। সংবাদ শুনিয়া প্যাঁচ-কস্ হাতে, মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ রহিল। তার পর শান্ত কঠিন মুখে পুনরায় নিজের কায করিতে করিতে সহকর্ম্মীর উদ্দেশে বলিল, "হুঁসিয়ার ভাই।"—ফোরম্যানকে বলিল, "দেখে নিন সাহেব, ঠিক হয়েছে ত?"

একান্ত নির্ব্বিকার চিত্তে সে নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিল।

কিন্তু এই দুর্ঘটনায় জয়পালের মন খারাপ হইয়া গেল। কিছুকাল নীরব থাকিয়া, সে পুনরায় পাত্রী নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইল। এমন সময় সংবাদ আসিল খন্তর গয়ায় বদলি হইয়াছে।

ফাল্গুনের এক কুয়াশাচ্ছন্ন প্রত্যূষে খন্তর কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া গয়ায় পৌঁছিল। জিনিসপত্র লইয়া বাড়ী ঢুকিল। দেখিল আঙিনায় জঙ্গল গজাইয়াছে। ঘরের দুয়ার জানালায় উই ধরিয়াছে। আঙিনার প্রাচীর স্থানে স্থানে ধ্বসিয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে।

পরিত্যক্ত কুটীরের শ্রীহীন মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া—বহুকালের পর আজ অতীত স্মৃতি বুকের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিল। এতদিন প্রবাসে অপরিচিতদের মধ্যে প্রবাস জীবন যাপন করিতেছিল, পারিবারিক জীবনের স্মৃতি সে ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ গৃহে ফিরিয়া দীর্ঘকাল পরে —সেই প্রিয় পরিজনবর্গের অভাবের ব্যথা তীব্রভাবে অন্তরে বাজিল। মনে পড়িল,—এই আঙিনায় তাহার শিশু-পুত্র খেলা করিত, এইখানে

তাহার প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মী হাসিমুখে গৃহস্থালীর কায করিত। ওইখানে বসিয়া স্নেহময়ী মাতা তাহাকে খাওয়াইতেন। আর ওই তাহার প্রথম যৌবনের···শত দিনের, শত অসহ্য-স্মৃতিভরা—ভীষণ শূন্য শয়নকক্ষ। আজ ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত, প্রবাস-প্রত্যাগত, একান্ত শ্রান্ত খন্তরকে অভ্যর্থনা করিতে গৃহে কেহ নাই !···কিছু নাই !

মনে হইল, উঃ ! বাঁচিয়া থাকা কি অসহ্য যন্ত্রণা !

অবসাদ-ক্লান্ত-ভাবে খন্তর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাওয়ায় বসিয়া রহিল।

খন্তরের আগমন সংবাদ পাইয়া প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধুরা ছুটিয়া আসিল। সকলে উল্লসিতভাবে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। খন্তর মনের বিষাদ দমন করিয়া প্রসন্ন হাস্যে সবিনয়ে সকলকে প্রত্যভিবাদন করিল। তার পর অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি মজুর আনাইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করা, ঘর দুয়ার পরিষ্কার করা ইত্যাদি নানা কায আরম্ভ করিল। বন্ধুরাও সাহায্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সব আবর্জ্জনা দূর হইল। খন্তর সঙ্গের জিনিসপত্র যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিল।

সুমারের পিতা তাহাকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ জানাইয়া গেলেন।

খন্তর স্নান করিয়া আসিল। যথারীতি পূজা পাঠ করিল। বহু কালের পর, আজ আবার সেই—জীর্ণ শিবালয়ে শিবের মাথায় জল ঢালিতে চলিল।

অজ্ঞাতে—মনের মধ্যে এক জ্বালাময় স্মৃতি, দীর্ঘকালের বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মত জাগিল। কথাটা মনে পড়িলে, আজও দারুণ সংশয়ের সহিত তীব্র বিস্ময় বোধ হয়! এক বছর পূর্ব্বের সেই এক অশুভ মুহূর্ত্ত !··· সেই আকস্মিক চিত্তবিক্ষেপ ! নারায়ণ, নারায়ণ ! ভ্রমেও যাহাকে কখনও কামনার দৃষ্টিতে দেখে নাই, যে তাহার কাছে একান্ত নিঃসম্পর্কীয়া

পরস্ত্রী মাত্র,—সন্তান-শোকার্ত্ত এক অভাগিনী জ্ঞানে সাধারণ সহানুভূতির পাত্রী মাত্র, সে নারীর সম্বন্ধে, কেন অতর্কিতে—?

দূর হউক ছাই। হেতু খোঁজার দুঃসাহসে কায নাই। আঁধার-রহস্য অন্ধকারেই থাক। নিজের অসতর্কতা ত্রুটি স্বীকার করাই ভাল। অপরের ত্রুটি ····

থাক। পরস্ত্রীর চিন্তা চিত্ত হইতে বিসর্জ্জন দেওয়াই উচিত। উহা শুধু নিজের নয়, তাহার পক্ষেও অনিষ্টকর।···অনিচ্ছাকৃত অপরাধের উপর হাত নাই। কিন্তু অবৈধ চিন্তায়···ইচ্ছাকৃত বর্ব্বরতা?···না, তাহার রুচি এত কদর্য্য নয়।

মনে অসতর্ক-মুহূর্ত্তে একদা কলুষিত ভাব উদয় হইয়াছিল, সেজন্য নিজের কাছে লজ্জিত, ঘৃণ্য হইয়াছে। অনুতপ্তের অপরাধ-মূঢ়তা ক্ষমা কর, ক্ষমা কর দেবতা।

পূজা-পাঠ শেষ করিয়া কুটীরে ফিরিল।—সুন্দার আসিয়া বলিল, "খাবি চল।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন? হোক একটু।"

"সারারাত জেগে এসেছিস। সকাল সকাল খেয়ে ঘুমো এখন। মনে থাকে যেন, রাতে ফাগুয়া গাইতে যেতে হবে। গেল বছর বড় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলি, এবার শোধ নেব।"

খস্তর অন্যমনস্ক ভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তাই ত, আবার ফাগুয়া মাথায় করে এখানে এসে পড়েছি! কথাটা মনে ছিল না। কিন্তু না, টানাটানি করিস্ না। ও সব হল্লা ভাল লাগে না। বস, বস্তির লোকজনদের খবর বল।"

রৌদ্রে বসিয়া তামাক সাজিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে উভয়ে পল্লী-বাসীদের সংবাদ আলোচনা করিতে লাগিল। পল্লীর কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল

যুবকের নৈতিক বুদ্ধিহীনতার নিন্দা করিয়া সুমার বলিল, "শনিচরের বহুর বহিন্‌টাকে ওরা উত্ত্যক্ত করে তুলেছিল। যেখানেই তাকে দেখ্‌ত, তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে ওরা নানা রকমে বাঁদ্‌রামি করত। বস্তির ভিতর তার বাস করা অসম্ভব হোল; শেষে কেঁদে কেটে, বেচারা মনিব-বাড়ীর সেই বিধবা মেয়েটির সঙ্গে—তাঁর শ্বশুরবাড়ী গেল।"

খন্তরের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রুদ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তা যাক। কিন্তু তোদের সামনে ছোঁড়াগুলো ঐ সব বাঁদ্‌রামি করে পার পেলে? কেউ শাসন কর্‌লি না?"

সুমার অলস সুরে বলিল, "কে শাসন কর্‌বে? সে মেয়েটা কাউকে সাগা কর্‌তে রাজী হোল না। তার স্বামী, পুত্র, বাপ, ভাই,—কেউ একটা ওয়ারিশ নেই।—কে তার জন্যে লড়তে যাবে?"

রূঢ় স্বরে খন্তর বলিল, "তার মানে? যে স্ত্রীলোকের স্বামী, পুত্র, বাপ, ভাই নাই,—সে, বে-ওয়ারিশ সম্পত্তি? কতকগুলা জানোয়ার তাকে উদ্ব্যস্ত করে মার্‌বে, আর তোরা চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌বি? তোরা এত ইতর, এত নীচ! ঘরে কি তোদের মা বোন নেই রে? তাদের মান ইজ্জতের কথা কি একবার মনে পড়্‌ল না?"

৯

সুমার কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। নির্লিপ্ত ভাবে নির্ব্বিকার মুখে উত্তর দিল—"এ তোর বাড়াবাড়ি খন্তরা। আমার মা বোনের মান ইজ্জত, আমি কব্জির জোরে রাখ্‌ব! কিন্তু সে আমার কে?"

"মায়ের জাত ত বটে! মা বোনেদের একজন ত বটে?"

সুমার নীচের ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁট ঠেলিয়া, গভীর অবজ্ঞার সহিত

বলিল, "হুঃ! শনিচর তার ভগিনীপতি। ও একদিন রাগ করে দু কথা বলেছিল বলে,—গুণ্ডা ছোঁড়াগুলো এমন জবাব দিয়েছিল, যা তোর সামনে বল্‌তে, ভয় করে। আমি ত দূরের কুটুম! আমি ফফর্‌দালালি কর্‌তে গেলে,—লোকে আমায় কি বল্‌ত?··"

"রাম রাম"—বলিয়া খন্তর দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিল। ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া, সনিঃশ্বাসে তীব্র মনোবেদনার সহিত বলিল, "দুনিয়ায় কে সব চেয়ে বেশী ছোটলোক জানিস্? যে যত বেশী স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ,—সে! এই দুই পাপকে যে যতখানি দমন কর্‌তে পেরেছে, সে ততখানি বড়, মানুষ! এই হিসেবের নিরিখে নিজেদের ওজন যাচাই করে দেখ, তোরা কি পদার্থ? কিন্তু মিথ্যে বকে মরছি, তুই হয় ত আমার কথার মানে বুঝ্‌তে পার্‌ছিস না।"

সুমার মাথা চুলকাইয়া বলিল, "পারব না কেন? কিন্তু করব কি বল? যেখানে সবাই অমানুষ, সেখানে একজন মাত্র মানুষ হয়ে, মাথা তুলে দাঁড়ালে তার বিপদের সীমা থাকে না। তোর স্ত্রী পুত্র নাই, মোটা মাইনের চাকরী আছে,—ছাতির জোর দেখানো তোর সাজে। আমরা দু-খানা রুটির কাঙাল,—আমাদের কথা শোনে কে? খাতির করে কে?"

খন্তর মাথা নাড়িয়া বলিল, "কারুর স্ত্রী পুত্র না থাক্‌লে, বা চল্লিশ টাকা মাইনের চাক্‌রী থাক্‌লে তাকে সবাই খাতির করবে,—এ ধারণা তোর ভুল। রুটির কাঙাল এ দুনিয়ায় আমিও! প্রাণপণে খাটি, তাই প্রাণ বাঁচাবার দাম আদায় হয়। ওতে বাহাদুরীর কিছু নাই। নিজের ন্যায়নিষ্ঠাকে খাতির করতে শেখ রে।—নিজেকে নিজে খাতির করবার উপযুক্ত হ'। সবাইকার খাতির পাবি। শোন সুমার, ঐ বদ্‌ ছোঁড়াগুলোকে আমায় চিনিয়ে দিস্ ত।"

শঙ্কিত হইয়া সুমার বলিল, "কেন রে? ওদের প্রহার দিবি না কি?"

হাসিয়া খন্তর বলিল, "না না। প্রহার দিয়ে যদি মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি দূর করা যেত, তাহলে সকলের আগে হাতুড়ি পিটিয়ে নিজের মাথা ছাতু বানাতাম। আমার মগজেও আচম্‌কা অনেক কুবুদ্ধি এসে হাজির হয়। সে-গুলো শোধ্‌রাবার সোজা উপায় অতটা সোজা নয়, তা দেখেছি। আমি ওদের সঙ্গে মিশব, ওদের মতি গতি বদ্‌লে দেবার চেষ্টা করব।"

সুমার সকৌতুকে বলিল, "পারবি?"

"পারাপারি পরের কথা। তবে ভালর জন্যে চেষ্টা করাই ভাল।"

"কিন্তু দেখিস, যেন ওরা শেষ পর্য্যন্ত তোর মতি গতি বদ্‌লে না দেয়।"

খন্তর প্রসন্ন হাস্যে বলিল, "তাই যদি বদ্‌লায়, তাতে ভয় করলে চল্‌বে না। তবু আমি চেষ্টা কর্‌ব। ওরা আজ সে মেয়েটিকে অসহায় পেয়ে উত্ত্যক্ত করেছে, কাল সুবিধা পেলে তোর স্ত্রী কন্যাকে উত্ত্যক্ত কর্‌বে, পর্শু অন্য শিকার খুঁজবে। নাঃ, ওদের কু-অভ্যাস বাড়্‌তে দেওয়া কোন মতে উচিত নয়। সৎপরামর্শে না হয়, কড়া সাজা দিয়ে ওদের শোধ্‌রাতে হবে।"

সুমার ক্ষণকাল খন্তরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর ভয়ে ভয়ে বলিল, "রাগ করিস্‌ নি খন্তরা, কিন্তু এর জন্যে দায়ী তুই। সেই ত বাপু, শেষ পর্য্যন্ত বিয়েতে মত করলি,—বিধির বিপাকে হোল না—দানাপুরের মেয়েটা মারা গেল, তাই। নইলে এতদিন ত নতুন 'বহু' ঘরে আসত। তাকে নিয়ে ঘর সংসার ত কর্‌তে হোত? সেই যদি—আগে শনিচরের বহুর বহিনটাকে সাগা করে ঘরে আনতিস, তাহলে সে বেচারাকে চোখের জল ফেলে দেশত্যাগী হতে হোত না। তোরও এতদিনে সংসার বজায় হোত।"

খন্তর দু'হাতে নিজের মাথার চুল টানিতে টানিতে ম্লান হাস্যে বলিল, "ছ্যাখ সুমার, কথা তুল্‌লি যদি, তাহলে বলি। দোহাই ধর্ম্ম বল্‌ছি,—এ সম্বন্ধটায় আমি ইচ্ছা-সুখে মত দিই নি। আমার ভাইটি খেয়ালী লোক। খেয়ালের ঝোঁকে জেদাজেদি করে শেষে যখন মেয়েমানুষের মত কান্না জুড়ে দিলে, তখন ত্যক্ত হয়ে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলুম। ভাবলুম ওর খেয়ালই মিটুক,—তার পর যা থাকে ভাগ্যে! শুনলাম ছোট মেয়ে,—ভাবলাম হোল ভাল। বিয়ের পর মেয়েটা নিশ্চয় কান্নাকাটি করে বাপের বাড়ী পালাবে,—আমিও তাই চাই। ভাইয়ের খেয়াল মিটিয়ে,—দায়ে খালাস। কিন্তু শেষে দেখা গেল নারায়ণের খেয়াল অন্য রকম। এখন ভাইয়ের চৈতন্য হলে বাঁচি!"

"তার মানে? ফের সেই পুরানো জিদ ধরেছিস?"

ব্যথিত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া খন্তর উন্মনাভাবে বলিল, "জিদ সংসারে টেকে না দাদা, দর্পহারী মধুসূদন মাথার উপর আছেন।"

সুমার ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, "তা আছেন। আর খামকা ওই মেয়েটার মনে কষ্ট দিয়ে তুই ভাল কায করিস্ নি।"

খন্তর চমকিয়া উঠিল! ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কার মনে কষ্ট দিয়েছি?"

সুমার সসঙ্কোচে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

খন্তর পুনরায় পূর্ব্ব প্রশ্ন আবৃত্তি করিল।

সুমার সভয়ে বলিল, "তুই চটে উঠ্‌বি বাপু,—থাক সে কথা। খাবি চল।"

খন্তর তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কিন্তু কার কথা শুনি?"

সুমার বিপদগ্রস্ত হইয়া বলিল, "আঃ, ছাড় ভাই, লাগে। কেন আমায় দায়ে ফেলিস্? তুই ত মনে মনে জানিস। শনিচর ত তোকে বলেছিল।"

খন্তর তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তার বছর বহিনের সঙ্গে সাগার কথা? ভাল আপদ! সে আমার ইচ্ছা! এতে মনে কষ্ট পাবার কি আছে?"

সুমার নিম্ন স্বরে সসঙ্কোচে বলিল, "তোকে তার বড় পছন্দ হয়েছিল। হবারই ত কথা। রূপে গুণে স্বভাব চরিত্রে এমন লোক আর পাবে কোথা? তুই হঠাৎ চলে যাওয়ায়, আমাদের সকলেরই দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু সে যেন একেবারে ভেঙে পড়ল! সেই জন্যেই বোধ হয়, আর এখানে টিক্‌তে পারলে না। কত লোক সাধাসাধি করলে,—ভিখুয়া ছোঁড়া ত ক্ষেপে উঠেছিল বল্‌লেই হয়,—কিন্তু সে কাউকে সাগা কর্‌তে রাজী হোল না।"

খন্তর যে রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য অন্ধকারে ঘুরিতেছিল,—আজ হঠাৎ তাহার উপর আলোকরশ্মিপাত হইল কি? মনে অতীত স্মৃতি বিদ্যুৎবেগে চমকিয়া গেল। খন্তর বিচলিত হইল! কিন্তু সে মাত্র মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই সে চিন্তা হইতে সবলে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইল। ছিঃ, দুর্জ্জয় লোভী, দরিদ্র মাতাল,—হঠাৎ প্রচুর মদ আয়ত্তের মধ্যে পাইলে, মত্ত উল্লাসে আত্মহারা হইয়া,—মদের স্তবগানে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু খন্তরের আত্ম-সম্মান-জ্ঞান আছে। বৈধ, অবৈধ,—কোন নেশার চরণে আত্মবিক্রয় করিতে তাহার লজ্জা বোধ হওয়া উচিত! ঘৃণা বোধ হওয়া উচিত!

দুই হাতে নিজের চোখ ডলিতে ডলিতে জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তোরা নেশার চোখে সারা দুনিয়াখানা বড্ড রঙিন্ দেখছিস্ সুমার! কথায় কথায় খাসা এক গাঁজাখুরি গল্প জুড়ে দিলি! শূয়োর কাঁহাকা? চল্ খেয়ে আসা যাক। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে। তোর গেঁজেলি শুনে মোহিত হওয়া, আমার কর্ম্ম নয়।"

হায়রে ব্যথিতা নারী! হায়রে হতাশ প্রেম! খস্তরের মত অরসিক হাতুড়ে মিস্ত্রীর নিকট উহা এত অবহেলার বস্তু! আহত চিত্তে হতাশ ভাবে সুমার বলিল, "আমি জানি, তুই আমার কথা বিশ্বাস কর্‌বি না। শনিচরকে জিজ্ঞাসা করিস,—কানহাইয়ালালও সাক্ষী আছে।"

সহাস্যে বিদ্রূপভরে খন্তর বলিল, "বলিস কিরে? এত সব হোমরা চোম্‌রার কাছে সে তার জবানবন্দী দাখিল করে গেছে!"

রাগ করিয়া সুমার বলিল, "সে কি মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলেছে? তবে হাব-ভাবে ত সব বোঝা যায়। মেয়ে মহলের কথায় তুই কাণ দিবি না,—"

বাধা দিয়া খন্তর বলিল, "না। মাপ কর সুমার! এক পাল মুখখু বোকা, বেহায়া, ঝগড়াটে মেয়ের কথায় কাণ দেওয়ার চাইতে, কাণ দুটো কেটে ফেলা ভাল। হ্যাঁরে, ওরা এখনো তেম্নি ঝগড়া করে? তেম্নি চেঁচায়?"

আরব্ধ প্রসঙ্গের আলোচনা ছাড়িয়া খন্তর সহসা এমন সব অবান্তর বিষয়ে গভীর মনোযোগ প্রকাশ করিল যে সুমার সাক্ষ্য প্রমাণাদি সম্বন্ধে আর কথা বলিবার সুবিধা পাইল না।

ঘরে তালা চাবি লাগাইয়া খন্তর সুমারের সহিত খাইতে চলিল। কিন্তু সেখানে গিয়া যে দৃশ্য চোখে ঠেকিল তাহা অপ্রত্যাশিত না হইলেও নিরতিশয় অপ্রীতিকর। বিষয়টা সনাতন,—অর্থাৎ সংসারের কায লইয়া শাশুড়ী বধূর কলহ! সুমারের মাতা প্রমাণ করিতে চাহেন,—তাঁহার পুত্রবধূ সংসারের কাযে যথোপযুক্ত পরিশ্রম করে না, কেবল নিজের রুগ্ন কন্যা দু'টিকে লইয়া ফাঁকি দিয়া, প্রচুর পরিমাণে আহার ও বিশ্রাম করে। বধূ উত্তরে অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে—তাহার দুই শিশু কন্যা অসুস্থ, সে নিজে অসুস্থ,—গর্ভে আর একটা জীব রহিয়াছে।

তথাপি সংসারের কাযে দিনরাত খাটিয়া—না পায় যশ, না পায় সুখ শান্তি। অতঃপর আর সংসারের কোন সংস্রবে থাকিবে না। স্বামী তাহার ব্যবস্থা করিবে ত করুক, নচেৎ সে মনের দুঃখে এবার যা হোক এক কাণ্ড করিবে—ইত্যাদি।

সুমারের বৃদ্ধ পিতার এ সব কলহ কিচকিচি গা-সহা হইয়া গিয়াছে। তিনি নিরুদ্বিগ্নভাবে দাওয়ার এক কোণে বসিয়া হুঁকা টানিতেছেন এবং মাঝে মাঝে উভয়কে থামাইবার জন্য বৃথা সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিতেছেন।

সুমার স্বভাবতঃই তাহার পিতার মত শান্ত সহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ। সে কয় মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া উভয়ের বচসা শুনিল। তার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, দাওয়ায় উঠিল। শ্বশুরকে বসিবার জন্য একটা চ্যাটাই দিয়া বাপের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার ত নাওয়া হয়েছে। বস। আমাদের খাবার নিয়ে আসি।"

সটান হেঁসেলে ঢুকিয়া নিজেদের উপযুক্ত রুটি তরকারি, ধনে শাকের চাটনি, দই এবং পেঁড়া আনিয়া, শ্বশুর ও পিতাকে দিয়া নিজেও খাইতে বসিল। শাশুড়ী বধূর ঝগড়া চলিতেই লাগিল। কিন্তু পিতা পুত্র কেহ সেদিকে কর্ণপাত করিল না, কোনও কথাও বলিল না।

এই লজ্জাজনক কলহ কোলাহলে শ্বশুর মনে মনে অস্বস্তি-পীড়ন বোধ করিল। মানুষ যে কতখানি নিরুপায় হইয়া অবস্থার দাসত্বে আত্মসমর্পণ করে,—সুমারের ধৈর্য্যভার-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে তাহা বিচার করিতে লাগিল। ভাবিল আজ যদি সে ঐ অবস্থায় পড়িত, তাহা হইলে কি করিত?

মুহূর্ত্তে শ্বশুরের চিত্ত বিনা-চিন্তায় উত্তর দিল—সে গোড়া হইতে স্মরণ রাখিয়া চলিত সংযমই জীবন,—অসংযমই মৃত্যু। অভাবের সংসারে, যেখানে স্ত্রীকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়,—

অন্ততঃ তাহা করা আবশ্যক, এবং উচিত—সেখানে ইন্দ্রিয়গত অসংযম-মূঢ়তা সে জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে দমন রাখিত। পত্নীকে বারবার ক্ষীণজীবী রুগ্ন সন্তান উপহার দিয়া অধিকতর অসুস্থ-দুর্ব্বল করিত না—সংসারের কাযের অনুপযোগী করিত না—অভাবের সংসারে অধিক প্রাণী সৃষ্টি করিয়া, অভাব বাড়াইত না—সকলের জীবন দুর্ব্বহ করিত না।

খন্তর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সুমারকে যাহা বলিয়াছিল,—এখন সুমারের অবস্থা বিচার করিতে গিয়া আবার তাহাই মনে পড়িল! সংসারের সকল কদর্য্য অশান্তির মূল,—স্বার্থপরতা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পাপ! ইহা হইতেই যত অনর্থ সৃষ্টি!

খন্তর শুধু সুমারের দিকটা বিচার করিল। অপব কাহারও দিক হইতে কিছু বিচার করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু সুমারের জননী যখন তাহাদের খাওয়াইবার জন্য সামনে আসিয়া বসিলেন, এবং স্ত্রৈণ পুত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বধূর দোষ কীর্ত্তন জুড়িলেন, তখন খন্তর বিনা দ্বিধায় সহসা বধূর পক্ষ অবলম্বন করিল। অসময়ে যে বালিকাকে শুভ বিবাহে বাধ্য করা হইয়াছে, অল্প বয়সে যাহাকে সন্তানের মাতৃত্বে অভিষেক করা হইয়াছে, সে যদি অস্বাস্থ্যপীড়িত, অলস, অবসাদগ্রস্ত, ক্লান্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির না হয়, তবে কে হইবে? বধূর প্রতি অবিচার করিবার পূর্ব্বে অভিভাবকগণের নিজেদের বিবেচনা ক্রটির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। নিজেদের হিতাহিত বিবেচনা করিবার মত শিক্ষা, বধূকে পূর্ব্বে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

খন্তরের এই ধরণের কথাগুলা কতখানি যুক্তিসহ হইতেছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার মত চিন্তাশক্তি বা জ্ঞানবুদ্ধি সেখানে কাহারও ছিল না। কিন্তু সকলেই বুঝিল—খন্তর যাহা বলিতেছে, তাহা তাহাদের অবস্থার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব,—অত্যন্ত বড় কথা! এই অশিক্ষিত

দরিদ্র সমাজের পক্ষে, অল্পবয়স্কা বধূদের হিতাহিত বিবেচনা করিবার মত সুশিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব—নিতান্তই "ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন" দেখার মত—দুঃসহ ভাব-বিলাসিতা! এ সমাজে ও সব চলে না।

সুমারের জননী কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ছাখ খন্তরা, তুই নেহাৎ কপাল জোরে টাকা কামাস্। নইলে,—বুদ্ধি তোর এক ছটাক নেই বাছা।"

খন্তর তৎক্ষণাৎ নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া সহাস্যে বলিল, "তা নইলে তোমাদের মত মার ছেলে হ'ব কেন? বুদ্ধি থাক্‌লে আমি সকলের আগে বুদ্ধিমতী মা খুঁজে নিতুম। তবে পৃথিবীতে আস্‌তাম।"

সুমারের জননী বলিলেন, "ভুল করে যখন এসেছিস্ তখন উপায় নেই। এখন বুদ্ধিমতী দেখে বৌ আন দেখি তাদের ছেলে পিলেরা কত বুদ্ধিমান হয়।"

অন্তরালবর্ত্তিনী সুমারের বধূর কলহ-পাণ্ডিত্যের উদ্দেশে ইঙ্গিত করিয়া খন্তর হাসিয়া বলিল, "এখনো তোমাদের সখ্ মেটে নি? আবার বায়না?"

সুমার খাইতে খাইতে সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, "কিন্তু রোজকার করছিস্ কার জন্যে? ভোগ করবে কে?"

খন্তর স্মিতমুখে বলিল, "নিজের স্ত্রী পুত্রটি ছাড়া, রোজকার ভোগ করবার আর কেউ থাকা উচিত নয় বুঝি?"

সুমারের পিতা চাটুনি আস্বাদন করিতে করিতে বলিলেন, "কিন্তু বাবা, সংসার ধর্ম্ম পালন করাও ত ধর্ম্ম?"

খন্তর মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিকমত ভাবে পালন কর্‌তে পার্‌লে! নইলে ভয়ানক অধর্ম্মের ভোগ ভুগ্‌তে হয়।"

সুমারের চার বছর বয়সের বড় মেয়েটি সেই সময় ঘরের ভিতর হইতে

আসিয়া পিতামহের পাতের কাছে বসিল। মেয়েটি প্লীহা যকৃতে জীর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ ধূলামলিন, গায়ে তেল-চিটা-ধরা দুর্গন্ধময় জামা। রুগ্ন শিশু লোলুপ-দৃষ্টিতে পিতামহের পাতের দিকে চাহিয়া, আঙুল বাড়াইয়া মিষ্টটা দেখাইল। পিতামহ একটু মিষ্ট তাহার মুখে তুলিয়া দিলেন। বাঁ হাত বাড়াইয়া মেয়েটির পাঁজরের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজও গা গরম। মেয়েটা কি করেই যে বাঁচবে, জানি না। ছোটটার জ্বর-জাড়ি ত লেগেই আছে, ওটার আশা ভরসা আর নাই!"

খন্তর জলের গ্লাশটা মুখ হইতে নামাইয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল। বলিল, "ডাক্তার বদ্যি দেখানো হচ্ছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এক শিশি ওষুদ খেয়েছিল, কিছু হয় নি। বার মাস ভুগলে পেরেই বা উঠি কি করে? ডাক্তার বল্ ওষুধ বল্, সবই পয়সার খেল্। অত পাই বা কোথা?"

খন্তর একটু ভাবিল। সুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই, আজ বিকালে ছোট ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাব। সেই সময় এই বাচ্চা দু'টোকে নিয়ে আমার সঙ্গে যাস ত।"

অর্থাৎ চিকিৎসা খরচের দায়িত্ব সে নিজের স্কন্ধে লইল। খন্তরের মত উপার্জ্জনশীল অসংসারী ব্যক্তির কাছে পাড়া প্রতিবেশীরা ইহাই প্রত্যাশা করে। এ ব্যাপার নূতনও নয়, বিচিত্রও নয়। ইহাতে উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চেষ্টা বাহুল্য মাত্র। বৃদ্ধ শুধু বলিলেন, "খন্তরা দেশে এসেছে, এবার আমি বাঁচলুন। খন্তরা না থাক্‌লে কি কোন কায হয়? ভ্যাখ বাবা, যা ভাল বুঝিস্ কর।"

খন্তর আঁচাইয়া নিজের গৃহে গেল। তক্তপোষে বিছানার বাণ্ডিল খুলিয়া ছড়াইয়া দিতেছে, এমন সময় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে সুমার আবার আসিল। খন্তরের হাতে দু'খিলি পাণ দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে

বলিল, "পাছে শুয়ে পড়িস, তাই তাড়াতাড়ি পাণ সেজে নিয়ে ছুটে আস্‌ছি।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে মেঝেয় সে বসিয়া পড়িল।

খন্তর পাণ খাইতে ভুলিয়া গেল। স্থির দৃষ্টিতে সুমারের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষুব্ধ বেদনার স্বরে বলিল, "যোয়ান বয়সে হৃদ্‌পিণ্ড এত দুর্ব্বল! এইটুকু ছুটে এসে কুকুরের মত হাঁপাচ্ছিস্! শরীরটার দফা নিকেশ করেছিস্! কোনও রোগ নেই, খাচ্ছিস্ ভাল,···তবু এ কি রে?"

ঘন ঘন নিঃশ্বাস লইতে লইতে সুমার ক্লান্তস্বরে বলিল, "শরীরটা আর বইছে না ভাই। দু' পা হাঁটতে হলে, কি ছুটতে হলে আজকাল ওম্নি বুক ধড়্ ধড়্ করে। এবার কোনদিন পড়্‌ব, আর মর্‌ব।"

তীব্র ভৎর্সনার স্বরে খন্তর বলিল, "বড় বাহাদুর!"

সেই ক্ষুদ্র কথা দুইটির সঙ্গে খন্তরের চোখের দৃষ্টি এবং কণ্ঠস্বরের এমন কিছু ভাবব্যঞ্জনাপূর্ণ বিশেষত্ব যোগ করা ছিল,—যাহা মুহূর্ত্তে সুমারকে লজ্জায় অধোমুখ করিল। খন্তর নীরবে তাহার দিকে কয় মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। তার পর একটা শতরঞ্জি ও বালিশ মেঝেয় নামাইয়া শয্যা বিছাইল।

ঘরের দেয়ালে ঠেসানো খাটিয়াটা আনিয়া মেঝেয় পাতিল। শতরঞ্জি তাহাতে পাতিয়া বালিশটা যথাস্থানে রাখিল। সুমারের হাত ধরিয়া জোর করিয়া তক্তপোষে উঠাইয়া বলিল, "তুই এইখানে শুয়ে একটু জিরো। আমি খাটিয়ায় ঘুমুব। শো তুই, আমি আসছি।"

বাহিরে গিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিল।

১০

কিছুক্ষণ পরে খন্তর ফিরিল। দুয়ার ভেজাইয়া নীরবে শুইয়া পড়িল। সুমার নিদ্রালস জড়িতকণ্ঠে বলিল, "কোথা গিয়েছিলি ?"

"এইখানেই।" বলিয়া খন্তর পাশ ফিরিয়া চক্ষু বুজিল। অগত্যা সুমারও পুনশ্চ নিদ্রার আরাধনায় মন দিল।

বেলা চারটার পর খন্তর জাগিল, সুমারকে জাগাইল। বলিল, "যা, মেয়ে দু'টিকে একটু পরিষ্কার করে ফর্শা জামা পরিয়ে আন। ওদের মা খেয়েছে, না উপোস করে আছে,—খোঁজটা নিস্।"

সুমার সবিস্ময়ে বলিল—"খায় নি ?"

"তখন পর্য্যন্ত নয়। আমি বাইরে থেকে যতটা পারি বলে এলুম। কথা রেখেছে কি-না জানি না।"

সুমার বলিল, "তাই বুঝি তখন বেরিয়ে গিয়েছিলি ? কই বল্‌লি না ত ?"

একটু হাসিয়া খন্তর বলিল, "তোর ছাতির বহর দেখে দমে গিয়েছিলাম, বলি কোন মুখে ? তোদের বে-আক্কেল দেখলে, তুলে আছাড় দিতে ইচ্ছে হয়। স্ত্রীকে তোরা বড় ভালবাসিস্, না ?···এত ভালবাসিস্ যে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, না ? স্ত্রীর সম্বন্ধে, ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যও মনে থাকে না, নয় ?"

সুমার মাথা চুলকাইয়া সকরুণ মুখে বলিল, "কি করব বল্ ?"

খন্তর বলিল, "দয়া করে বাঁচবার চেষ্টায় মন দাও, তাহলেই বাধিত হব। ভালবেসেছ স্ত্রীকে নয়,—নিজের যথেচ্ছাচারকে। যে ভালবাসা কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেয়, সেটা ভালও নয়, বাসাও নয়। যা আগে ছাখ্, খেয়েছে কি-না ?"

সুমার চলিয়া গেল।

আঃ, ইহাদের সংসারধর্ম্ম পালনের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দেখিলে, তাহার সংসারধর্ম্মে বিতৃষ্ণা জাগে। এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, স্বার্থপরতার নাম সংসারধর্ম্ম? তবে মহা অধর্ম্ম কাকে বলে?

একটু পরে রোরুদ্যমানা শিশুকন্যাকে বুকে লইয়া বড় মেয়েটির হাত ধরিয়া সুমার আসিল। শিশুকে এইটুকু পথ বহিয়া আনিয়া সে ক্লান্তিভরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল। খন্তর চিন্তিতভাবে তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল। তার পর বলিল, "এদের মা খেয়েছে? ঝগড়া থেমেছে?"

শিশুকে দাওয়ায় ছাড়িয়া দিয়া সুমার শ্রান্তভাবে বসিল। বলিল, "তোর কথা রাখবার জন্যে খেয়েছে, মা বল্লে। তবে ঝগড়া ছাড়ে নি। রাগের মাথায় মেয়েটাকে ঠুকেছে দ্যাখ্! কি উগ্রচণ্ডা মানুষ বল্ ত?"

খন্তর জামা জুতা পরিয়া মাথায় মুরেঠা জড়াইতে জড়াইতে চুপ করিয়া রহিল। কাহাকে দোষ দিবে? ইহারা কেহই মন বুদ্ধির অসংযমকে শাসন করিতে শিখে নাই। পিতৃত্বের মাতৃত্বের দায়িত্ব ইহাদের কাছে শুধু মূঢ় দম্ভে পর্য্যবসিত!···

বিষাদভরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি ভাবছি রে,—এই ত মায়ের দেহমনের অবস্থা! ওর পেটের ছেলেটি যদি বাঁচে, তার মেজাজের অবস্থা কি হবে? শরীরের অবস্থাই বা কেমন দাঁড়াবে?"

ধুঁকিতে ধুঁকিতে প্রচণ্ড তাচ্ছিল্যভরা বিরক্তির সহিত সুমার বলিল, "মরুক গে। আমি কারুর জন্যে ভাবতে পারি না। বরাতে থাকে, বাঁচ্‌বে। না থাকে মর্‌বে।"

খন্তর বলিল, "বেঁচে থাকাটাই সব চেয়ে বড় কথা নয় সুমার। হিংসুটে, খল, রক্তপিপাসু জন্তু জানোয়ার ত পৃথিবীতে অনেক বেঁচে আছে।

তাঁদের বেঁচে থাকায়—সমাজের শান্তি কই? মঙ্গল কই? মানুষের পক্ষে সুস্থ, শান্ত, পবিত্র-স্বভাব মানুষ হয়ে বেঁচে থাকাই প্রার্থনীয়।”

স্থূলবুদ্ধি সুমার এ কথার অর্থ কি কতদূর বুঝিল ঠিক জানা গেল না,—নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত শ্বস্তরের পানে চাহিয়া রহিল।

শ্বস্তর পুনরায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল। নিজেদের হিতাহিত উপলব্ধি করিবার বোধশক্তি পর্য্যন্ত এ হতভাগ্যদের নিদ্রিত! ইহারা শুধু পশুর মত জীবন যাপন করিয়া, পশুর মত দেহত্যাগ করাই, জন্মগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য, জানিয়া রাখিয়াছে! তর্কের মাথায় ইহারা সুলভ তত্ত্বজ্ঞানের বড় বড় কথা আওড়ায়,—পরকে ভাল ভাল উপদেশ দেয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহারা নিজেদের চিত্তদৌর্ব্বল্য জয় করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। কুৎসিত অভ্যাসের দ্বারা ইহারা এমনভাবে নিজেদের চরিত্র গঠন করিয়াছে যে,—স্বচ্ছন্দে দম্ভের সহিত ভাবিয়া থাকে,—পশু-ধর্ম্মই বুঝি মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ! প্রকৃতির অমোঘ দণ্ড যখন ইহাদের পাপের শাস্তি দান করিতে থাকে, তখন ইহারা অদৃষ্ট তথা ঈশ্বরের দোষ দিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করে।—হে ঈশ্বর, এই মূঢ় নির্ব্বোধ-গণের জ্ঞানবুদ্ধি উন্মেষের জন্য, ইহাদের মন বুদ্ধির পবিত্রতার জন্য, সুশিক্ষার ব্যবস্থা কর। ইহাদের অধঃপতন রোধ কর প্রভু!

শ্বস্তর চিন্তাকুলচিত্তে এক নিমেষে অনেক কথাই ভাবিল।

রুগ্ন কচি মেয়েটি খুব কাঁদিতেছিল। সুমার তাহাকে শান্ত করিতে পারিল না। অপরিচিত শ্বস্তরের কাছে সে আসিবে না, ইহা নিশ্চিত বুঝিয়াও, শ্বস্তর তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিল। আশ্চর্য্যের বিষয়,—মেয়েটি অতি সহজে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল। এ সংসারে এক শ্রেণীর সদয়-স্বভাব মানুষ আছে, শিশুরা কিছু না বুঝিয়াই দেখিবামাত্র তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। শ্বস্তর অনেকটা সেই শ্রেণীর মানুষ।

যদিও সে সময়ের অভাবে, কাযের তাড়ায়, শিশুদের এড়াইয়া চলিত,—কিন্তু শিশুরা সুযোগ পাইলে তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে কার্পণ্য করিত না।

খন্তর মেয়েটিকে বুকে লইয়া চলিতে চলিতে বলিল, "আহা, বেচারীর হাড় পাঁজ্‌রা সব জির্‌ জির্‌ কর্‌ছে। বরং বড় মেয়েটাকে মানুষ বলে চেনা যায় কিন্তু এটা—কি রে? এর বয়স কত হোল?"

সুমার উত্তর দিল, "দেড় বছর। বল তো ভাই, আবার তাড়াতাড়ি হওয়া কেন?"

খন্তর বলিল, "সে কৈফিয়ৎটার দায়ি কে?"

সুমার কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিল, "অদৃষ্ট রে অদৃষ্ট!"

খন্তর একটু হাসিয়া বলিল, "হুঁ, সস্তা ধাপ্পাবাজিতে নিজেকে ঠকাবার অমন সহজ সদুপায় আর নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভগবান অত বোকা ন'ন। মানুষের বাক্-চাতুরীতে তিনি ভোলেন না।"

খন্তর মিষ্ট ভাষায় সুমারকে নানা কথা বুঝাইতে বুঝাইতে চলিল।

ডাক্তারের নিকট পৌছিয়া দেখিল তিনি তখন তাড়াতাড়ি কোন জরুরী 'ডাকে' বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। খন্তর পুনরায় গয়ায় বদলি হইয়া আসিয়াছে শুনিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সংক্ষেপে তাহার কর্ম্মজীবনের উন্নতির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কথা কহিতে কহিতে তিনি সুমারের কন্যা দু'টিকে পরীক্ষা করিলেন। তাহাদের জন্য ব্যবস্থাপত্র লিখিতে লিখিতে, বক্র কটাক্ষে বার কয়েক সুমারের শীর্ণমলিন দীপ্তিহীন মুখের দিকে চাহিলেন। তার পর বাঁ হাতের তর্জ্জনী নির্দ্দেশে শিশুদের দেখাইয়া বলিলেন, "এদের মায়ের শরীরও বোধ হয় ভাল নেই?"

সুমার নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। অগত্যা খন্তর জবাব দিল,

জানাইল—তাঁহার অনুমান সত্য। রুগ্ন শিশুদের রুগ্না জননীটি পুনরায় সন্তানসম্ভাবিতা।

ডাক্তার ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তার পর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এই পাহাড়ে দেশের জল হাওয়ার গুণে, পুরুষানুক্রমিক শ্রম-পটুতায়, ধর্ম্মভাব চর্চ্চায়, ইন্দ্রিয় সংযমে তোমাদের জাতের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। কিন্তু এবার ভাঙন ধরেছে। সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার কৌশলটা তোমরা ভুলে যাচ্ছ। অসংযম অত্যাচারের ফলে, যে সব ছেলে মেয়ে পৃথিবীতে আন্‌ছ, তাদের ডাক্তার বদ্যির ওষুদ খাইয়ে সুস্থ সবল রাখ্‌বার চেষ্টাটা কি রকম জানো? যেমন গাছের গোড়া কেটে, আগায় জল ঢালা!"

একটু থামিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের দেশের লোক ত ভয়ানক চালাক! চালাকির জোরে তারা ভূত ভগবান সব উড়িয়ে দেয়,—স্বাস্থ্যতত্ত্ব ত অতি তুচ্ছ কথা। তোমরাও ক্রমশঃ তেম্নি বুদ্ধিমান হয়ে উঠ্‌ছ।"

খস্তর বলিল, "বলা মিথ্যে। ওরা জবাব দেবে—সবই অদৃষ্ট ফল!"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "হুঁ, কিন্তু সে ফলটা বনজঙ্গলের গাছে ফলে না। জ্ঞানীরা বলেছেন "ভাগ্যগুণ, আর ভাগ্যদোষটা কিছুই নয়, সেটা নিজের নিজের বুদ্ধিগুণ, আর বুদ্ধিদোষমাত্র!" এই তার দৃষ্টান্ত!"

বলিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া রুগ্ন শিশু দুইটিকে দেখাইলেন। ব্যবস্থা-পত্র দুইখানি সুমারের হাতে দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "তোমায় একটু চটিয়ে দিলাম বাপু, কিছু মনে কোর না। যাও, ওষুদ নাও গিয়ে। মেয়েরা কেমন থাকে, খবর দিও। আমি এখন উঠি।"

ডাক্তার বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় কান্‌হাইয়ালাল

ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উদ্বেগ-ব্যাকুল মুখে বলিল, "হুজুর, দুপুরবেলা বড় গোলমাল গেছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "তা ত যাবেই। নূতন গরম, দুপুরের সময় সব রোগীই গোলমাল করে। জ্বর বেড়েছে ?"

"তা জানি না"—

"ঐ ত দুঃখ! তোমার মত বুদ্ধিমান চাকররা কোন খবরই জানে না। চল আমি যাচ্ছি।"

ডাক্তার বাহিরে গিয়া সাইকেল ঠিক করিতে লাগিলেন। খন্তর জিজ্ঞাসা করিল, "কার অসুখ ?"

"আমার মনিবের।—" বলিয়া কান্‌হাইয়া খন্তরের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই কবে এলি ? ভাল আছিস ত ?"

খন্তর বলিল, "হাঁ। বাবুর কি অসুখ হয়েছে ?"

কানহাইয়ালাল বলিল, "নীল্‌মনিয়া রে! বাড়ীতে মাইজী ছাড়া কেউ নেই।—একা চারিদিকে ছুটোছুটি করে আমার জান্ গেল ভাই, চললুম এখন।"

সে উর্দ্ধশ্বাসে আবার ছুটিল। ডাক্তারও চলিলেন।

খন্তর একটু ভাবিল। পুরাতন দিনের স্মৃতি মনে পড়িল।—একদিন এই প্রভু তাহার অন্নদাতা ছিলেন। আজ তাঁহার গুরুতর পীড়ায় যখন লোকাভাবের কথাটা কাণে গেল, তখন গিয়া খোঁজ লওয়া উচিত,—খন্তরের দ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে কি-না। আগামী কাল চাকরীতে যোগ দিতে হইবে। কাল আর সময় পাইবে কি-না সন্দেহ।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া সুমারের হাতে দিয়া বলিল, "তুই ওষুদ আর এক কৌটা বার্লি কিনে আন। আমি বাচ্চা দু'টোকে বাড়ীতে

পৌঁছে দিয়ে, বড়বাবুকে দেখ্‌তে চললুম। কখন ফিরব, ঠিক নেই। রাত্রে আমার খাবার কর্‌তে বারণ করিস্‌।”

শিশু দু’টিকে স্থমারের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া খন্তর দ্রুতপদে বড়বাবুর বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া দেখিল,—ডাক্তার তখন বাহিরে দাঁড়াইয়া কয়েকজন বাঙালী ও হিন্দুস্থানী রেলওয়ে কর্ম্মচারীর সহিত প্রফুল্ল মুখে কথা কহিতেছেন।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীগুলি প্রায় সকলেই খন্তরের পরিচিত। খন্তর নিকটে গিয়া তাঁহাদের অভিবাদন করিল। তাঁহারা খন্তরকে দেখিয়া খুশী হইলেন। খন্তরের পদোন্নতির সংবাদ ইহাঁরা পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, মামুলি কুশল প্রশ্ন সহ সকলে তাহাকে শুভ কামনা জানাইলেন।

খন্তর ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিল, “বড়বাবুকে এখন কেমন দেখ্‌লেন?”

ডাক্তার বলিলেন, “এখন অনেকটা ভাল। নিউমোনিয়ার উপক্রম হয়েছিল বটে, কিন্তু সাম্‌লে গেছেন। এখন রোগের অবস্থা ত সাংঘাতিক নয়, সেবা-শুশ্রূষার লোকের অভাবেই যত গোলমাল।”

একজন বাঙালী ভদ্রলোক বলিলেন, “চারিদিকে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল, কেউ যে আস্‌তে পারলে না। ওঁর বড় মেয়ের স্বামীর অসুখ। ছোট মেয়ে প্রসব হয়েছেন। মেজ মেয়ের ছেলেদের বসন্ত হয়েছে, তাঁরা আস্‌বেন কি করে? তবে টেলিগ্রাম এসেছে,—ওঁর ভাইঝিকে তাঁর শ্বশুর ছুটি দিয়েছেন। তিনি আজ রাত্রের ট্রেণে এসে পৌঁছুবেন।”

আর একজন বলিলেন, “কোন ভাইঝি? যিনি বিধবা? আগে এখানে থাকতেন?”

উত্তর হইল, “হাঁ। মেয়েটি সেবা-শুশ্রূষার কাযে বেশ পাকা। খুব বুদ্ধিমতী গুণবতী মেয়ে, কিন্তু দোষের মধ্যে—দুর্ভাগা!”

ডাক্তার নস্যের কৌটা বাহির করিয়া একটিপ নস্য টানিয়া, রুমালে নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন, "আমাদের দেশের দুর্ভাগা মেয়েরাই সেবার কাযে পাকা হয় মশাই! ভাগ্যবতীরা অতটা পেরে ওঠেন না। ছোট বয়স থেকে নিজেদের কাচ্চা-বাচ্চা স্বামী সংসার নিয়ে তাঁরা বিব্রত হয়ে পড়েন,—করেন-ই বা কি?"

একজন রুক্ষ, শীর্ণ-মূর্ত্তি, প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "কর্‌লে চলে-ই বা কই? মানুষের শরীর ত, ক্ষ্যামতার একটা সীমা আছে ত? নিজের সংসার ফেলে, তাঁরা যদি পরের সেবা কর্‌তে যান,—রামকৃষ্ণ মিশন খোলেন—. তাহলে তাঁদের কচি-কাচাদের দেখে কে? তাঁর সংসার দেখে কে? তাঁর স্বামীর সেবা যত্ন করা, অফিসের ভাত দেওয়া,—এ সব করে কে?"

ডাক্তার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিত হাস্যে বলিলেন, "নিশ্চয়! তার পর তাঁদের ক্ষমতার মোটা খরচ,—যেটা আপনি হিসাবের ফর্দ্দে এ্যাড্ কর্‌তে ভুলেছেন,—অর্থাৎ বছর বছর রুগ্ন নির্জ্জীব সন্তান প্রসব করা, আর পঙ্গু অক্ষম রুগ্ন অবস্থায় দীর্ঘকাল শয্যাশায়িনী থাকা,—সে ডিউটিই বা পালন করে কে? ডিউটি ইজ্ ডিউটি—মশাই! ডিউটি ফাঁকি দিয়ে তাঁরা বুড়ো মা, বাপ, মাসি, পিসির, অসময়ে সেবা করে—বাজে কাযে এনার্জ্জি লস্ কর্‌লে আমাদের স্বার্থ রক্ষা হয় কিসে?"

রুক্ষ-মূর্ত্তি প্রৌঢ় স্তব্ধ হইলেন। বোধ হইল তাঁহার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের আদর্শের সহিত ওই কথা কয়টির বিশেষ সংশ্রব আছে! অন্য সকলে মুখ ফিরাইয়া হাসিলেন। একজন বৃদ্ধ বলিলেন, "ওহে ছোকরার দল, তোমরা ধরে-বেঁধে এই ডাক্তারটার বিয়ে দাও ত!"

একজন যুবক হাসিয়া বলিল, "শুধু বিয়ে নয়,—একটি দুর্ভাগা মেয়ে দেখে কণ্ঠি বদল করিয়ে দিতে হবে। তা'পর দেখা যাবে, ডাক্তার কেমন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম দি সেকেণ্ড চালান।"

পুনশ্চ একটিপ নস্য টানিয়া ডাক্তার বলিলেন, "ঘরের বিড়াল বনে গেলেই বন-বিড়াল হয়,—ডাক্তারের সে হুঁস্ আছে! আমার তেওয়ারী ঠাকুর আর শুক্‌রা চাকর ব্যাটা বেঁচে থাক,—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমি মর্‌বার আগে,—ও দু'ব্যাটা যেন না মরে। তা হলেই আমি খুশী। চললুম মশাই, ধরমশালায় একজন যাত্রী খুব জ্বর নিয়ে পড়েছে, তার ব্যবস্থা করি গে।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বিয়ের নাম শুন্‌লেই ডাক্তার অম্নি চম্পট দিতে উদ্যত! বিয়ের নামে অত ডরাও কেন হে?"

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, "আজ্ঞে না, বিয়েকে ডরাই নে। ডরাই আপনাদের শুভ বিবাহের সুমধুর ব্যবস্থাকে!—সুন্দর বুদ্ধিকে! —একটা ছেলেকে ভাল রকমে মানুষ কর্‌বার ক্ষমতা নাই, কিন্তু অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল মত্ততায় পাল পাল ছেলেমেয়ে সৃষ্টি করব, মহাপাপের বোঝা মাথায় তুলে নেব,—এত শক্ত মাথা আমার নয়। আসি এখন, নমস্কার।"

সাইকেলের মুখ ঘুরাইয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত ডাক্তার খন্তরের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন,—সে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাঁহাদের আলাপ আলোচনা শুনিতেছে। ডাক্তার সহসা নিজ মনে বলিয়া উঠিলেন, "এখানকার মধ্যে আমি পছন্দ করি এই খন্তর ছোক্‌রাকে! যদিও স্ত্রী-পুত্রহারা ড্যামেজ প্রাণ; কিন্তু নিজের দুঃখ নিয়ে ছিচ্-কাঁদুনে ছেলের মত প্যান্ প্যানায় না, নিজের কায হারায় না। এর জন্যে ওকে আমি খাতির করি। কি হে, এখানে কি মনে করে?"

খন্তর বলিল। "বাবুর অসুখ শুন্‌লাম। তাই দেখতে এসেছি।"

"অ! ভিতরে যাও।" বলিয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন।

অন্য বাবুগণও নানা কথা আলোচনা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

খন্তর বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া হাঁকিল, "খোকাবাবু—।"

কান্‌হাইয়ালাল রোয়াকে বসিয়া আলো সাফ করিতেছিল। খন্তরকে সঙ্গে লইয়া রোগীর ঘরে পৌঁছাইয়া দিল।

ঘর অন্ধকার। সন্ধ্যা হইয়াছে, তখনও ঘরে আলো দেওয়া হয় নাই। ইতস্ততঃ জিনিসপত্র বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান। বাবুর পাঁচ বছর বয়সের বড় ছেলেটি কি একটা খাবারের জন্য বায়না ধরিয়াছে। রোগীর ঘরের বারেণ্ডায় বসিয়া ক্রমাগত পা ঘষিতেছে ও নাকি সুরে কাঁদিতেছে। ছোট ছেলেটি একজন বুড়া দাইয়ের জিম্মায় বন্দী রহিয়াছে। কিন্তু মাতার কাছে যাইবার জন্য বিশেষ উপদ্রব করিতেছে। দাই তাহাকে সংযত করিতে পারিতেছে না। গৃহিণী সেই মাত্র কাপড় কাচিয়া আসিয়া, আবার রোগীর পরিচর্য্যা করিতে বসিয়াছেন। যন্ত্রণাক্লিষ্ট রোগী তুচ্ছ ত্রুটিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন, ছেলেদের কান্নায় উত্ত্যক্ত উত্তেজিত হইতেছেন। গৃহিণী শুষ্ক ম্লান মুখে নিরুপায় ব্যাকুলতায় কখনও ছেলেদের থামাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কখনও রোগীকে ঔষধ পথ্য দিতেছেন। কখনও রোগীর পথ্য ও ছেলেদের খাবার প্রস্তুতের জন্য রান্না ঘরে ছুটাছুটি করিতেছেন। বাড়ীর সর্ব্বত্র ধূলা বালি, অপরিচ্ছন্নতা, বিশৃঙ্খলা, নিরানন্দ, অবসাদ। বাড়ীতে ঢুকিলেই যেন অস্বস্তিতে মন ভরিয়া উঠে!

অথচ গৃহিণী ঠাকুরাণীর সুগৃহিণীপণায় একদিন এই বাড়ী কত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা-সুন্দর খন্তর দেখিয়াছিল!

নিঃশ্বাস ছাড়িল! মহামায়া, তোমার জগৎ কি পরিবর্ত্তনশীল!

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া, পীড়িত বাবুকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, নমস্কার জানাইল। বাবু ক্ষীণ কাতর স্বরে সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিলেন। এমন সময় কান্‌হাইয়ালাল লণ্ঠন জ্বালিয়া-আনিয়া দুয়ারের

কাছে রাখিল। বাবু বলিলেন, "ওরে, এক ডজন মোমবাতি আনবার জন্যে বলেছিলুম—এনেছিস ?"

কানহাইয়ালাল উত্তর দিল, "না, হুজুর।"

বাবু পুনশ্চ বলিলেন, "যা আগে বাতি কিনে আন, আর মনোর জন্যে কিছু ফল টল কিনে আন। সেই রাত্রি এগারটা বারোটায় মেয়েটা এসে পৌছুবে, খাবে কি ? যা আগে ওগুলো এনে রাখ।"

এমন সময় গৃহিণী ঠাকুরাণী ঘরে ঢুকিয়া জানাইলেন ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, আগে ঔষধ ও মালিশ আনিয়া রোগীকে সেবন করাইতে হইবে। অতএব ?—

রুগ্ন ব্যক্তি মত-বিরুদ্ধতায় অধৈর্য্য উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। একটা বিশ্রী বাদানুবাদের সূচনা হইতেছে দেখিয়া, খস্তর সকলকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "আমায় বলুন না মা, আমি ফল টল কিনে আনছি। কানহাইয়া-লাল ডাক্তারখানায় যাক। আর কি কি কায আছে বলুন ? দরকার হয় ত, রাত্রেও এখানে থাকতে পারি।"

কর্ত্তা আশ্বস্ত হইলেন। গৃহিণী বলিলেন, "না বাবা, রাত্রে থাকতে হবে না। তবে ষ্টেশন থেকে যদি মনোকে নিয়ে এস ত বড় উপকার হয়। তার সঙ্গে বাবুয়ার মা, আর তার ছোট ভাসুর পো আসছে। সে ছেলেটি কখনো এখানে আসে নি, অত রাত্রে নতুন জায়গায় এসে সহজে বাড়ী খুঁজে পাবে কি-না,—সন্দেহ। আমাদের একজন লোক ষ্টেশনে থাকলে ভাল হয়।"

খস্তর সাগ্রহে বলিল, "আচ্ছা, আমি যাব।"

কর্ত্তা বলিলেন, "আমি তাহলে নিশ্চিন্ত হই।—বেনারস এক্সপ্রেস, বুঝলে হে।"

খস্তর বলিল, "আচ্ছা।"

১১

কোলাহল-মুখর তীব্র বৈদ্যুতিক-আলোকোজ্জ্বল, ষ্টেশনের ব্যস্ত-চঞ্চল জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতে করিতে, খন্তর ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। অতীতের স্মৃতি মনে পড়িতেছিল—কেমন একটা ভীরু সঙ্কোচের ভাব মনে উদয় হইতেছিল। একদিন যাহার নিঃশব্দ রহস্যময় দৃষ্টিপাতে দেহ মনে আচম্বিতে দুর্দ্দাম কামনার অগ্নিদাহ সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ দীর্ঘকালের পর—আবার তাহার দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইতে হইবে! কে জানে সে মুহূর্ত্তটা আবার কোনরূপ অশান্তি-কারক হইবে কি-না?

অকস্মাৎ মনের ভিতর প্রচণ্ড দম্ভভরে দুঃসাহসিক কৌতূহল-স্পর্দ্ধা জাগিল—প্রলোভনের সামনে দাঁড়াইয়া এবার তাকে আত্ম-পরীক্ষা করিতে হইবে! দেখিতে হইবে নিজের ক্ষমতার পরিমাণ কতখানি!

খন্তর ভুল করিল! কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে চাহিলে, কঠিন-তর শিক্ষা চাই। সে শিক্ষাকে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করিয়া লইবার জন্য কঠিনতম সাধনা চাই! শুধু অহঙ্কারের বশে আপনাকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া,—দর্পভরে আত্ম-পরীক্ষা করিতে গিয়া এ পৃথিবীতে অনেকেই আত্মহারা হইয়াছেন! বুদ্ধির ভুলে অনেক বড় ক্ষতির দণ্ড বহন করিয়াছেন! মানুষ যে অবস্থায় আত্ম-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়, সে অবস্থা, বড় সহজ অবস্থা নয়! উপযুক্ত সাধনার মূল্য দিয়া সে অবস্থা অর্জ্জন করিতে হয়। অন্যথা, অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু খন্তর এতটা ভাবিয়া দেখিল না। তাহার শুধু মনে হইল,—একদিন যে নারীর গোপন বাসনার আকর্ষণ তাহাকে বিচলিত করিয়াছিল,

যাহাকে সে এখনও তাহাদের সামাজিক-ধর্ম্ম-সঙ্গত উপায়ে সহজেই আয়ত্তের মধ্যে পাইতে পারে, অর্থাৎ ভগবানের নামে যাহাকে স্বচ্ছন্দে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই, তাহার প্রতি আবার চিত্ত আকৃষ্ট হয় কি-না পরীক্ষা করা আবশ্যক। যদি দৈবাৎ মনোবৃত্তির মধ্যে কিছু জটিলতা জোটে,—উত্তম! সাহসের সহিত সে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিবে। সমস্ত প্রলোভনের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া, অবহেলায় তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে! যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা ধীর ভাবে সযত্নে সাধন করিবে। জীবনে আত্মোন্নতি সাধনের পক্ষে যাহা প্রতিকূল, তাহা যত বড়—রমণীয়, কমনীয়, লোভনীয় রূপে সামনে আবির্ভূত হউক, জীবন-সমস্যা যতই জটিল করুক, উহা আত্মশক্তি বলে অতিক্রম করিতে হইবে! আত্মজয় করিতে হইবে।...না, বিবাহে তাহার প্রবৃত্তি নাই,—নাই।

স্থানান্তরিত হইবার আয়োজন উদ্যোগে মন ব্যস্ত থাকায় কয়দিন সুনিদ্রার অভাব ঘটিয়াছিল। পূর্ব্ব রাত্রে ট্রেণে সম্পূর্ণ অনিদ্রা গিয়াছে, আজও দুপুরে পরিপূর্ণ সুনিদ্রার অবকাশ পায় নাই! ক্লান্তি দুর্ব্বলতায় মস্তিষ্ক অস্বাচ্ছন্দ্য-পীড়িত বোধ হইতেছিল। তার উপব এই সব বিপ্লব-জনক উগ্র চিন্তার পীড়নে মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পাগড়ি খুলিয়া খানিক জল লইয়া মাথা ধুইল। প্লাটফরমের প্রান্তে ভিড়ের বাহিরে গিয়া খোলা হাওয়ায় পায়চারি করিতে করিতে ভাবিল,—ইঁহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া, নিজের কুটীরে ফিরিতে পাইলে হয়!—এক ঘুমে রাত্রি শেষ করিবে। আজ উত্তমরূপে খাইয়া ঘুমাইয়া স্নায়ু-গুলিকে সুস্থ সবল করা চাই। কাল হইতে আবার চাকরির খাটনি আছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল,—যদিও সে প্রয়োজনের খাতিরে আজ রোগীর শুশ্রূষায় রাত্রি জাগিবার প্রস্তাব ভুলিয়াছিল বটে, কিন্তু জাগিতে হইলে,

—হয় ত আজ এই ঘূর্ণ্যমান মস্তিষ্ক লইয়া ভালরূপে রোগীর তদারক করিতে পারিত না,—কাল পরের চাকরিও সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিতে পারিত না। নিজের ক্ষমতার পরিমাণ না ভাবিয়া, হঠকারীর মত সকল কাযে লাফাইয়া পড়া তাহার অভ্যাস।—ইহাতে সে কখনও ঠকে, কখনও জিতিয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা নিজের সামর্থ্যে নয়, নিতান্তই ভগবানের কৃপায়!

একটা লোহার বেঞ্চে বসিল। আলস্য ভাঙিয়া নিজ মনে হাসিল—বাস্তবিক, ভগবানের করুণায় কি আশ্চর্য্য উপায়ে যে বার বার দুঃসাহসিক কার্য্যে—আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে, সেটা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না! অকৃতজ্ঞ মূর্খ সে, তাই তার পরও নিজের সম্বন্ধে ওস্তাদি করিতে চায়!—আত্ম পরীক্ষার জন্য আগুন লইয়া খেলিতে চায়! ভাবিতে ভুলিয়া যায় যে, ইহাতে তাহার নিজের হাত পুড়িবার সম্ভাবনাও আছে, অপরের মুখ পুড়িবার আশঙ্কাও আছে।

কথাটা মনে উদয় হইবামাত্র খন্তর চমকিত হইল! ভীত হইয়া নম্র-চিত্তে বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিল—'ওগো শরণাগত দীনার্ত্তরক্ষক নারায়ণ, অহঙ্কারের দুর্জ্জয় মোহ হইতে তাহাকে রক্ষা কর। তাহার জীবনে যাহা কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন, হে মহামহিম পরীক্ষক,—তুমি ত স্বয়ং পরীক্ষা করিতেছ! তাহার জন্মজন্মান্তরের সব অপরাধের ঋণ,—বুক ভাঙা ব্যথার মূল্যে পরিশোধ করিয়া লইতেছ! দেখিও দয়াময়, সে যেন অপবিত্র বাসনার ক্রীতদাস হইয়া, আবার কিছু ভুল করিয়া না বসে!'

দূরে এক্সপ্রেসের তীব্রোজ্জ্বল সন্ধানী আলোকছটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, নিমেষের জন্য খন্তরের চক্ষু ধাঁধিয়া গেল! পর মুহূর্ত্তে ষ্টেশনের ব্যস্ত-চঞ্চল জনতার কোলাহলে, কুলিদের সোর গোলে চমক ভাঙিল! তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাগড়ি মাথায় বাঁধিল। প্লাটফরমের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল।

লোকজনের ভিড় ঠেলিয়া খন্তর সমস্ত গাড়ী খুঁজিতে খুঁজিতে চলিল। দূর হইতে দেখিল,—একটা ইণ্টার ক্লাসের কামরা হইতে একজন পনের ষোল বছরের বাঙালীর ছেলে নামিয়া,—মনোরমার মত একটি বিধবা ভদ্র মহিলার হাত ধরিয়া নামাইতেছে। খন্তর ছুটিয়া নিকটে গেল।—ভাল করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই যে দিদিমণি!—"

মনোরমা তাহার দিকে চাহিল। শুষ্ক মুখে বলিল, "কে? খন্তর?"

ছেলেটিও তাহার দিকে চাহিল।

খন্তর ত্রস্তে বলিল, "বাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন, আপনাদের নিয়ে যাবার জন্যে।"

ব্যাকুল আগ্রহে মনোরমা বলিল, "কাকাবাবু? কেমন আছেন তিনি?"

আশ্বাসভরা কণ্ঠে খন্তর বলিল, "ভাল আছেন, কোন ভয় নেই।"

একপাল যাত্রী সেই সময় ভিড় করিয়া কামরায় উঠিবার উপক্রম করিল। খন্তর ব্যস্ত হইয়া নিজের লাঠিটা ওয়েটিংরুমের দুয়ারের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ছেলেটিকে বলিল, "আপনি দিদিমণিকে নিয়ে ওখানে সরে দাঁড়ান। আমি মালপত্র নামাচ্ছি। এই কুলি—"

দুইজন কুলি ডাকিয়া লইয়া খন্তর ভিড় ঠেলিয়া কামরার ভিতর উঠিল।

সামনেই মনোরমার সঙ্গিনী—সেই দাই! একখানা গৈরিক বর্ণের খদ্দরের চাদর গায়ে জড়াইয়া জড় সড় হইয়া বেঞ্চির পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সদ্যঃ উঠা মাড়োয়ারী মেয়েদের কর্কশ কণ্ঠের হাঁক ডাক, গহনা ও জমকাল পরিচ্ছদ মোড়া বিপুল দেহের ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। হতবুদ্ধি বিহ্বলের মত চারিদিকে চাহিতেছে।

খন্তর চকিতে তাহার অবস্থা উপলব্ধি করিল। অসঙ্কোচে হাত বাড়াইয়া বলিল, "চলে এস।"

সে হাত ধরিল। খন্তর তাহাকে ভিড়ের ব্যূহ ভেদ করিয়া নিকটে টানিয়া বলিল, "কোন্ কোন্ মাল আমাদের, দেখিয়ে দাও।"

সামনের লটবহরগুলা দেখাইয়া দিয়া সে রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"এইগুলো।"

খন্তর অনুভব করিল—শুধু কণ্ঠস্বরে নয়, স্ত্রীলোকটির সারা দেহ কাঁপিতেছে! কুলিদের মালগুলা দেখাইয়া দিয়া, ভিড় ঠেলিয়া তাহাকে প্লাটফরমে নামাইল।—মনোরমাকে দেখাইয়া বলিল, "ওই দিদিমণি,—যাও।"

তার পর তাহার দিকে দ্বিতীয়বার দৃকপাত না করিয়া পুনরায় কামরায় উঠিয়া কুলিদের সঙ্গে মাল উদ্ধার করিতে লাগিল।

নির্দ্দেশিত মালগুলা নামান হইলে খন্তর চাহিয়া দেখিল—বাক্সের উপর একটা নূতন নামাবলীতে জড়ান ছোট পুঁটলি রহিয়াছে। জিনিসটা সদ্যঃ কাশী প্রত্যাগতা মনোরমার হওয়াই সম্ভব, বিবেচনা করিয়া তুলিয়া লইল।

মনোরমার নিকটে আসিয়া দেখিল সে মালগুলা গণিয়া লইতেছে। খন্তর হাতের পুঁটলিটা দেখাইয়া বলিল, "এটা বাক্সের উপর ছিল।"

মনোরমা দাইয়ের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "ওটা বাবুয়ার মা'র। ওতেই বিশ্বনাথের ফুল বেলপাতা আছে, নয়?"

বলিতে বলিতে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবুয়ার মার দিকে চাহিল। খন্তরও কোন কিছু না ভাবিয়া তাহার দিকে চাহিল, এবং মুহূর্ত্তে সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত উপলব্ধি করিল—এক বৎসর পূর্ব্বে যে বাবুয়ার মাকে দেখিয়াছিল, এ নারী ত সে নয়। ইহার বয়স যেন অনেক কম, আকার

প্রকার যেন আদ্যোপান্ত বিভিন্ন! এ যেন ভদ্র সমাজের অন্তর্গত, কোন প্রশান্ত-নম্র স্বভাব নারী!

খন্তর কোন দিন এত নিকট হইতে ইহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। সুতরাং ইহার কোথায় কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ঠিক বুঝিতে পারিল না।—কিন্তু তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না,—এ সেই নারী! মনে হইল—এ যেন তাহার অপেক্ষা অনেক সুশ্রী সুন্দরী;—এ যেন কোন সংসার-অনভিজ্ঞা সরলা কিশোরী মূর্ত্তি! মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সংযম পবিত্রতায় জ্যোতির্ম্ময়ী শ্রীমণ্ডিতা নারী!

খন্তরের অনিদ্রা-পীড়িত দৃষ্টি কি ভুল দেখিতেছে? সংশয় ভরে খন্তর সবিস্ময় কৌতূহলে তাহাকে বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল! এ কি উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকের মায়া?····· এ কি রজনীর রঙ্গময়ী কল্পনাকুহক ঘোর?

গৈরিক চাদরখানা সে মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া ঘোমটা টানিয়া গায়ে জড়াইয়াছিল। চাদরের ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছিল—তাহার রুক্ষ বিস্রস্ত কেশপাশ, কতক কাঁধে কত পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয় চুলগুলা জড়াইয়া ঝুঁটি বাঁধিয়াছিল, কোন এক সময় তাহা খুলিয়া গিয়াছে, টের পায় নাই। কয়েক গোছা চুল কপাল ঢাকিয়া চোখের উপর আসিয়া উঁকি ঝুঁকি দিতেছে। স্বাস্থ্যলাবণ্য-দীপ্ত সুগঠিত মুখ খানিতে সুনিয়ন্ত্রিত সদাচারী জীবনের প্রসন্ন পরিচয় দেদীপ্যমান। সরল শিশুর মত প্রশান্ত মুখে একটা রমণীয় নম্র কোমল ভাব বিরাজ করিতেছে!

অপরিসীম বিস্ময় খন্তরের চক্ষে যেন অপরূপ মায়ার অঞ্জন লেপিয়া দিল। মনের ভিতর আচম্বিতে এক অভিনব পুলকাবহ চাঞ্চল্য-স্রোত বহিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মস্তিষ্কের শক্তি-বলে সে যাহা কিছু বিচার বিবেচনা করিয়াছিল, এখন হৃদয়াবেগের খরস্রোতে তাহা কোথায় ভাসিয়া

গেল।···বিনা দ্বিধায় মনে মনে মানিয়া লইল,—এক বৎসর পূর্ব্বে যে পতি-পুত্র-শোকার্ত্তা বিশৃঙ্খল-চেতা বিষাদময়ী নারীকে দেখিয়াছিল, সে আজ মরিয়াছে! প্রশান্ত-চিত্তে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান-পরায়ণা, মনোরমা ঠাকুরাণীর পাশে এখন যে দাঁড়াইয়া আছে,—সে মনোরমা ঠাকুরাণীর চিত্তানুবর্ত্তন-কারিণী, এক নূতন মানুষ। মনোরমা ঠাকুরাণীর হৃদয়ের জীবন্ত প্রতিচ্ছায়া,—জীবনের অভিনব সংস্করণ!

আশ্চর্য্য সৎসঙ্গের প্রভাব! মানুষের এত পরিবর্ত্তন হয়?

খন্তর উত্তরোত্তর বিস্ময়ের সহিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিল।

মনোরমার প্রশ্নের উত্তরে বাবুয়ার মা আনত-গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল উহাতেই নির্ম্মাল্য আছে। সে ভুলবশতঃ উহা ফেলিয়া আসিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে সেটা লইবার জন্য নীরবে অঞ্জলি পাতিল।

খন্তর সন্ত্রস্ত ভাবে পুঁটুলিটা তাহার হাতে দিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। দেখিল মনোরমার সঙ্গী ছেলেটিকে ইহার মধ্যে গয়ালী পাণ্ডাদের অনুচরেরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তিনি কোথা হইতে আসিতে-ছেন, কোথা যাইবেন, তাঁহার গয়ার পাণ্ডা কে,···ইত্যাদি প্রশ্ন বিপুল বেগে বর্ষিত হইতেছে! ছেলেটি ব্যস্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

অন্য সময় হইলে খন্তর হয় ত ইহাদের ধমক দিয়া বিদায় করিত। কিন্তু আজ অকারণ খুশীতে মন এমন কৌতুক-চপল হইয়া উঠিয়াছিল যে বড়বাবুর অসুখের কথা ভুলিয়া,—অবস্থার গুরুত্ব ভুলিয়া, তাহাদের সঙ্গে বেশ একটু রসিকতা জুড়িয়া দিল। শিকার-সন্ধানী লোকগুলি অগত্যা রণে ভঙ্গ দিল।

মালপত্রসহ সকলকে বাহিরে আনিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইল।

গাঁড়োয়ান কি একটা কাযের জন্য নিকটস্থ দোকানে গিয়া একটু বিলম্ব করিতে লাগিল। মনোরমা গাড়ীর ভিতর হইতে খন্তরকে নিকটে ডাকিল। কাকাবাবুর অসুখ সম্বন্ধে খুঁটিয়া খুঁটিয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল।

খন্তর নিজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার বিবরণ সংক্ষেপে বলিল। সে মাত্র আজ গয়ায় আসিয়া পৌছিয়াছে শুনিয়া, মনোরমা তাহার ব্যক্তিগত সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে সুরু দিল। তাহার আর্থিক সংবাদ, পদোন্নতির সংবাদ শুনিয়া হর্ষ প্রকাশ করিল। মঙ্গল-কামনা জানাইল। জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে-থা করেছ ?"

নতশিরে খন্তর বলিল, "না, এখনো করিনি।"

তার পর কথাটা চাপা দিবার জন্য ব্যস্তভাবে গাড়োয়ানকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। কিন্তু গাড়োয়ান গাড়ীর বাতি কিনিতে অন্যত্র গিয়াছে শোনা গেল। গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিল।

মনোরমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া খন্তরের ভ্রাতৃ-পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সহসা অপ্রসন্ন ভাবে বলিল, "তোমার ভাইটি লোক ভাল। কিন্তু এখানকার জাত-ভাইগুলি ? এ কি জুলুম জবর-দস্তি রে বাপু ? আমাদের বাবুয়ার মা বিয়ে কর্‌তে চায় নি বলে, ওরা বলে কি-না বস্তিতে বাস কর্‌তে দেবে না।—কি ভয়ানক অন্যায় দেখ দেখি ?"

মনোরমার ভাসুর-পো হাসিয়া বলিল, "বলেন কি কাকিমা ? এদের সামাজিক প্রথা এই রকম না কি ? তা হলে ত মুস্কিল। দাইমা এখানে তা হলে থাক্‌বে কি করে ?"

মনোরমার পাশে উপবিষ্টা দাই, অন্ধকার গাড়ীর কোণে মুখ লুকাইয়া নিম্নস্বরে কি বলিল। ছেলেটি সহাস্যে বলিল, "সেই ভাল। কালই

আমার সঙ্গে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল। সেখানে ঠাক্‌মার কাছে রাত্রে থেক। কার সাধ্যি তোমাকে ভূতের ভয় দেখায়!”

মনোরমা গম্ভীর হইয়া বলিল “না, না খন্তর, তোমাদের পাড়ার লোক-গুলোকে বারণ করে দিও। বিয়ের জন্যে··· না · ও কি অন্যায় জুলুম! ওকে যেন কেউ কিছু না বলে। ও তো বাপু নিজের দুঃখে কষ্টে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়ে বেশ আছে। কারুর কোন অনিষ্ট ত করে নি।”

গাড়ীর পাদানের উপর একটা পা রাখিয়া, খন্তর নতমস্তকে নীরব রহিল। ইহার উত্তরে সে মনোরমাকে কি বুঝাইবে? কেমন করিয়া বলিবে অরক্ষিত অসহায় নারীর যৌবনই তাহার পরম অনিষ্টকারক শত্রু! ইহার মোহ ছলনায় শত দিক হইতে, শত রূপে তাহার মৃত্যুর ফাঁদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সে মৃত্যু হইতে অনভিজ্ঞা অল্পবুদ্ধি নারী আত্মরক্ষা করিতে জানে না। জানিলেও আত্মরক্ষার সামর্থ্য তাহার সব সময় থাকে না। তাহাদের সমাজের লোকেরা সুশিক্ষিত নয়, সুসংযত নয়। সেখানে অতি অসংযমী, অতি উচ্ছৃঙ্খলের সংখ্যা প্রচুর। অনেক দিনের অনেক অনাচার স্রোতের গতি লক্ষ্য করিয়া,—দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে··· এই পীড়াদায়ক কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। আর···আর, নারী-প্রকৃতি চঞ্চলা বলিয়া একটা দুর্নামও ত সংসারে আছে। · সামাজিক বিধান অকারণে সৃষ্ট হয় নাই।

কিন্তু মনোরমার মত ধর্ম্ম-নিষ্ঠা-শীলা, ভদ্রবংশীয়া, বালবিধবাকে এ সব কথা বলা চলে না। হয় ত এ সকল কথা ধারণা করিবার সামর্থ্যও তাহার নাই। ঈশ্বর করুন, তাহা নাই ই থাক। মানব-চরিত্রের অপবিত্র, কলুষিত, ঘৃণিত দুর্ব্বলতার দিকটায় অভিজ্ঞ হইবার প্রলোভন হইতে এই পবিত্র-সুন্দর-স্বভাব মেয়েটিকে ভগবান চিরদিন রক্ষা করুন।

মনোরমার কথাগুলার উত্তরে খন্তর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না।

দূরের দিকে চাহিল। নাঃ, গাড়োয়ানের দেখা নাই! উচ্চ কণ্ঠে তাহাকে ডাক দিল। অসহিষ্ণু ভাবে বলিল "আঃ, এইখানেই রাত দুটো বাজাবে না কি? কাল আবার আমার সকালেই ডিউটি, রান্না খাওয়া, পূজা-আর্চ্চায় গোল বাধাবে দেখ্‌ছি।"

মনোরমা বলিল "রাত হয়ে যাচ্ছে তোমার, তাই ত। এখান থেকেই তোমার ঘরে যাবে?"

"না। চল তোমাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাই। সেই জন্যে এসেছি।"

মনোরমা বলিল "বাসা হয়ে যাবে? তাহলে যাবার সময় বাবুয়ার মাকে সঙ্গে নিয়ে যেও। ওর বোনের বাড়ীতে ওকে পৌঁছে দিও।"

চম্‌কাইয়া খগেন বলিল "কাকে? কোথা?"

পার্শ্ববর্ত্তিনীকে দেখাইয়া মনোরমা বলিল "এই বাবুয়ার মাকে। শাঁখারীটোলার বাড়ী। তোমার বাড়ীর কাছেই ত?"

খগেন বিচলিত হইল। মনে মনে অতিশয় অস্বস্তি এবং নিরতিশয় আপত্তি বোধ করিল। কিন্তু সে আপত্তির কারণটা মনোরমার মত শুচিস্মিতা, পবিত্র-স্বভাবা ভদ্রকন্যার কাছে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া সে পুনরায় মাথা হেঁট করিল। অস্ফুট স্বরে কি যেন বলিল, বোঝা গেল না।

গাড়ীর নিকট হইতে সরিয়া গিয়া গাড়োয়ানকে পুনশ্চ একটা হাঁক দিল। গাড়োয়ান আসিতেছিল। খগেন চট করিয়া উঠিয়া কোচবাক্সের এক পাশে বসিল। গাড়োয়ান বাতিটা যথাস্থানে পরাইয়া, গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

খগেনের মনের ভিতর তীব্র আপত্তি ধ্বনিত হইতে লাগিল,—না, ইহা অনুচিত। একান্ত দুঃসহ ব্যাপার। এই গভীর রাত্রে, সুষুপ্ত নির্জ্জন

পল্লী-পথে—আর যে-কোন যুবতী নারীর রক্ষকরূপে তাহাকে সঙ্গে যাইতে হয় হউক, খন্তর প্রয়োজনের অনুরোধে শান্ত চিত্তে কর্ত্তব্য পালন করিবে। —কিন্তু ইহাকে সঙ্গে লইয়া নির্জ্জন পথে এত রাত্রে একা হাঁটিতে পারিবে না। নির্জ্জনতার সুযোগ অবিকৃত-চিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষেই ভাল। কিন্তু খন্তরের চিত্ত উহাতে চকিতে মোহাকৃষ্ট হইবার আশঙ্কা! পূর্ব্বের অভিজ্ঞতায় অনুতপ্ত হইয়া আছে, আর নয়!

সঙ্গে সঙ্গে মনটা সঙ্গোপনে বক্র কটাক্ষে অপর পক্ষের দিকে ইঙ্গিত করিয়া, তাহার মানসিক দুর্ব্বলতা ও ভাব-প্রবণতার কথা বিচার করিতে চাহিল। মুহূর্ত্তে খন্তরের বিবেক-বুদ্ধি এক ধমকে তাহাকে নিরস্ত করিল! পরস্ত্রী সম্বন্ধে তাহার অনধিকার-চর্চ্চায় আবশ্যক কি? রসাতলের পথ সুগম করিবার লোভ হইয়াছে?

হঠাৎ মনোরমার ছেলেমানুষির প্রতি গভীর অবজ্ঞার উদয় হইল! ছোট বেলায় উহাকে বুকে পিঠে লইয়া মানুষ করিয়াছে; আজও সে খন্তরের চক্ষে একটি ছোট্ট মেয়ে মাত্র আছে। মনে হইল,—ওই ক্ষুদ্র মেয়েটির যতই বুদ্ধি থাক, উহা নিতান্তই একদেশদর্শী! নিজেদের ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ গুটিকতক শিক্ষিত ভদ্র মানুষের মন বুদ্ধির চেহারা মাত্র ওই মেয়েটি চিনিয়া রাখিয়াছে। নিজের সেই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার মাপকাটি দিয়া মেয়েটি এ সংসারের সকলকে বিচার করিতে চায়? কি ভয়ানক ভুল!···এ সংসারে সব রকম স্বাধীনতা ভোগের অধিকার কি সকলের যোগ্যতায় সম্ভব? স্বাধীনতার অপব্যবহার যে অনেকেই করিতে চায়!··· ··

মনে পড়িল, আজ সকালে সে সুমারের নিকট কথা-প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা শুনিয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে, খন্তরের প্রস্থান উপলক্ষ্যে ওই নারী না-কি ব্যাকুল মনোবেদনা-পীড়িত হইয়াছিল।···সে না-কি

তখন অপর সকলের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া, খন্তরের পত্নীত্ব কামনা করিয়াছিল!...হয় ত তাহা সুমারের মিথ্যা কথা, পরিহাস, কিংবা অতি-রঞ্জন। যদি বা তাহা সত্য হয়,—আজ হয় ত উহার সে মনোভাব সৎসঙ্গ-মাহাত্ম্যে, ধর্ম্মোন্নতি সাধনের উচ্চ উদ্দেশ্যের দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন উহার সান্নিধ্য সন্তর্পণে এড়াইয়া চলা উভয়ের পক্ষেই ভাল। যে নিবৃত্তিমার্গে চলিতে চায়, খন্তর সসম্মানে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে সাহায্য করিবে।

নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে খন্তর মনঃস্থির করিয়া ফেলিল।

গাড়ী বাসার দুয়ারে পৌঁছিল। খন্তর কোন দিকে না চাহিয়া অতিশয় ব্যস্ততার সহিত কাদহাইয়াদাদের সাহায্যে মালপত্র নামাইয়া অন্তঃপুরে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল।

মনোরমা ও তাহার ভাসুর পুত্র গিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল। বাবুয়ার মা উঠানে দাঁড়াইয়া গৃহিণীর সঙ্গে নিম্নস্বরে কি কথা কহিতে লাগিল। গোলমালে খোকাবাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। গৃহিণী তাহাকে তুলিয়া আনিলেন। আলো তুলিয়া বাবুয়ার মার মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন "খোকা ভাখ্ কে এসেছে? ওটা কে বল্ দেখি?"

খোকা বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ক্ষণেক তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর সহর্ষে ঝাঁপাইয়া লাফাইয়া মহা লজ্জিত ভাবে মার কাঁধে মুখ লুকাইল। অর্থাৎ সে বাবুয়ার মাকে চিনিতে পারিয়াছে, একটুও ভোলে নাই!

খন্তর শেষ দফা মাল অন্তঃপুরে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। চকিত কটাক্ষে চাহিয়া সেই মধুর আনন্দময় দৃশ্য দেখিল। মন সহসা স্নিগ্ধ করুণায় ভরিয়া উঠিল। পাশ কাটাইয়া নতশিরে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল "মা, একবার আসুন।"

বাবুয়ার মার কোলে খোকাকে দিয়া গৃহিণী বাহিরের দুয়ারের কাছে আগাইয়া আসিলেন। খন্তর হেঁট হইয়া জুতা পরিতে পরিতে বলিল "আমি এবার বাড়ী যাচ্ছি মা। অনেক রাত্রি হয়েছে। দিদিমণি বলছিলেন আপনাদের দাইকে শনিচরের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে। কিন্তু অসুখের বাড়ীতে দু-একটা কাযের লোক থাকাই ত ভাল মা। ওকে নেই-বা রাত্রে যেতে দিলেন।"

গৃহিণী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন "থাকলে ত আমারই উপকার বাবা। ছেলেটা ওর ন্যাওটো, ওকে পেলে কারুর কাছে যেতে চায় না। ক'মাস বাবুয়ার মা চলে গিয়েছিল, দুরন্ত দামাল ছেলে নিয়ে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমরা ত ওকে রাত্রে এখানে থাকতে বলি।—কিন্তু এখানে ঘর-দোর কম, আর জাতভাইরা নিন্দে কর্‌বে বলেও বটে, ভয়ে বাবুয়ার মা থাক্‌তে চায় না।"

কানহাইয়ালাল নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। গঞ্জিকারক্ত চক্ষু তুলিয়া বলিল "কি হয়েছে?"

গৃহিণী অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন "এই বাবুয়ার মার বাড়ী যাওয়ার কথা হচ্ছে।"

কান্‌হাইয়ালাল খন্তরের মুখের দিকে একটা অর্থসূচক বঙ্কিম কটাক্ষ হানিয়া, পরম সহৃদয়তার সহিত মোলায়েম সুরে বলিল "তুই বুঝি সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছিস্? তা থাক্ থাক্। তুই-ই নিয়ে যা, আমার একটা কায আসান্ হোক্।"

খন্তরের মনের ভিতর একেই চাঞ্চল্যের বাতাস বহিতেছিল। তার উপর কান্‌হাইয়ালালের সেই অর্থসূচক কটাক্ষ ও দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক পরিহাসে চিত্ত জ্বলিয়া গেল। রুষ্টভাবে খুব সন্তর্পণে বলিল "আমি পার্‌ব না। তুমি পৌঁছে দিয়ে এস।"

কান্হাইয়ালাল মুচ্কি হাসিয়া গৃহিণীর কান বাঁচাইয়া নিম্নস্বরে মহাবিস্ময়ে বলিল "কেন, পার্বি না ? কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে না ত ? না—কি ? ভৌজির বহিন বলে কাঁধে করেই নিয়ে যাবি ?"

খন্তর একটু আশ্বাস পাইল। স্মরণ হইল ভৌজির বহিনকে উপলক্ষ্য করিয়া পরিহাস চলিতে পারে। সেটা সামাজিক প্রথামতে এমন কিছু দুষ্য ব্যাপার নয়। সুতরাং এবার রাগ করিল না, একটু হাসিল মাত্র।

গৃহিণী ততক্ষণে কান্হাইয়ালালের ভ্রম সংশোধনের জন্য বলিলেন "না, না—খন্তর ত নিয়ে যেতে চায় নি। অসুখের বাড়ী বলে বাবুয়ার মাকে রাত্রে এখানে থাকতেই বল্ছে। কি বাবুয়ার মা, আজ থাক্বে ?"

উঠানে—অদূরবর্ত্তিনী বাবুয়ার মার দিকে চাহিয়া গৃহিণী শেষ কথাটা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখা গেল, সে মাথায় কাপড় টানিয়া ঘাড় কাৎ করিয়া নীরবে সম্মতিজ্ঞাপন করিল। তারপর দ্রুতপদে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

কেন বলা শক্ত,—অকস্মাৎ ধাঁ করিয়া খন্তরের বুকে যেন একটা ঘা লাগিল! যাহার নিভৃত সঙ্গ এড়াইবার জন্য সে এতক্ষণ মনে মনে, প্রাণপণে যুঝিতেছিল, সেই নারী তাহাকে নিভৃত সঙ্গদানের সুযোগ দেওয়া দূরে থাক,—অবহেলায় তাহার প্রকাশ্য সঙ্গটুকু পর্য্যন্ত উপেক্ষাভরে এড়াইয়া, চোখের সামনে হইতে সরিয়া গেল! ইহার অর্থ ?

খন্তরের সযত্ন-রক্ষিত কি একটা মহামূল্য বস্তু যেন হঠাৎ হারাইয়া গেল,—মনটা এমনি উদ্ভ্রান্তবিহ্বল হইয়া পড়িল। জড়িতস্বরে বিদায় সম্ভাষণ করিয়া ত্রস্তে পথে নামিয়া পড়িল।

পিছন হইতে গৃহিণী ঠাকুরাণী বলিলেন "আবার এসো বাবা। আমাদের খোঁজ খবর নিও।"

অস্পষ্টস্বরে খন্তর কি যেন একটা কথা বলিল বোঝা গেল না। দেখিতে দেখিতে তাহার দীর্ঘ দেহ অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অন্তরের অন্তরালে যে গোপন আক্ষেপের আলোড়ন জাগিয়া উঠিল, অন্তর প্রাণপণ শক্তিতে সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মনের উপর আজ সুবিধা মত আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিল না। অপ্রতিভ হইয়া মনে মনে কাষ্ঠহাসি হাসিল। এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে একান্ত তুচ্ছ ভাবিয়া তাড়াতাড়ি মন হইতে বিদায় দিতে চাহিল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সব গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। মন উদ্দাম গতিতে দিগ্বিদিকে ছুটিয়া চলিল।

ঘরে আসিয়া দুয়ার খুলিল। আলো জ্বালিয়া বিছানা ঠিক করিয়া মশারী টাঙাইয়া শুইল। অভ্যস্ত সংস্কারবশে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। গভীর পরিশ্রম, ক্লান্তিতে শীঘ্রই তন্দ্রামগ্ন হইল, বেশ ঘুমাইল।

শেষ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনশ্চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিল,—কোলাহল-মুখর আলোকোজ্জ্বল ষ্টেশন এবং তাহার মাঝে—তীব্র-আকর্ষণী-শক্তি-বিশিষ্ট এক নারীমূর্ত্তি!

নিজের মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতায় নিরতিশয় বিরক্তি বোধ হইল। অন্ধকার থাকিতেই শয্যাত্যাগ করিল। বাহিরে আসিয়া ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে খানিক পায়চারি করিয়া—ভগবানের নাম করিল। নিজের চাকরির কথা ভাবিল, দৈনিক রন্ধন ভোজন হাটবাজারের কথা ভাবিল। মনে পড়িল সন্ধান লইয়াছে,—বিশুয়ার মা এখানে নাই,—কোথায় কুটুম-বাড়ী গিয়াছে। জল তোলা বাসন মাজার জন্য, ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিবার জন্য আজ একজন লোক ঠিক করা চাই। চাকরির খাটুনি

খাটিয়া আসিয়া,—এত কায করিবার আর সময় থাকে না। যদি বা গায়ের জোরে সময় করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু শেষে দেখা যায় বিশ্রামের অভাবে শরীর আর বহিতে চায় না। চাকরি বজায় রাখা দুঃসাধ্য!

আঃ, আজ যদি স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিত! কত সাহায্য হইত! সেই মানুষটার অভাবে চারিদিকে কি অসহ্য শূন্যতা!

ইচ্ছা করিয়াই সে স্ত্রীর সম্পর্কীয় স্বার্থহানির কথা ভুলিয়া থাকিতে চায়; বেশ জানে, ইহা না ভুলিলে, অন্য সব চিন্তা,—মায় ভগবৎ-চিন্তাও ভুলিয়া যাইবে! হে নারায়ণ, সে বিপদ হইতে রক্ষা কর।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া খন্তর ঘরে ঢুকিল। চাকরি স্থানে যাইবার জামা কাপড় ঠিক করিয়া রাখিল। তারপর একটা নিমকাঠি দাঁতে চাপিয়া ঘরের চাবি বন্ধ করিয়া বাহির হইল। দাঁত মাজার সঙ্গে,—মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে পল্লীপ্রান্তে ঠিকা-ঝি যাহারা বাস করিত, তাহাদের সন্ধানে চলিল।

ভোরের আকাশ সেইমাত্র পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর পথঘাটে সে আলো তখনও স্পষ্টরূপে আসিয়া পৌঁছে নাই। গাছপালা-গুলা কাল কাল ছায়ার মত দেখাইতেছে। সদ্যঃ-ঘুম-ভাঙা পাখীদের উৎসাহ-প্রমত্ত কণ্ঠের বিচিত্র কলধ্বনিতে আকাশ বাতাস সুমিষ্ট সুর-ঝঙ্কারপূর্ণ।

চলিতে চলিতে কখন যে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, মন ভগবচ্চিন্তার ফাঁক কাটাইয়া কোন মুহূর্ত্তে কোথায় উধাও হইয়াছে, খন্তর বুঝিতে পারে নাই!—শনিচরের কুটীরে যাইবার রাস্তার বাঁক ফিরিয়া হঠাৎ চমকাইয়া গেল!

সামনের পথ ধরিয়া বাবুয়ার মা একাকিনী আসিতেছিল। হাতে একটি ছোট পুঁটলি। বোধ হয় সে শনিচরের কুটীরে যাইতেছে। কপাল

পর্য্যন্ত ঘোমটা, গায়ে গৈরিক রঙের চাদরখানা জড়ানো। সেই সুনিদ্রা-তৃপ্ত, সদ্যঃ-সুপ্তোত্থিত, স্বাস্থ্য-প্রফুল্ল মুখখানি আজ খন্তরের চক্ষে অত্যন্ত স্নিগ্ধ-সুন্দর বোধ হইল!

নিজের অজ্ঞাতে স্থির নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। আত্মবিস্মৃতের মত বলিয়া উঠিল—"এই যে!"

অর্থাৎ—তাহার নিভৃত মর্ম্মকেন্দ্রে এতক্ষণ সঙ্গোপনে যাহার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ধ্যানলীলা চলিতেছিল, তাহাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে সামনে পাইয়া, মন তীক্ষ্ণ শিহরণে—বিপুল পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তারই স্থূল-প্রতিধ্বনি অসতর্কভাবে বিশ্বাসঘাতককণ্ঠে অতর্কিতে ব্যক্ত হইল!

নারী সসঙ্কোচে থমকিয়া দাঁড়াইল। নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

নিজের মনের অবস্থা লক্ষ্য করিবার শক্তি তখন খন্তরের ছিল না। কিন্তু কথাটা বলিয়াই কেমন একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি মুখ হইতে দাঁতন-কাঠি সরাইয়া—ত্রুটি সংশোধনচ্ছন্দে বলিল "বড়বাবু রাত্রে কেমন ছিলেন? ভাল ত?"

বাবুয়ার মা নিঃশব্দে মাথা হেলাইয়া 'হাঁ' জানাইয়া, শনিচরের কুটীর অভিমুখে যাইতে উদ্যত হইল।

খন্তরের মাথায় মুহূর্ত্তে যেন ভূত চাপিল! সে কি করিতেছে বুঝিতে পারিল না;—ত্রস্তে গিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল। সাগ্রহে বলিল "বাবা বিশ্বনাথের প্রসাদী ফুল বেলপাতা আমাকে দুটি দিও ত।"

পুনশ্চ নীরব মস্তকান্দোলন—'তথাস্তু।'

সহসা উত্তেজনা মিশ্রিত অনুনয়ের স্বরে খন্তর বলিল "দ্যাখো, এ রকম সময়-অসময়ে একাটি যাওয়া আসা কোর না। কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেও। পাড়ার চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলো কেমন পাজী, জানো ত?...ফের যদি ওরা কোন রকমে তোমায় ত্যক্ত করে,—আমায়...আমায় একটু খবর পাঠিও ত।"

বাবুয়ার মা এবার দৃষ্টি তুলিল। হতবুদ্ধির মত নির্ব্বাক্‌ভাবে খস্তরের মুখপানে চাহিল। স্পষ্ট বোধ হইল খস্তরের শেষ কথাটার অর্থ সে কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

সে দৃষ্টিতে খস্তর কেমন কুণ্ঠাত্রস্ত বিহ্বল বিপন্ন হইল।...মনে হইল অযাচিতভাবে স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে এতখানি মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ করা ভাল হয় নাই। সুমার হয় ত ঠিক বলিয়াছে,—সে বিষয়ে উহাদের কথা বলিতে যাওয়া,—উহাদেরই সামাজিক প্রথা-বিরুদ্ধ অনধিকার-চর্চ্চার ধৃষ্টতা মাত্র!...উহাদের সামাজিক সঙ্কীর্ণচিত্ততা বশে—সমাজে নারী বিষয়ক শিষ্টাচার যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাষায় অনুবাদ করিলে এই দাঁড়ায় যে, শুধু নিজের স্ত্রীটি নিরাপদে আরামে থাকিলেই হইল। তারপর যাহার স্ত্রী কন্যা ভগিনী যত বিপদে পড়ুক না,—তাহার জীবন বা সম্মান রক্ষার দায়িত্ব কেহ লইবে না। লওয়া না-কি উচিতও নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরোয়া ব্যাপারে স্ত্রীলোকগণ নিজের আত্মীয়-স্বজনের দ্বারাই লাঞ্ছিতা হয়।...তাছাড়া অসহায় দুর্ব্বল স্ত্রীলোককে ছলে বলে কৌশলে বিপদগ্রস্তা করাই ত সামাজিক পৌরুষের বিষয়! ইহা ত সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য কৌতুক!

শুধু ইহাদের দোষ নয়। পৃথিবীর সকল সমাজেই একশ্রেণীর হৃদয়হীন কাপুরুষ আছে, তাহারা এইরূপই ভাবিয়া থাকে।

কিন্তু এরূপ হীন-স্বার্থপরতা খস্তরের কাছে ঘৃণার বিষয়। ইহা সে সহ্য করিতে পারে না, পারে না!...

কিন্তু হায়! এতখানি টন্‌টনে কাণ্ডজ্ঞান সত্ত্বেও খস্তর স্পষ্ট অনুভব করিল,—তাহার মনের ভিতর রঙীন কল্পনার কুহকে—তীব্র উত্তেজক মাদকতা-ঘোর নিমেষে-নিমেষে গাঢ়তররূপে জমিয়া উঠিতেছে! যৌবনের মূঢ়-কামনা-সঞ্জাত নেশার খেয়ালে চিত্তবৃত্তিগুলা আজ যেন হঠাৎ মাতাল

হইয়া পড়িয়াছে !···মত্ত মন কাহাকে যেন তাহার মাৎলামির গান শুনাইবার জন্য আজ উতলা আকুল হইয়া উঠিয়াছে !···

কিন্তু···না না, ইহা সে পারিবে না। এত বড় ভয়াবহ অভিশপ্ত ভাষা তাহার রসনায় উচ্চারিত হইতে পারে না।

খন্তর সজোরে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধরিল। রুদ্ধ উত্তেজনায় উদ্বেলিত বক্ষে,—এক অদ্ভুত ব্যাকুলতাভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখবর্ত্তিনী নারীর দিকে চাহিয়া রহিল।

চকিতে লক্ষ্য করিল,—তাহার দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া নারী ভীত সঙ্কুচিত-ভাবে মাথায় কাপড় টানিয়া দৃষ্টি ফিরাইল।

খন্তর সন্ত্রস্ত হইয়া চক্ষু নামাইল।

কিন্তু ওঃ! হৃদয়ের দুর্ম্মদ আবেগভারে বক্ষঃপঞ্জর কি চুরমার্ হইয়া যাইবে?···উচ্ছল প্রাণের রঙীন রসাবেশ-কুহকে সে এক নিমেষে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িল? তাহার চিরজীবনের যত্ন-মার্জ্জিত, শান্ত-চেতনা যে···গভীর দৌর্ব্বল্যে···মূঢ় অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে!···

এ সময়? · না আর এক মুহূর্ত্তও এই নির্জ্জন পথে ইহার সান্নিধ্যে অবস্থান করা উচিত নয়। এখনই স্থান ত্যাগ কর্ত্তব্য।···

বিবেক-বুদ্ধি লাফাইয়া উঠিয়া উন্মাদ মনের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। খন্তর তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজের গন্তব্য পথে পা বাড়াইল।

কিন্তু দুই পা গিয়া সে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। উন্মনাভাবে বলিল "হাঁ, কি বলছিলুম?—আর একটা কথা—"

খন্তর আবার তাহার দিকে অগ্রসর হইল। শুষ্ক কণ্ঠে বলিল "তুমি কি এখন এখানে থাকবে?"

"কোথা?"—নারী বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে প্রশ্ন করিল, "কোথায় থাকব?"

খন্তর আবার বিপন্ন হইল। স্খলিত কণ্ঠে বলিল "এই এখানে, দেশে। গয়ায়।"

নারী নতমুখে মাথা নাড়িল—"না।" অস্ফুট স্বরে বলিল "বাবুজী ভাল হলে আমি দিদিমণির সঙ্গে চলে যাব আবার।"

খন্তরের বুকে যেন কে ধাক্কা মারিল। আহত স্বরে বলিল "কেন? এখানে থাক্‌লেই ত ভাল হোত। নিজের জাতভাইদের ছেড়ে পরদেশে পরবাসে···কেন? এখনও ছেলেমানুষ তুমি···"

তারপর শিষ্ট ভাষায় তাহার সম্মান রক্ষা করিয়া কোন বিপদাশঙ্কার ইঙ্গিত করিবে,—ভাবিয়া পাইল না। সহসা চুপ করিল।

সুষুপ্ত পল্লীর দিকে বারেক চাহিয়া নারী ম্লানমুখে বলিল "কি করব? এরা এখানে থাক্‌তে দেবে না।"

ক্ষণিকের জন্য উভয়ের স্তব্ধ।

প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া—শুষ্ককণ্ঠে কাশিয়া, খন্তর সহজ ভাবে বলিল "তা ওরা যা চায়, তাতেই রাজী হও না। দেখে শুনে পছন্দ মত কাউকে সাগাই কর না। তোমার মত ছেলে মানুষদের পক্ষে—"

আর বলিতে পারিল না। কণ্ঠ শুকাইয়া গেল,—সে আবার কাশিতে লাগিল।

মুখে কথাটা যথাসাধ্য সহজভাবে বলিল। কিন্তু এক অজ্ঞাত আতঙ্কে হৃদ্‌পিণ্ড তখন সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল! মনে হইল সে আগুনের গোলা লইয়া লোফালুফি করিতেছে! এখনই বিষম দুর্ঘটনার আশঙ্কা!···

আহত মৃগীর ন্যায় আর্ত্ত দৃষ্টি তুলিয়া নারী তাহার পানে চাহিল। গভীর মর্ম্মস্পর্শী সে দৃষ্টি! চকিতে নয়ন-কোণে যেন তিরস্কার-বর্ষী, তীব্র অভিমানের বিদ্যুৎ ঝল্‌সাইয়া গেল! কিন্তু সে মাত্র পলকের জন্য। পরক্ষণে সে দৃষ্টি নামাইয়া সজোরে মাথা নাড়িল—'না।'

তারপর খন্তরকে দ্বিরুক্তি করিবার অবকাশ না দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

প্রথম মুহূর্তে খন্তরের মনে হইল—বুকের উপর হইতে জগদ্দল পাথর নামিয়া গেল! সে বাঁচিল! সুনার মিথ্যাবাদী!...মিথ্যা মায়ার পিছনে আর ছুটিতে হইবে না! উহার প্রত্যাখ্যানে সে সব দায়িত্ব-অভিমান হইতে মুক্তিলাভ করিল! খুব বাঁচিয়া গেল! যে ব্যাপারের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই, এবার তার সম্পর্ক ছাড়াই ভাল!

মুখ ফিরাইয়া নিজের গন্তব্য পথে চলিল।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তে এ কি? মনের ভিতর এ কিসের কোলাহল? এক-দল ক্ষুধার্ত্ত দানব সেখানে নিষ্ফল ক্ষোভে গর্জ্জন করিতেছে যে! উহাদের এত আক্রোশ কেন?

খন্তর তাহাদের দিকে চাহিল; চিনিল—উহারা তাহার পরিচিত নিমন্ত্রিত কুবাসনার দল!—বহুপূর্ব্বে উহাদের গলাধাক্কা দিয়া মনের দুয়ার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল।—তাহা দেওয়াই উচিত ছিল।...তারপর? তারপর সেই রজোগুণজাত—অত্যুগ্র,—দুষ্পূরণীয় রিপুর—মোক্ষমার্গের মহাশত্রুর কুহকময়ী কটাক্ষে ভুলিয়া গিয়াছে। মনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, আদর করিয়া উহাদের পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া পরম যত্নে অন্তরের অন্তঃস্থলে গোপনে আসন দিয়াছে। এখন উহারা ক্ষুধার খাদ্য না পাইলে খন্তরকেই ছিঁড়িয়া খাইতে চাহিবে বই কি! ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম!

হউক শান্তি!—ইহাই চাই!

অন্তর্বিপ্লবে আক্রান্ত—নিষ্পীড়িত হৃদয়ের দিকে চাহিয়া খন্তর একটা হিংস্র-আনন্দ বোধ করিল।

মনে পড়িল মনোরমার আদেশ। ওই নারীকে পুনরায় বিবাহের জন্ম উত্ত্যক্ত করিয়া পাড়ার লোকে যেন কষ্ট না দেয়, সে বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার ভার খন্তরের উপর তিনি বিশ্বাস করিয়া দিয়াছেন। রাত্রি প্রভাত না হইতে খন্তর নিজেই ইতর তস্করের মত সেই দুষ্কার্য্য সাধন করিল! বিশ্বাসের সম্মান রাখিবার কথাটা আদৌ মনে পড়িল না! মনের ক্ষণস্থায়ী লুব্ধতার নিকট নৈতিক বুদ্ধির এমন শোচনীয় পরাজয় ঘটিল!

গভীর আত্মগ্লানি বোধ হইল। নিজেকে সহস্র ধিক্কারে লাঞ্ছিত করিল। চণ্ডাল,—মহা চণ্ডাল সে!

অপমান-ক্ষুব্ধ নৈতিক চেতনা আবার হুহুঙ্কারে জাগিয়া উঠিল। উগ্র কঠোর ভাবে সমস্ত চিত্ত ভরিয়া উঠিল।—হাঁ, ওই দুর্ম্মতি দুর্ব্বুদ্ধি-গুলাকে সে গলা টিপিয়া সংহার করিবে। বৈধ ভোগ অদৃষ্টে জুটে নাই বলিয়া— অবৈধ উপভোগ-তৃষ্ণার ক্রীতদাস হইবে? সেরূপ ঘৃণিত কামনা নিষ্ঠুর বিক্রমে হত্যা করাই উচিত। নচেৎ মনুষ্যত্বে ধিক্।

সহসা মনে হইল লোভ জয় করা এমন কি কঠিন কথা? রুগ্ন, পঙ্গু, দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ,—বাসনা-বিকার-ঘোরে, অসুস্থ কল্পনার ক্রীতদাস হইয়া পড়ে। দেহেন্দ্রিয়গত দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার প্রভাবের কথা, সুমধুর রসসিক্ত ভাষায় ইনাইয়া-বিনাইয়া বলিয়া থাকে, উহা না-কি সর্ব্বজয়ী!— কিন্তু ইহা অমোঘ সত্য যে, এ দুর্ব্বলতার নিকট মানুষ নিজের ইচ্ছাবশেই বদ্ধ!

হাঁ দুর্ব্বলতার কুহক মন্ত্রে আত্ম-সম্মোহন করিয়া, নিজের মূঢ় ইচ্ছাবশেই মানুষ জড়ত্বে আবদ্ধ হয়। আবার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগেই সে, সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়।

চাই কঠোর চিত্তবল। চিত্তকে সুশাসিত করিবার—সুগঠিত

করিবার ক্ষমতা নিজের হাতে রাখা চাই। অন্তরকে সর্ব্বদা সত্যনিষ্ঠ, পবিত্র ভাবপূর্ণ রাখিয়া চলিলে, পৃথিবীর সব প্রলোভন মানুষের কাছে তুচ্ছ —কৌতুকাবহ ব্যাপার হইয়া পড়ে।

একদেশদর্শী কতকগুলি দুর্ব্বলচেতা মানুষ বলিয়া থাকেন,—নৈতিক বুদ্ধির উগ্র শাসন মানুষের জীবনে অনেক বিপদকে ডাকিয়া আনে। কথাটা অসত্য নয়। কিন্তু সে বিপদে পশুপর্য্যায়ভুক্ত, দুর্ব্বলচেতা অমানুষেই অভিভূত হয়! পশুত্বের গণ্ডি কাটিয়া মন যখন উন্নততর অবস্থায় উপনীত হয়,—মানুষ তখন নিজের মনুষ্যত্ব-বলে সে বিপদ অবহেলায় জয় করে। ওই একদেশদর্শী বিজ্ঞের দল, নিজেদের সুবিধার অনুকূল যুক্তি যতই প্রয়োগ করুন, ইহা প্রকাণ্ড সত্য যে—নৈতিক বুদ্ধির শাসনকে ছলে, বলে, কৌশলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া দুর্নীতির দাসত্বে একান্ত-ভাবে আত্ম-সমর্পণ করিলে,—মানব-সভ্যতার প্রাণ-শক্তির বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক বিপদকে ডাকিয়া আনা হয়!

যদি প্রশ্ন উঠে, তাহাতে ক্ষতি কি? উত্তর—ক্ষতি অনেক! দুর্নীতি-পরায়ণ মানুষ, যত সুগভীর বিজ্ঞতার ভান করুন,—যতই রসগর্ভ বচন-বিন্যাস-কৌশলে দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করুন,—ইহা ধ্রুব সত্য যে, দুর্নীতির দাসত্বে আত্ম-সমর্পণের ফলে, মানুষের আত্ম-সম্ভ্রম, আত্ম-সংযম, আত্ম-জ্ঞান লোপ পায়! মানুষ তখন নিতান্তই শৃগাল-কুক্কুরের পর্য্যায়-ভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়!

উগ্র চিন্তায় খন্তরের মস্তিষ্ক যখন নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, চরণ-গতি যখন একান্ত দ্রুত অধীর,—তখন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত নারী-কণ্ঠের আহ্বান কাণে পৌঁছিল—"কে, মিস্ত্রী-জি?"

"হাঁ, কেন?" অস্বাভাবিক চড়া গলায় উত্তর দিয়া খন্তর দাঁড়াইল। পরক্ষণে নিজের কণ্ঠস্বরে লজ্জাবোধ করিল। তাহার মনের

উগ্র তাপ যে কণ্ঠস্বরেও ফুটিয়া বাহির হইতেছে! এই কি সংযম-সাধনা?

সামনের পথ ধরিয়া, টিপ, কাজলপরা সালঙ্কারা সসজ্জা যুবতী বোনঝিকে সঙ্গে লইয়া, বৃদ্ধা গয়লা-বুড়ী আসিতেছিল। ইহারা বস্তির প্রান্তে বাস করে। গয়লা-বুড়ী দুধ বেচিয়া দিন চালায়। এই বোনঝি ও একটি কিশোরবয়স্ক বোনপো ছাড়া সংসারে তাহার কেহ নাই। বোনঝির স্বামীটা বিবাহের পরই একদা কোথায় চুরি করিয়া বছর দুই জেল খাটিয়াছিল। তারপর কোথা হইতে একটা স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া নিরুদ্দেশের পথে উধাও হইয়াছে। বোনঝি ঠিকা-ঝি খাটে, গম পেষে, মাসির সঙ্গে দুধের যোগান দেয়,—এবং টিপ কাজল গহনা-কাপড়ে সাজ-গোজ করিয়া পাড়ার অসচ্চরিত্র ছেলেদের সরস রসালাপে মুগ্ধ করিয়া বেড়ায়। বলা বাহুল্য তাহার চরিত্রের শিথিলতার জন্য দুর্নাম ছিল।

ধন্তর তাহাদের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল। পথের পাশে থুতু ফেলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া, একান্ত মনে দাঁত মাজিতে মাজিতে সহজ কণ্ঠে বলিল "কি বল্‌ছ মাসি?"

বৃদ্ধা নরম সুরে বলিল "এত ভোরে তাড়াতাড়ি এদিকে কোথা যাচ্ছ বাব?"

আকাশ তখন অনেকটা ফর্সা হইয়াছিল। ধন্তর চারিদিকে চাহিয়া বলিল "ভোর আর এত কই? স্নান করে আহ্নিক পূজায় বস্‌তে হবে, তাই তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। হাঁ ভাল কথা, তুমি ত ঠিকে কাযের লোকজনের সন্ধান রাখ। বিশুয়ার মার মত আমি একটি লোক ঠিক করে দিতে পার?"

বৃদ্ধা বলিল "কত, কত! কবে থেকে চাই?"

ধন্তর বলিল "আজ থেকে, এখনই। বেলা ন'টার মধ্যে আমায় রেঁধে

খেয়ে ডিউটিতে বেরুতে হবে। ঘর-দোর মুক্ত করা, বাসন মাজা, জলতোলা, সব কাযই গুছিয়ে দিতে হবে। আছে কেউ তেমন?”

বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ বলিল “তাহলে আমার এই বোনঝিকে নিয়ে যাও। কিছু বল্‌তে হবে না। ও সব গুছিয়ে ঠিক করে দেবে।”

খন্তর স্তব্ধ হইল।

১৩

মুহূর্ত্তে নিমকাঠির তিক্ত রসটা বোধ হয় খন্তরকে অতিরিক্ত তিক্ত লাগিল। মুখ ফিরাইয়া প্রবল বমনোদ্বেগ সহ বার বার থুতু ফেলিল। খাঁকার দিয়া কণ্ঠনালির শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন চাঁচিয়া, শ্লেষ্মা দূর করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা ততক্ষণে পুনশ্চ নিবেদন করিল “ওর হাতে-পায়ে কায লাগে না। শক্ত মানুষ, এক লহমায় সব গোছ করে দেবে। চাই-কি—রান্নাটাও পার্‌বে। বুঝ্‌লি গো, মিস্ত্রীজী একা মানুষ, কতই-বা রান্না? ওটাও করে দিয়ে আসিস।”

উল্লেখ করা বাহুল্য, শেষের কথাটা বোনঝির উদ্দেশে বলিল।

আলস্য, আরাম ও সেবাপ্রিয় মানুষদের পক্ষে ইহা লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু খন্তর আলস্যপ্রিয় নয়। আত্মনির্ভরশীলতায় সু-অভ্যস্ত। সুতরাং এত বড় লোভটা অবহেলায় উপেক্ষা করিয়া, মাথা নাড়িল। নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া সজোরে দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিল “বাড়ীতে মেয়েছেলে কেউ নেই। এই ছেলেমানুষ-বেচারা সেখানে একা কায করতে পারবে না। অন্য কাউকে ঠিক করে দাও।”

বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের আস্ফালন ভুলিয়া গেল। ভিন্ন সুরে বলিল "এখুনি অন্য লোক পাচ্ছি কোথা বাপু? এ ঘরের লোক। বিশ্বাসী মানুষ। একে নিলে তোমার—"

খন্তর সবিনয়ে বলিল "বুঝেছি মায়ি। কিন্তু···আমার অবস্থা ত জান? ঘরে কেউ নেই। অন্য লোকের সন্ধান কর। আমিও দু'-চার জনকে বলেছি। দেখি, যেখানে হোক, জুটে যাবে।"

বলিয়া শশব্যস্তে পুনরায় চলিল।

বোন-ঝি আড়চোখে খন্তরের দিকে চাহিল। কি-যেন ভাবিল। নিম্নস্বরে মাসিকে কি বলিল। মাসি ত্রস্তে বলিল "অ-মিস্ত্রীজী শোন। আমার বোনপো মন্নুয়া ডাগর হয়েছে, তাকে নাও না।"

খন্তর দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "মন্নুয়া? কত বড় হোল সে? অনেক দিন দেখি নি। জল তোলা, বাসন মাজা, এ-সব পারবে?"

বৃদ্ধা নরম সুরে বলিল "দুদিন দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে। ছেলেবুদ্ধি ত ঘোচে নি, পথে পথে খেলিয়ে বেড়ানোর দিকেই তার মন। দিনকতক চোখে চোখে রেখ, ধমক-চমক দিও, শাসন কোর, তা হলেই—"

বলিতে বলিতে নিকটে গেল।

খন্তর ম্লান হাসি হাসিল। হায়, আজ তাহার উচ্ছৃঙ্খল মনকে কে কঠোর শাসনে সংশোধনের পথে আনে, তাই সে খুঁজিতেছে,—আবার অন্য এক চপল-চেতা বালকের ক্রীড়ামত্ত মনকে সংযম শিক্ষা দিবার দায়িত্ব-ভার লইবে?

মাথা নাড়িল। লজ্জিত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল "আমি নিজের ধান্ধায় ভয়ানক ব্যস্ত। ছোট ছেলেকে কায শেখানো—বড় ঝঞ্ঝাট। ঘরের কাযে সময় পোষাবে না। বরঞ্চ দিও—রেলে ঢুকিয়ে দেব। বেলা বাড়ছে, আসি।"

আবার দ্রুত চলিল। বৃদ্ধা পিছনে যাইতে যাইতে কৃতজ্ঞ-গদগদ্ কণ্ঠে বলিল "তাই দেব বাছা। তুমি বড় ভাল ছেলে। তোমার জিম্মায় ছোঁড়াটা থাকলে—দোহাই ধর্ম্ম বল্‌ছি বাবা, খোসামোদ নয়—আমি নিশ্চিন্ত হই। ছাখো বাছা, সৎসঙ্গ বড় জিনিস। আর কিছু না-হোক্ দুটো ধম্মো কথাও ত শুন্‌তে পাবে! খানিকটা সৎশিক্ষেও ত হবে!"

খন্তর বেদনাভরে মনে মনে হাসিল! মানুষের লৌকিক বিচারবুদ্ধি কি স্থূল! যে নিজের অন্তরের সততা বাঁচাইবার জন্য আজ বিপন্ন বিব্রত, তাহার বাহিরের দিকটায় কি দেখিয়া সদাচারী ঠাহরাইয়াছে, ইহারাই জানে; এবং সেই জানাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহার কাছে সৎশিক্ষা পাইবার আশা করে!

বাদ-প্রতিবাদের সময় ছিল না। ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া দ্রুত চলিতে চলিতে বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিল "সময় মত তাকে আমার কাছে এনো।"

পনের মিনিটের মধ্যে এক স্বজাতীয় দরিদ্র বৃদ্ধকে কাযের জন্য খন্তর ঠিক করিল। বৃদ্ধকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া স্নান পূজা সারিয়া তাড়াতাড়ি রাঁধিয়া খাইয়া কর্ম্মস্থানে গেল।

সহকর্ম্মীরা প্রায় সকলেই পরিচিত। সংক্ষেপে কুশল প্রশ্ন বিনিময় হইল। খন্তর প্রচণ্ড আগ্রহে কর্ত্তব্য পালনে মন প্রাণ ঢালিয়া দিল। কিছুক্ষণের জন্য সে নিজের সব কিছু দুঃখ দুশ্চিন্তা ভুলিয়া গেল।

কিন্তু কঠিন কাযগুলা যতই শেষ হইতে লাগিল, ছুটির সময় যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, খন্তর ততই যেন বিমর্ষ—অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল। সেই সময় এক অঘটন ঘটিল। একটা গুরুভার লোহার যন্ত্র সরাইতে গিয়া দুই জন কুলি অসাবধানে এমন ভাবে তাহা ফেলিয়া দিল যে, আর দুই জন কুলি অল্পের জন্য ভাগ্যে ভাগ্যে বাঁচিয়া গেল! আর একটু হইলেই তাহাদের মাথা ফাটিত।

ব্যাপারটা চোখে ঠেকিবামাত্র হঠাৎ খন্তর এমন ভয়ানক রাগিয়া উঠিল যে অধস্তন কুলিরা ত দূরের কথা,—উপরওলা পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। খন্তরকে সবাই চিনিতেন। এর চেয়ে কত গুরুতর ব্যাপার কতবার ঘটিয়াছে, কেউ কখনও খন্তরকে এত বিচলিত হইতে দেখে নাই। আজ তুচ্ছ কারণে এত রাগ? খন্তরের পরিবর্ত্তন দেখিয়া সবাই আশ্চর্য্য হইল!

অল্পক্ষণে খন্তরের ক্রোধ শান্ত হইল। তাহার দুর্ব্বলতার কথা উল্লেখ করিয়া সহকর্ম্মীরা পরিহাস করিল, খন্তর বিমর্ষভাবে হাসিল। বুঝিল, আসলে নিজের আভ্যন্তরিক মূঢ়তার উপর যে রাগটা জমা হইয়াছিল,—অপরের মূঢ়তা ত্রুটি উপলক্ষ্য করিয়া তাহা সশব্দে বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে মাত্র!

ধিক্কার বোধ হইল। আত্ম-সম্বরণ ক্ষমতা দিনে দিনে লোপ পাইতেছে,—মহা অধঃপতন!

তিরস্কৃত কুলি দুটার পিঠ চাপড়াইয়া অনুতপ্ত খন্তর বলিল "কিছু মনে করিস নি বাবা, যদি আমার মাথাটা গুঁড়ো কর্‌তিস্, তাহলে রাগতুম না,—এটা বেওয়ারিশ মাল। কিন্তু ও হতভাগা দুটো যদি দৈবাৎ খুন হোত, তাহলে ওদের মা, বোন, স্ত্রী-পুত্রের দুর্দ্দশা কি হোত, ভাব দেখি?"

ভাবার প্রয়োজন ছিল না, উহা সহজানুমেয়! কিন্তু খন্তরের মাথাটা যত বড়ই বেওয়ারিশ বস্তু হউক, গুঁড়া হইবার পর সে মস্তিষ্কে রাগ করিবার মত অনুভূতি সজাগ থাকিবে এটা বড় মজার কথা! সহকর্ম্মীরা বিদ্রূপ করিয়া বলিল "বিয়ে কর মিস্ত্রীজি, বেওয়ারিশ মাথা নিয়ে বিব্রত হয়েছ!"

সঙ্গে সঙ্গে অনেকে অনেক কথা বলিল। স্ত্রী জীবিতা থাকিলে

তাহাকে খাতির করিয়া পুনরায় বিবাহ না করাই ত অর্থ-নৈতিক সুবিধা এবং পারিবারিক শান্তির পক্ষে ভাল। কিন্তু যে স্ত্রী গতাসু, তাহার স্মৃতির স্বপ্নে বিভোর হইয়া নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথা বহন করা যে বুদ্ধিমানের কায নয়—সেটা অনেকেই অনেক রকমে বুঝাইল।

খন্তর বুঝিল সব। ইহাদের ভুল ধারণা ভাঙিয়া দিয়া তাহার বলিতে ইচ্ছা হইল, যাহার স্মৃতির স্বপ্নে বিভোর হইয়া নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথা বহন করায় গৌরব বোধ করিতাম, আজ সে বোধশক্তি লোপ পাইয়াছে বন্ধু! এখন অবশিষ্ট আছে মাত্র সে গৌরবের প্রচ্ছন্ন মোহ অভিমান! তোমাদের পরিতাপ বৃথা,—পরিবর্ত্তনশীল জগৎটায় ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! অন্তর্নিহিত কামনার আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য খন্তর আজ নিজেই ব্যাকুল!

কিন্তু এ কথা লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি ছিল না। বোধ হয় সাহসও ছিল না। বিশেষতঃ যাহাকে এখন আর বিবাহ করিতে পারিবে না, অথচ যাহাকে বিবাহ করিবার জন্য একদিন অনেকেই সাধিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে আজ হঠাৎ খন্তরের মনে অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটিয়াছে, ইহা শুনিলে লোকগুলা হাসিবে ত? নাঃ, সে অসহ্য!

খন্তর অতিশয় গম্ভীরভাবে প্রস্থান করিল।

শরীর অবসাদ-শ্রান্ত, মন বিক্ষিপ্ত. অশান্তি-পীড়িত—সমস্ত পৃথিবীটা যখন একান্ত বিস্বাদতিক্ত বোধ হইতেছে, তখনও কর্ত্তব্যপ্রিয় খন্তর অভ্যাসবশে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে, ঘরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে শেষ করা উচিত,—এমন কোন কায আজ বাকী রহিল কি?

মনে হইল দুটা মাত্র কায বাকী আছে। এক—দোকান হইতে রাত্রের খাবারটা কিনিয়া আনা। দুই—বড়বাবু এবেলা কেমন রহিলেন, গিয়া একবার দেখিয়া আসা।

শেষের কথা মনে পড়িতেই—চকিতে স্মৃতিপটে কাহার চিত্র ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে অনুভব করিল—মধুর উন্মাদনাভরা এক অলক্ষিত আকর্ষণ!

সন্ত্রস্ত হইয়া আত্ম সম্বরণ করিল। নিজের উপর অত্যন্ত চটিল।··· চুলায় যাক, বড়বাবুকে দেখিবার লোক এবার সেখানে যথেষ্ট জুটিয়াছে। লৌকিকতা বজায় রাখিবার জন্য—নাঃ! আর যাইবে না।

সটান বস্তির দিকে চলিল। খানিক গিয়া মনে পড়িল—মাইজীর অনুরোধ! হোক লৌকিকতা, তবু খোঁজ লওয়া উচিত! আহা রোগার্ত্ত বিপন্ন,—নারায়ণের জীব সব!

ফিরিয়া বড়বাবুর বাড়ী চলিল।

বাহিরে কানহাইয়ালাল ছিল। শুনিল ডাক্তার ভিতরে গিয়াছেন।

সাড়া দিয়া কাহাকেও সতর্ক করিবার প্রয়োজন রহিল না। সোজা গিয়া রোগীর ঘরের দুয়ারে পৌছিল। হঠাৎ পাশের ঘরে অপরিচিত নারী-কণ্ঠে অনুনয়ের সুর শোনা গেল "হে—বাবুয়া, হে,—ইধার আও।"

তুচ্ছ কথা! কিন্তু অন্যমনা খন্তরের আপাদ-মস্তকের শোণিত-স্রোতে শোনামাত্র চমক লাগিল!—শিরায় শিরায় অপরূপ উন্মাদনার ঝঙ্কার খেলিয়া গেল! কাহার—কাহার এ কণ্ঠস্বর গো?

দেহের বিদ্রোহী পরমাণুপুঞ্জ গর্জ্জিয়া জবাব দিল "চিনিয়াছি। গুপ্ত দুর্ব্বলতা অস্বীকার করিব কেন?"···

ধিক! জড়ত্বের আকর্ষণে! নিপাত যাক এই জড় ভাবাচ্ছন্ন দেহ মন!

না, না,—মোহান্ধ, বর্ব্বরতার পায়ে আত্ম-বিক্রয় করা চলিবে না। অতীত জীবনের অঙ্কে ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্য পালনের স্মৃতি যাহা আছে তাই শুধু চিত্তে জাগিয়া থাক, বাকী সব ভুলিয়া যাওয়া চাই।

বিস্তর এলোমেলো চিন্তা মনে জাগিল। বিপরীত ভাব-দ্বন্দ্বে মস্তিষ্ক অবসাদ-ক্লান্ত বোধ হইল।

আত্মদমন করিয়া ঘরে ঢুকিল। সেখানে যে দৃশ্য চোখে ঠেকিল—হঠাৎ মন অসহিষ্ণুতায় উত্তপ্ত হইল!

বড়বাবু আজ অনেক সুস্থ। মনোরমা পাশে বসিয়া থার্ম্মমেটার দিতেছে,—সেই চির-পরিচিত প্রশান্ত প্রফুল্ল আনন্দ-আভা-দীপ্ত মুখ! ডাক্তার অদূরে চেয়ারে বসিয়া টেম্‌পারেচার চার্ট দেখিতেছেন,—প্রসন্ন স্মিত মুখ। কাশীধামের দর্শনীয় বিষয় সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

চট্ করিয়া মনে হইল—চমৎকার মানাইয়াছে! দুজনেই তরুণ, দুজনেই সুন্দর। শিষ্টালাপও অতি সুন্দর।—তবু—তবু ইহা দৃষ্টিপীড়াকর।...ইহারা নিঃসম্পর্কীয় যুবক যুবতী মাত্র...! এত মেলামেশা ত নিরাপদ নয়।...আসন্ন ভবিষ্যতের জন্য মন যে অজ্ঞাত আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়! অসতর্ক মুহূর্ত্তে ইহাদের মন ভিন্ন পথে পরিবর্ত্তিত হইতে বাধা কি? সেদিকে আকর্ষণের কারণ ত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান!

ইহাই মানুষের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব! প্রত্যেক মানুষ নিজের তৎকালীন মানসিক অবস্থার মাপকাটি দিয়া অপরের প্রকৃতি বিচার করে। ভুলিয়া যায়, যে অবস্থায় পড়িয়া সে দুর্ব্বলতা বা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া পরাস্ত হইয়াছে, অপরে হয়ত সেখানে অবহেলায় শক্তির পরিচয় দিয়া জয়ী!

অসুস্থ-চিত্ত খস্তর আজ নিজের বিকারগ্রস্ত মনোবৃত্তির নির্দ্দেশে, জগতের সব শ্রেণীর নর-নারীর চিত্ত বিকার-পীড়িত হইবার সম্ভাবনা দেখিল। ভীত হইল! মনে মনে বিরক্ত হইল!...অন্ধ সংস্কার!

কুশল প্রশ্ন চলিল। ডাক্তার হঠাৎ খস্তরের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। বলিলেন "তোমার কি শরীর ভাল নেই?"

কি তীক্ষ্ণ, স্বচ্ছ, নির্ম্মল অনুভূতি! এই কি ইন্দ্রিয়-চিন্তা-সর্ব্বস্ব স্বার্থ-মলিন হৃদয়ের পরিচয়? মূর্খ, মূর্খ খন্তর!

লজ্জিত হইয়া বলিল "না বাবু, শরীর ভাল আছে।"

"উহুঁ। মুখের চেহারা এমন খারাপ দেখাচ্ছে কেন?"—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খন্তরের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিতে করিতে ডাক্তার সাগ্রহে প্রশ্ন জুড়িলেন, সে কি উপযুক্ত আহার গ্রহণ করে না? সুনিদ্রা হয় না? খুব বেশী পরিশ্রম করে কি!

খন্তর বিপন্ন হইল। দায় এড়াইবার জন্য এক বাক্যে স্বীকার করিল, সব সত্য। কৈফিয়ৎ দিল স্থানান্তরে আসিয়াছে, নানা ঝঞ্ঝাট...ইত্যাদি।

মনোরমা সস্নেহে বলিল "বসো খন্তর, জিরোও। একটু জল টল খেয়ে বাড়ী যাবে।"

থার্ম্মমেটার চোখের সামনে তুলিয়া সানন্দে বলিল "আপনার আন্দাজ ঠিক। জ্বর আরও কমেছে। এখন একশো' পয়েণ্ট দুই!"

"কাল আরও কম দেখবেন।" বলিয়া স্মিত মুখে ডাক্তার চার্টে দাগ দিতে দিতে বলিলেন "কাশীতে ঠাকুর দেবতা ত মেলাই দেখেছেন, মানুষ দেবতা কোথাও কিছু দেখ্লেন?"

বড়বাবু কাশিতে লাগিলেন। মনোরমা পিকদানি তুলিয়া মুখের কাছে ধরিল। বলিল "আপনাদের আশীর্ব্বাদে তাও দেখ্লাম।—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে।"

ডাক্তার ফাউনটেন পেন নামাইলেন। হর্ষোজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন। বড়বাবুর কাশির ধমক একটু থামিলে, সাগ্রহে ডাক্তার বলিলেন "গিয়েছিলেন সেখানে?"

দম লইয়া বড়বাবু বলিলেন "প্রাণের টান। রোগী আছে যে!"

ডাক্তার সানন্দে বলিলেন "বাঃ বাঃ, কেমন দেখলেন?"

বড়বাবু খানিক কাশিয়া শ্লেষ্মা পিকদানিতে ফেলিলেন। মনোরমা পিকদানি রাখিয়া হাত ধুইল। মেঝেয় বসিয়া বেদানার রস প্রস্তত করিতে করিতে শ্রদ্ধামুগ্ধ কণ্ঠে বলিল "কি দেখেছি, কি বুঝেছি, তা বল্‌তে পারব না। পুরুষদের বিভাগটায় আমাদের ঢোকা হয় নি, দেখেছি শুধু মেয়েদের বিভাগটা। আপনাদের বড় বড় হাসপাতালের ব্যাপার কি রকম জানিনে।—কিন্তু সেখানকার সেবিকাদের দেখে আমার বড় তৃপ্তি হোল। আহা, তাঁদের সেবাধর্ম্মের মধ্যে—যেন আন্তরিক নিষ্ঠা, মূর্ত্তিমান ভক্তি, দাঁড়িয়ে আছে।"

সেখানকার সেবিকাদের কয়েকটি ছোটখাট আচরণের উল্লেখ করিয়া মনোরমা পুনশ্চ বলিল "নিঃস্বার্থ করুণায় সেবা-ধর্ম্ম পালন করে মানুষ কত বেশী আত্মোন্নতি লাভ করে,—সেখানে গিয়ে শিক্ষা পেলুম। সেবাশ্রম দেখে কি তৃপ্তি পেয়েছি, তা বল্‌তে পার্‌ব না।"

ডাক্তারের চক্ষু গভীর আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বড়বাবুর দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন "বল্‌তে আমিও পারি না মশাই, মুখে আটকায়। ওঃ, এই কপর্দ্দকশূন্য সন্ন্যাসীগুলির চরণের ধূলাকেও গড়! বিবেকানন্দ বুঝে সুঝেই বলেছিলেন যে "ধর্ম্মের গভীর সত্য সকল জীবনে প্রত্যক্ষ করতে হলে—অনেক শক্তির প্রয়োজন; সেই জন্য ধর্ম্মপথের পথিকদের বিষয়-ভোগ ইত্যাদিতে শক্তিক্ষয় না করে ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা শক্তি রক্ষা করাই দরকার।" সেবাশ্রমের কথা মনে হলেই, আমার মনে পড়ে "উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো" অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পূজা—সেটা এঁরাই বুঝেছেন!"

মনোরমা সানন্দে বলিল "তাহলে ভরসা করে সত্যি কথা বলি। ভাবের আবেগে অত্যুক্তি নয়। বিশ্বনাথ দর্শন করে যত আনন্দ পেয়েছি, সেবাশ্রম দর্শন করে তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি। মনে হোল, বিবেকানন্দের

বিরাট ব্যক্তিত্ব, দিব্য-প্রতিভা সেখানকার সব-কিছুতে জাজ্জ্বল্যমান দেখ্‌ছি!"

ডাক্তার স্তব্ধ নির্ব্বাক্ ভাবে বড়বাবুর দিকে চাহিলেন। বড়বাবু প্রসন্ন কৌতুকে সহাস্যে বলিলেন "এক ফোঁটা মেয়ের আস্পর্দ্ধা দেখছেন? ও যেন বিবেকানন্দের মাসি পিসি কেউ ছিল! তাঁকে যেন কতই দেখেছে, কতই চেনে!"

ডাক্তার প্রশান্ত স্মিত মুখে বলিলেন "তাই ভাবছি। আমাদের ঘরের এমন একটি ছোট্ট মেয়ের মুখে এত বড় কথা শুন্‌তে পাব, আশা করি নি। মনে পড়ছে, এক বাঙালী ধনী-গৃহের পাকা সুগৃহিণীর কথা। একদিন গিয়ে দেখি তিনি বিবেকানন্দের বই পড়্‌ছেন। সেখানে আরও দুচারজন ছিল। বিবেকানন্দের সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হোল। গৃহিণী ঠাকুরাণী গভীর অবজ্ঞায় হঠাৎ এমন এক কথা বলে বস্‌লেন যে আমি স্তম্ভিত! বোঝা গেল, বিবেকানন্দ স্বামীর অসাধারণ শক্তি বা দিব্য-প্রতিভা দূরে থাক,—বিবেকানন্দ পদার্থটি যে কি, তাও তাঁর জানা নাই। কেন না, তাঁর সরকার মশাই বাজার খরচের ফর্দ্দে সেটার হিসাব লেখেন নি। অতএব সে বস্তু ধর্ত্তব্যই নয়!"

বড়বাবু সহাস্যে বলিলেন "বাড়াবাড়ি হচ্ছে ডাক্তার! নিজে বলেছ তিনি বিবেকানন্দের লেখা পড়্‌ছেন—"

ডাক্তার বলিলেন "হাঁ। তাই ত দুঃখ। স্কুল কলেজেও ঢের ছেলেমেয়ে পড়্‌তে যান, জ্ঞানলাভ করাই যে সকলের উদ্দেশ্য, তা তো নয়। ধনী-গৃহেও অনেকের সময় কাটাবার জন্য বই পড়াটা সেই ধরণের ব্যাপার। যাক, আজ এখানে একটু খুশী হলুম, স্বস্তি পেলাম। মা ঠাকরুণ আমার, বেঁচে থাকুন।"

লজ্জিত হইয়া মনোরমা যুক্ত-করে বলিল "নেহাৎ গালাগালি! শুধু

আমার মূর্খতা দায়ী নয়, আমাদের ওই বাবুয়ার মা হেন পাগলীটা শুদ্ধ মহা খুশী! সেবাশ্রম দেখে আহ্লাদে কেঁদেই অস্থির! বলে,—আমিও এখানে সেবিকা হয়ে থাক্‌ব। আর ঘরে যাব না।"

ইহাদের কথা শুনিতে শুনিতে খন্তর ক্ষণিকের জন্য একটু অন্যমনা হইয়াছিল। হঠাৎ বাবুয়ার মার নাম এবং তাহার এই মন্তব্য শুনিয়া চমকিয়া উঠিল! সেবাশ্রমের প্রতি উহার এত আকর্ষণ? ইহার হেতু?

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল গৃহেই বা উহার আকর্ষণের কি আছে? গৃহই বা উহার কোথায়?···

পিতৃব্য ক্ষীণ হাস্যে বলিলেন "তাই না-কি? তাহলে বাছা, তুমিই ওর মাথায় এ ফন্দি ঢুকিয়ে দিয়েছ! তোমার কথাই ত ওর কাছে বেদ-বাক্য!"

অধিকতর লজ্জিত হইয়া মনোরমা বলিল "না না, অতটা নয়। তবে আমাকে একটু অনুগ্রহ করে বটে। বিশ্বনাথের মন্দিরের ভিড় দেখে একদিন রাগ করে বলেছিলাম "বাবাঃ,—বিশ্বনাথ যেন গুণ্ডাদের ঠাকুর।" বাবুয়ার মা তার পর দিন ধরে বস্‌ল "বিশ্বনাথ ত গুণ্ডাদের ঠাকুর! ও আর দেখ্‌ব কি? বিশ্বনাথের পাণ্ডাগুলা সব গুণ্ডা!"

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন "কথাটা একান্ত মিথ্যা নয়। আপনাদের এই শ্রীশ্রী৺গয়াধামেও তার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান! না হে খন্তর, চটো না। তোমার দেশ-ভাইদের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে ওদের একটু ভদ্র হওয়া, আর শিষ্টাচার শিক্ষা করা দরকার।"

বলিতে বলিতে ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিদায় সম্ভাষণ করিয়া, রোগীর সম্বন্ধে আরও দু একটা প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া বাহির হইলেন।

খন্তরও তাঁহার সহিত বাহিরে আসিল। মনোরমার পীড়াপীড়িতে কোন মতে জল-যোগ করিয়া বিমর্ষ চিন্তাকুল মুখে বাসায় চলিল।

বিভিন্ন চিন্তার দ্বন্দ্বে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।

১৪

দারুণ গুমট। এতটুকু বাতাস নাই।

রাত্রে আঙিনায় খাটিয়া পাতিয়া খন্তর শুইল। চারিদিক নির্জ্জন। চক্ষে ঘুম নাই, মনে তুমুল সংগ্রাম।

এতগুলি প্রিয়জনের মমতা ভুলিল, এটা ভুলিতে পারে না? পারিবে বই কি। ওই নারী আজ চাঞ্চল্য-বিক্ষুব্ধ চিত্তকে সংযত করিয়া উন্নততর পথে চলিয়াছে, ভগবান উহার মঙ্গল করুন। খন্তর প্রলোভন রূপে আর তাহার সামনে দাঁড়াইবে না। যদি সে আবার আত্মহারা হয়, —অভাগিনীর মহা অনিষ্ট! সে ক্ষতির তুলনায় খন্তরের পিপাসিত চিত্তের সাময়িক শান্তি কামনা? উৎসন্ন যাক সে স্বার্থপরতা!

কিন্তু সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া এ কি দুর্দ্দাম বাসনা, বার বার উদ্দাম ঝঞ্ঝার মত হানা দিতেছে! চিত্তের দিকে চাহিতে ভয় হয়! চিত্তগতির অর্থ বিশ্লেষণ করিতে লজ্জায় ঘৃণায় মাথা হেঁট হয়!···এ অবস্থার নাম অপরের বিচারে হউক প্রেম, হউক প্রণয়—বা আরও কিছু সুরসাল বিশেষণযুক্ত শ্রুতিমধুর বড় কথা, কিন্তু খন্তর স্পষ্ট বুঝিতেছে ইহার আসল নাম চিত্ত-বিকার! ইহার বিকার বিকৃত গতিবেগ—অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ।···তবু তার ঘূর্ণন উচ্ছ্বাস তীব্র, আবেগ মত্ততা উগ্র, বিক্ষোভ জটিলতা গভীর! ইহা মুহুর্মুহুঃ খন্তরের মনকে টানিয়া ছিঁড়িয়া

কখনও আকাশে কখনও পাতালে লইয়া যাইতেছে।—ইহার শক্তি ভয়ানক সন্দেহ নাই! কিন্তু তবু ইহা—? ইহা একান্ত নিষিদ্ধ, মানসিক অসুস্থতা!

আর ভাবিতে পারিল না। অধীরভাবে খাটিয়া ছাড়িয়া উঠিল। আঙিনায় পায়চারি করিতে লাগিল।

"কে রে, খন্তরা?"

খন্তর চাহিয়া দেখিল, সুমার কতকগুলি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে লঘু পরিহাস-কৌতুকে চারিদিক মুখরিত করিয়া অদূরে পথ দিয়া আসিতেছে। জ্যোৎস্নালোকে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাক দিতেছে।

"হাঁ" বলিয়া খন্তর সাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথা গিয়েছিলি সব?"

"কোথা আর যাব? হোলির গান গেয়ে এবার ঘরে ফিরছি। তুই ঘুমুস্ নি যে?"

বলিতে বলিতে ভগ্ন প্রাচীরের মাটীর স্তূপ অতিক্রম করিয়া যুবকেরা আসিয়া তাহার অঙিনায় দাঁড়াইল।

খন্তর খাটিয়া খানা দেখাইয়া বলিল "বস সব। আজ বড় গরম পড়েছে নয়? আমি ত ঘুমতে পারছি না।"

সকলে বসিল। বন্ধু স্থানীয় এক যুবা পরিহাস করিয়া বলিল "একটু ভাং খা। বেশ ঘুম হবে।"

খন্তর কখনও মাদক স্পর্শ করিত না। নেশার উপরে সে আন্তরিক বিরূপ,—সকলেই জানে। খন্তর একটু হাসিয়া পুনরায় পায়চারি করিতে করিতে বলিল "তোরা খেয়েছিস না? তোদের ছেলেপিলে গুলোর ওতে নানান অসুখ, মায়—মাথার অসুখও ধর্‌বার ভয় আছে। বেশী খাস্ না রে।"

একজন মত্ত হুঙ্কারে বলিল "তুমি ত পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছ। তোমার ত কারুর তোয়াক্কা রাখ্‌তে হয় না। একটু খেয়েই দেখ না। খাবে? আছে একটু।" বলিয়া হাতের ঘটি দেখাইল।"

খন্তর এবার হাসিল না। গুম্ হইয়া কি একটু ভাবিল, শুষ্ক স্বরে বলিল "ওতে ঘুম হবে বল্‌তে পারিস্?"

সকলে সমস্বরে বলিল "হাঁ হাঁ, তা হবে।"

একজন আলো তুলিয়া ঘটির ভিতর উঁকি দিয়া বলিল "দূর দূর্। কতটুকু আছে! এ যে নেহাৎ সামান্য।"

সুমার বলিল "খন্তরার পক্ষে ওতেই যথেষ্ট হবে। যে কখনো নেশা করে না, তার একটুতেই খুব ধরে যায়।"

খন্তর শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল "দে, তবে খাই। মরণের আরামটা একবার দেখা যাক।"

জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ঘটিটা লইল। এক চুমুকে সমস্তটুকু নিঃশেষ করিয়া ঘটি ফিরাইয়া দিয়া বলিল "কাল সকালে নেশা ছুটে যাবে ত?"

"আরে হাঁ হাঁ। না ছোটে, একদিন চাকরি কামাই করিস্। পর্শু ত ফাগুয়ার ছুটি আছে। অত ভয় কিসের?"

বন্ধুরা বিশেষ উৎসাহের সহিত পুনঃ পুনঃ অভয় ঘোষণা করিল।

খন্তর ফাগুয়া উৎসবে আনন্দমত্ত নরনারীদের তরল প্রমোদ-মত্ততার নাচ দেখিয়া, অশ্লীল ভাবদ্যোতক সঙ্গীতচর্চ্চার উৎসাহ দেখিয়া, অসংযত উদ্দাম জীবনযাত্রার গতি দেখিয়া, অসহিষ্ণু হইত। ইহাদের অন্তঃসার-শূন্য অপদার্থ বলিয়া গালি দিত। ইহাদের পীড়াদায়ক সংস্রবের পাশ কাটাইয়া নীরব গাম্ভীর্য্যে চলাফেরা করিত, ইহাদের সন্ত্রস্ত সঙ্কুচিত করিত। সেই খন্তর আজ স্বেচ্ছায় ভাং খাইয়াছে—ইহাতে সকলেই

বিশেষ স্ফূর্ত্তি ও আরাম বোধ করিল। তাহাদের মনে হইল দলছাড়া খন্তর আজ দলে ভর্ত্তি হইল!

দলের মধ্যে ননকু এতক্ষণ সকলের আড়ালে মুখ লুকাইয়া বসিয়া ছিল। দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থতার আবেগ ছিল তাহার জীবনে অতিশয় ভয়ঙ্কর, এবং সেই মন্ত্রে শুধু আত্ম-সম্মোহন করিয়াই সে নিরস্ত ছিল না। আরও অনেকগুলি অপরিণতবুদ্ধি যুবক যুবতীকে সেই মন্ত্রে সম্মোহিত করিয়া সেই পথে লইয়া গিয়াছিল। সেই শ্রেণীর নরনারীদের উপর ননকুর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় যাহারা পরিপক্ক হইয়াছে, কিম্বা চারিত্রিক বিশুদ্ধতার প্রতি যাহাদের নিষ্ঠা আছে, তাহারা ননকুর অসামান্য লোকরঞ্জনকর ক্ষমতা সত্ত্বেও ননকুকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। খন্তরের সঙ্গে ননকুর কোন সম্পর্ক ছিল না। খন্তর তাহাকে নীরবে উপেক্ষা করিত। ননকু যত দুঃসাহসের সহিত বাহ্যিক মনুষ্যত্বের আড়ম্বর বজায় রাখিয়া যে শ্রেণীর নরনারীর দলকেই মুগ্ধ করিয়া বেড়াক; খন্তর শ্রেণীর মানুষগুলাকে সন্তর্পণে এড়াইয়া চলিত। ন্যায়ানুচারী চরিত্রবান মানুষদের স্বভাবে এমনই একটা অদ্ভুত প্রভাবের মাহাত্ম্য আছে, যে সাধারণ দুশ্চরিত্র মানুষ মাত্রেই তাহাদের সংস্রব, তীব্র বিদ্বেষমিশ্রিত ভয়ের সঙ্গে এড়াইয়া চলে, এবং সুযোগ পাইলেই তাহাদের খল সর্পের মত দংশন করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে।

খন্তরকে আজ ভাং সেবন করিতে দেখিয়া ননকু মনে মনে অত্যন্ত আশান্বিত হইল। কিন্তু একেবারে বেশী অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। নিকটস্থ যুবকটির পাঁজরে কুনুইয়ের খোঁচা দিয়া, পরম ভক্তের মত নিরীহভাবে বলিল "একটু রামলীলার গান মিস্ত্রীকে শুনিয়ে দে না রে।"

যুবকদের সঙ্গেই খরতাল খঞ্জনী ছিল। তৎক্ষণাৎ তাহা বাজিয়া

উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই খচ্‌মচ্‌ শব্দের তালে চড়া গলায় তার-স্বরে তিন চারিজন এমন চীৎকার করিয়া উঠিল—যাহাকে সঙ্গীত না বলিয়া জীব-বিশেষের আর্ত্তনাদ বলাই ভাল। অবশ্য লছমন-ভাই ও সীতা-মাঈকে সঙ্গে লইয়া নির্ব্বাসিত রামচন্দ্রের বনগমন-ইতিহাস যতই করুণ রসোদ্দীপক হউক!

খন্তর ব্যস্ত হইয়া বলিল "আজ থাক, থাক! দুপুররাতে পাড়ার মানুষগুলা সব খেটেখুটে এসে শুয়েছে,—চেঁচামেচিতে ওদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে। কাল বরং তোরা সকাল সকাল আসিস্, এইখানেই গানের আড্ডা বসাস্।"

অগত্যা যুবকের দল সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিল।

অল্পক্ষণেই খন্তরের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া নেশা জমিয়া আসিল। লাঠি ও লণ্ঠন নিকটে রাখিয়া, ঘরের চাবিটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া, অভ্যাগ-বশে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিল, পীড়িত বড়বাবুর শয্যার পাশে বসিয়া মনোরমা ও ডাক্তারবাবু হাসিমুখে নানাবিধ উচ্চ তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের সুন্দর মুখ দুইটা চমৎকার জ্যোতির্ম্ময় দেখাইতেছে। তাঁহাদের সুসংযত সদালাপ দৃশ্য দেখিয়া খন্তরের আক্ষেপ হইতে লাগিল, আহা ইঁহারা দুইটি যদি বিবাহিত বরবধূ হইতেন, তবে কি সুন্দর মিলন হইত! কিন্তু হায় হায়! যাহাদের সুন্দর মধুর মিলন দেখিবার জন্য খন্তরের এত খেদ,—তাঁহারা উভয়েই ভুলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যুবক যুবতী! দৈহিক তত্ত্বের চিন্তা যেন তাঁহাদের কাছে নিতান্তই অগ্রাহ্যের ব্যাপার! দৈহিক স্তরের ঊর্দ্ধে,—কোন অপার্থিব আনন্দময় চিন্তারাজ্যে যেন তাঁহারা সানন্দে সাঁতার কাটিতেছেন। তাঁহাদের উভয়ের দেহ যেন দেখিতে দেখিতে স্বচ্ছ বায়ুস্তরে মিলাইয়া

গেল! শুধু প্রশান্ত সুন্দর উজ্জ্বল দীপ্তিমান মুখ দুইটি চারিদিকে দিব্য আনন্দের আলো ছড়াইতে লাগিল।

আর খন্তর? সে যেন অনেক নীচে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে হাঁ করিয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আছে। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সে যেন কখন অন্যমনস্ক হইয়াছে, তাহার স্থূল অস্থি-মাংস-ভারাক্রান্ত দেহটার পাশে কাহার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া, চমকিয়া দেখিতেছে—বাবুয়ার মা তাহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার পর উভয়ের মধ্যে যেন কোন ঊর্দ্ধলোকে উঠিবার পরামর্শ হইল এবং হাতের কাছে এক অদ্ভুত ধরণের মশারীর সূতার মত সূক্ষ্ম পল্‌কা সূতা নির্ম্মিত সিঁড়ি দেখিতে পাইয়া উভয়ে তাহাই অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিতে গেল। কিন্তু হায়! তাহাদের দেহের ভারে পল্‌কা সূতাগুলা পট্ পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল, উপরে উঠা হইল না।

এমন সময় কাক-কোকিলের ডাক শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল ভোর হইয়াছে। "রাম রাম" বলিয়া খন্তর উঠিয়া পড়িল। নেশার ঝোঁকে রাত্রে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছে ভাবিয়া নিজমনে হাসিল। মাথা ঝাড়া দিয়া দেখিল—নির্ভয়! নেশা কাটিয়া গিয়াছে।

দিনের কাযকর্ম্ম শেষ হইল। আজ ইচ্ছা করিয়াই খন্তর বড়বাবুর বাড়ী গেল না। পথে কানহাইয়ালালের কাছে সংবাদ লইয়া জানিল তিনি ভাল আছেন।

সন্ধ্যার পর যুবকের দল খঞ্জনী খরতাল লইয়া তাহার আঙিনায় আসিয়া চ্যাটাই পাতিয়া বসিল। মহোৎসাহে সঙ্গীতচর্চ্চা জুড়িল। ভাং চলিল, গাঁজা চলিল। সহ্য হইবে না বলিয়া খন্তর গাঁজা খাইল না। কিন্তু উহাদের অনুরোধে ভাং কিছু খাইল। মন গোলাপী নেশায় রঙীন হইয়া উঠিল।

হোলির গান সুরু হইল বেশ ভদ্রভাবে। কিন্তু হতভাগ্য নন্কুর ইঙ্গিতে নেশামত্ত যুবকদের মাত্রাজ্ঞান ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিল। শেষে উহা এমন ভাব, এমন ভঙ্গিমাদ্যোতক হইয়া উঠিল, যখন আর সহ্য করা শক্ত। নেশার ঝোঁকে খন্তরের দেহমন যতই স্ফূর্ত্তি-প্রফুল্ল হউক, ইহাদের কদর্য্য রুচি তাহার সংস্কারকে পীড়া দিতে লাগিল। কিন্তু ইহারা আজ প্রথম দিন মাত্র সখ করিয়া তাহার বাড়ীতে গানবাজনা করিতে আসিয়াছে, দলের অধিকাংশ যুবাই তাহার অল্প পরিচিত,—সুতরাং তাহাদের বিশেষ কিছু বলিতে খন্তরের সৌজন্যে বাধিল। মৃদুভাবে দুই একবার আপত্তি করিল। তার পর শনিচরকে ডাকিয়া আনিবার অছিলা করিয়া, সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

শনিচরের কুটীরে গিয়া দেখিল, কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া সে সেইমাত্র গাঁজার কলিকা লইয়া বসিয়াছে। খন্তরকে দেখিয়া সে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

শনিচরের বাড়ীর মাটীর পাঁচিল ঘেরা আঙিনাটা সদর অন্দর দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সদরের আঙিনায় এক প্রান্তে জ্যোৎস্নার আলোয় খাটিয়ার উপর বসিয়া দুইজনে মুখোমুখি হইয়া বহুবিধ গল্প জুড়িয়া দিল। খন্তর যদিও শনিচরকে গানের আড্ডায় লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু বেশ জানিত—শনিচরের মত লোকের আবির্ভাবে আসরের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইবে না, বরঞ্চ বাড়িবে। তার চেয়ে শনিচর এইখানে বসিয়া অলস আরামে গঞ্জিকা-ধূমের সদ্ব্যবহার করুক, ছোঁড়াগুলা ওখানে নিজেদের রুচিমত হৈ চৈ করিয়া খুশী হউক। সময় কাটাইবার জন্য খন্তর এইখানে বসিয়া বাজে-গল্প করুক,—তাতে সবদিকে একরকম সামঞ্জস্য থাকিবে।

হু হু শব্দে বসন্ত-সন্ধ্যার উতলা-আকুল দক্ষিণা বাতাস বহিয়া

আসিতেছিল। চাঁদের আলোয় চারিদিকে স্নিগ্ধমধুর মায়াজাল বিছাইয়াছে। অদূরে উল্লাসমত্ত যুবকদের তথা-কথিত প্রেমের গান চলিতেছে। ভাং'এর নেশায় খন্তরের বিচারশক্তি স্তিমিত নিস্তেজ করিয়া মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, নব-যৌবনের বিস্মৃত-প্রায় মধুময় স্বপ্নস্মৃতিগুলা হানা দিতে লাগিল। গভীর নিরাশাময় কি এক অজ্ঞাত বিষাদের ব্যথায়, নিষ্ফল যাতনায় মন ভার হইয়া উঠিল। কথা কহিতে কহিতে খন্তর ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলে অকারণে বেদনা-গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। তবু মনে পড়িতে লাগিল, এ চিত্ত-দৌর্ব্বল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। ইহাতে নানা ক্ষতির আশঙ্কা!

গ্রাম্য সংবাদের আলোচনা চলিতেছিল। সহসা সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া, খন্তর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "কাল ছুটি আছে। চল, পাহাড়ে গিয়ে দু' চারটি ভাল সাধু দেখে আসা যাক। সৎসঙ্গে মন ভাল থাকে।"

শাঁচের গাঁজার কালকা নামাইয়া, মাথা নাড়িল। খন্তরের দিকে চাহিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল "সাধু দেখে স্বর্গে যাব, এত সখ আমার নেই। যেতে হয়, একা যেও। খন্তরা, এমিভাবে ভণ্ডামি করেই দিনগুলা কাটিয়ে দিবি?"

খন্তর জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল। ম্লান-হাস্যে বলিল "আর কি করব বল্? বেঁচে থাকার ঝঞ্ঝাট ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠ্ছে।"

"তা তো উঠ্বেই। আমার কাছেও ওটা এত অসহ্য হয়ে উঠেছে যে ইচ্ছে হচ্ছে চাকরি-বাকরি ছেড়ে সাধু সেজে কোথাও চলে যাই।"

খন্তর বুঝিল—ইহা তাহারই উদ্দেশে বক্রোক্তি মাত্র। একটু হাসিয়া বলিল "সাধু সাজা সহজ,—কিন্তু যথার্থ সাধু হওয়া অত সহজ নয় রে!

আচ্ছা শনিচর, তুই 'বরম্‌যোনি' পাহাড়ের সেই বুড়ো সাধুবাবাকে দেখেছিস্‌? লোকটি বেশ জ্ঞানী, না?"

"হতে পারে। কেননা তাঁকে দেখি নি। সেই সাধুবাবাটি বুঝি তোকে ঘর সংসার কর্‌তে বারণ করেছে?"

"জ্ঞানীরা কি কাউকে কিছু বারণ করেন? তাঁরা জানেন নিজের নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে প্রত্যেক মানুষকে চল্‌তে হবে। তবে—নিবৃত্তিতে মহাফল।"

খস্তরের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সদরদুয়ারের নিকট হইতে বৃদ্ধা কণ্ঠের ডাক আসিল "ও বাবা মিস্ত্রীজি, তুমি এখানে আছ?"

খস্তর সাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল "কে?"

"আমি। মনুয়ার মাসি।" বলিতে বলিতে সেই বৃদ্ধা গয়লাবুড়ী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। সঙ্গে তের চোদ্দ বছর বয়সের বোনপো মহুয়া। সুস্থ সবল প্রিয়দর্শন বালক, জামাকাপড় পাগাড় ধূলামলিন, ফাগুয়া উৎসবের বিশেষত্ব-জ্ঞাপক লাল নীল সবুজ রঙে ভূষিত। দেখিলেই বোঝা যায় ছেলেটি যথেষ্ট পরিমাণে এই কয়দিনে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিয়াছে।

তাহাকে দেখাইয়া বৃদ্ধা বলিল "এরই চাকরির জন্যে বলেছিলাম বাবা। যেখানে হোক একটা কিছু জুটিয়ে দাও। গরীবদের তাহলে বড় উপকার হয়। তোমায়, ওবাড়ীতে খুঁজ্‌তে গিয়েছিলুম। কতক্ষণ বসে রইলাম। ওরা বল্‌লে তুমি এখানে এসেছ, তাই আবার এখানে এলুম।"

খস্তরের নিজ চিন্তা চাপা পড়িল। মনে কর্ম্মজীবনের অভ্যস্ত সংস্কার জাগিয়া উঠিল। মনোযোগের সহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কর্ম্মপ্রার্থীর আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিল "আচ্ছা, কাল পর্শু ছুটি আছে। তার পর

একে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। কি রে মনুয়া মন লাগিয়ে কায-কর্ম্ম করবি ত ?”

ছেলেটার সঙ্গে গোটাকতক কথা কহিয়া খন্তর তাহাদের আশ্বাস দিয়া বিদায় করিল। বৃদ্ধা কৃতজ্ঞতাসহ তাহার শুভ কামনা জানাইয়া গেল।

খন্তর আবার শুইয়া পড়িল। তাহার বাড়ীর দিক হইতে যুবকদের উচ্চ চীৎকার উচ্চতর হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।—খন্তর কাণ পাতিয়া খানিক শুনিল। তার পর আলস্য ভাঙিয়া হাই তুলিয়া বলিল “আঃ, এ আপদগুলার গান বাজনা শেষ হলে যে বাঁচি। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে।”

১৫

শনিচর পুনশ্চ এক ছিলিম গাঁজা সাজিতে সাজিতে বলিল “এই ত ঘোঁটে রাত্রি দশটা। ওদের গান বাজনা আজ রাত দুটো অবধি চল্‌বে! কাল ছুটি আছে।”

“তাই ত বটে। কথাটা স্মরণ ছিল না। খন্তর চিন্তিত হইয়া বলিল “ভেইয়া, তুই চল ছোঁড়াগুলোকে ভুলিয়ে অন্য কোথাও চালান করে দে। আমার ঘুম পেয়েছে।”

শনিচর বলিল “দাঁড়া। আমার মা বড়বাবুর বাড়ী গিয়েছে, ফিরে আসুক। তার পর যাচ্ছি।”

একটু ঔৎসুক্যের সহিত খন্তর বলিল “বড়বাবুর বাড়ী? কেন?”

গাঁজায় টান দিয়া শনিচর বলিল “পার্‌বতিয়াকে আন্‌তে।”

খন্তরের মন অকারণেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। উঠিয়া বসিয়া বলিল “সে কি রোজ রাত্রে এখানে এসে ঘুমোয় ?”

“হাঁ! শেষরাত্রে উঠে মার সঙ্গে গম টম্ পেষে কি-না। কিন্তু তুই যে বড় তার নাম শুনে তেড়ে উঠে বস্‌লি ?”

লজ্জা গোপন করিবার জন্ম খন্তর তাড়াতাড়ি কানাইয়ালালের রসিকতার অনুকরণ করিয়া বলিল “ভৌজির বহিন্, খাতির করব না ?”

“তাহলে মনটা আজকাল নরম হয়েছে বল ?”

খন্তর কোন উত্তর দিল না। নীরবে শুইয়া পড়িল। উর্দ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া সন্তর্পণে মৃদু নিঃশ্বাস ছাড়িল। হাঁ, তাহার মন নম্র নয়—রীতিমত দুর্বল হইয়া পড়িতেছে বটে!

শনিচর পুনশ্চ বলিল “কি রে মন ফিরেছে কি-না বল্ না।”

গম্ভীর হইয়া খন্তর বলিল “ও-সব কথা ছেড়ে দে। যা হবার নয়, তা নিয়ে রঙ্গ করা আমার ভাল লাগে না।”

শনিচর হাতের কলিকা সরাইয়া বলিল “রঙ্গ করি নি। কাযের কথাই বল্‌ছি। রাজি থাকিস ত বল, সাগাটা লাগিয়ে দেবার যোগাড় করি।—তা হলে ওকে আর সেখানে যেতে দিই না।”

নেশার ঝোঁকে খন্তরের সমস্ত অন্তঃকরণ সহসা গভীর দৌর্ব্বল্যে অভিভূত হইয়া পড়িল। ব্যথিতস্বরে বলিল “আমি রাজি থাক্‌লে কি হবে বল্? তার মন এখন অন্য দিকে ছুটেছে। দিদিমণি বড়বাবুর কাছে বলছিলেন শুনলুম,—ও তো রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যাবার জন্যে ঝুঁকেছে।”

বিদ্রূপ ভরে মুখভঙ্গী করিয়া শনিচর বলিল “সে ত তুইও ঝুঁকেছিস। তা এক কায কর। দুজনে গাটছড়া বেঁধে সোজা চলে যা, কেউ বাধা দেবে না। মানাবেও বেশ।”

খন্তর কোন উত্তর দিল না। চুপ করিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিল। তার পর ম্লানহাস্যে বলিল "গাঁটছড়া যার তার সঙ্গে বাঁধা সহজ। কিন্তু দু'জনে এক সঙ্গে উচুঁ রাস্তায় যাওয়া বড় কঠিন। যদি খুব হিসেবী-হুঁসিয়ার মনের মত মানুষ মেলে,—তবেই কতকটা আশা ভরসা।—নইলে সব পণ্ড হয়। তার চেয়ে একা একা চলাই ভাল।"

এ কথার সূক্ষ্ম ভাবার্থ শনিচরের স্থূল বুদ্ধিতে প্রবেশ করিল না। রসিকতাচ্ছলে খন্তরের স্কন্ধে এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল "অত হেঁয়ালি বুঝি না। পারবতিয়াকে তোর পছন্দ হয় কি না বল্?"

সর্ব্বনাশ! এ কথাটা এত সহজে, এত সোজা ভাষায় স্বীকার করিতে হইবে? তাহা হইলে,—অত বড় ব্যাপারটার না থাকে মর্য্যাদা! না থাকে মাধুর্য্য! তাহাদের সমাজ-ধর্ম্ম মতে ওই নারীর আজ পুনরায় বিবাহে বাধা না থাকিলেও,—একদিন সে স্বামীর স্ত্রী ছিল, সন্তানদের জননী ছিল।—তাহার সে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, তাহার সম্বন্ধে নিজের মুগ্ধচিত্তের গোপনবাণী যথেচ্ছ ভাষায় প্রকাশ করা চলে না। অন্ততঃ তাহাতে কতকটা সংযমের শিষ্টতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু ততটা সাবধানে মনোভাব প্রকাশ করিবার মত ভাষার কৌশল খন্তরের আয়ত্ত-গত নয়। তাই সে প্রসঙ্গে—সসম্মানে নীরব থাকিতেই তাহার ইচ্ছা হয়।

তাছাড়া শনিচরের মত অমার্জ্জিত রুচির স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে,—তাহার পছন্দ বোধের বিশেষত্ব কোথায়? রূপ-যৌবনের আকর্ষণ এ সংসারে অতিশয় তীব্র, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা খন্তরের মনকে এমন কোন উচ্ছৃঙ্খলতায় তাতাইতে পারে না,—উন্মাদনায় মাতাইতে পারে না,—যাহার প্রভাবে নির্ব্বিচারে মোহমুগ্ধ হইয়া খন্তর নৈতিক বুদ্ধিকে হত্যা করিতে প্রস্তুত!···তাহার প্রথম জীবনের পরিণীতা

কিশোরীও তাহাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে—কম রূপসী ছিল না। সে সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি খন্তর ভাল করিয়াই দেখিয়াছে। শ্মশানের ভস্ম-মুষ্টি-দর্শী দৃষ্টিতে আজ অর্ব্বাচীনের সৌন্দর্য্যলোলুপতা নেশার রঙ ধরাইতে পারে না। শুধু নির্ম্মল, আকাঙ্ক্ষাহীন, আনন্দ দান করে মাত্র!

আর রূপ-যৌবনের দিক হইতে এ নারী এমনই বা কি? খন্তর ইচ্ছা করিলে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা কোন তরুণী সুন্দরীকে স্বচ্ছন্দে বধূরূপে নির্ব্বাচন করিতে পারে। সেটা ত জীবনের অতি স্থূল প্রয়োজনের দিকের কথা।—কিন্তু এ নারীর প্রতি আকর্ষণের হেতু তাহা নয়।

তবে?—উহাই ত সমস্যা!

ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ নাই, ধীরভাবে স্থির মস্তিষ্কে তাহার মন বুদ্ধির গুণাগুণের গভীরতা বিচারের অবকাশ পায় নাই। তবু ইহা ধ্রুব সত্য যে, শুধু রূপ-যৌবনের ইন্দ্রজালে নয়, বুদ্ধিমত্তার প্রখরতায় নয়,—খন্তর ইহার প্রতি সহসা আকৃষ্ট হইয়াছে,—ইহার বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন দেখিয়া! ইহার মুখে চোখে যে স্নিগ্ধ-করুণ-নম্র প্রশান্ত ভাব, এবং সংযম পবিত্রতার দিব্যজ্যোতিঃ দেখিতে পাইয়াছে,—উহাতেই ধর্ম্মার্থী খন্তরের চিত্ত এই নারীকে আত্মীয়ারূপে গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়াছে।

হয়ত ইহার সঙ্গে ওই নারীর অতীত দিনের সেই হৃদগত কামনার আকর্ষণও জড়িত আছে। হয়ত ইহার সঙ্গে—ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল মায়াও কিঞ্চিৎ মিশ্রিত আছে। কিন্তু তাহা গৌণ ভাবে। অন্ততঃ খন্তর তাহাই মনে করে।

খন্তর প্রাণপণ শক্তিতে মাথা ঠিক করিয়া বিচারবুদ্ধি খাটাইয়া যতটা পারিল ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহার বেশী আর ভাবিতে পারিল না। বিচার বুদ্ধি অবসন্ন হইয়া আসিল।

নেশামত্ত মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে অন্য চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। গোপন চিত্ততলে অভিনব কল্পনার কুহকে একটা সুখময় আবেশঘোর ঘনাইয়া আসিতেছিল। মন, ভাবের আবেগে বিভোর হইতে চাহিল।

খন্তরের মানসিক শক্তিগুলা নিস্তেজ নিঝুম হইয়া পড়িল। প্রলোভনের সামনে দাঁড়াইয়া আত্ম-পরীক্ষা - আত্ম-জয়ের সঙ্কল্পের কথা তাহার মনে কবে কখন উদয় হইয়াছিল, এখন আর মনে করিতে পারিল না। সে সব কথা বিস্বাদময় অস্পষ্ট দুঃস্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।

শনিচর তাহাকে ধরিয়া ঝাঁকানি দিল। বলিল "বল না, ওকে তোর পছন্দ হয় ?"

স্খলিত কণ্ঠে খন্তর বলিল "কেন হবে না ? না হওয়াই ত আশ্চর্য্য।"

শনিচর বিশ্বাস করিতে পারিল না। সন্দিগ্ধস্বরে বলিল "সাগা কর্‌বি ? ছ্যাখ্‌ ঠাট্টা নয়, ঠিক কথা বল।"

ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া খন্তর বলিল "না কর্‌লে উপায় কি ? তা নইলে, ও মানুষটাকে তোরা বস্তির ভিতর বাস কর্‌তে দিবি না, কোথাও স্থল-কূল দিবি না,—ও কি ভেসে যাবে ? হাঁ, আমিই ওকে সাগা কর্‌তে চাই। তোরা বুঝিয়ে পড়িয়ে ওর মন ফিরিয়ে দে, ওকে রাজি কর।"

ঠিক সেই সময় দুয়ারের কাছে আবির্ভূত হইল এক নারীমূর্ত্তি! খন্তরের শেষ কথাগুলা বোধ হয় তাহার কাণে গিয়া থাকিবে।—বাড়ীতে প্রবেশোদ্যত হইয়া সহসা সে স্তম্ভিত ভাবে চৌকাঠের উপর থমকিয়া দাঁড়াইল!

উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে তাহাকে চিনিতে পারিবামাত্র খন্তরের মনের নেশা এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। ত্রস্তে খাটিয়া ছাড়িয়া উঠিল। শিথিল মুরেঠাটা মাথায় জড়াইতে জড়াইতে, জুতার ভিতর পা দুটা অর্দ্ধেক

ঢুকাইয়া, ব্যস্তভাবে প্রস্থানোদ্যত হইল। বিদায় সম্ভাষণের কথাও মনে পড়িল না।

নারী তাহার পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য—নিঃশব্দে পিছু হটিয়া, দুয়ারের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। খন্তর মাথা হেঁট করিয়া পাশ কাটাইয়া বাহির হইল।

পর মুহূর্তে নারী চৌকাঠ অতিক্রম করিয়া ভিতরে ঢুকিল। চক্ষের নিমেষে আঙিনা পার হইয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

খন্তরের মনের ভিতর তখন প্রচণ্ড আলোড়নে প্রবল ঝড় উঠিয়াছিল। নেশার মস্তিষ্ক ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। কোন কিছুই ভাল করিয়া ভাবিবার বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না।—তবু মনে হইল সে আকস্মিক উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হইয়া, একটা ভয়ানক ভুল করিয়া ফেলিল! নিজের জীবনের উপর, ওই অভাগিনী নারীর জীবনের উপর একটা মহা অভিশাপ টানিয়া লইল!

কিসের অভিশাপ?

এ প্রশ্নের উত্তর ভাবিতে খন্তরের মাথা টন্ টন্ করিতে লাগিল। ভাংএর নেশাতেই হউক না গভীর আশঙ্কাতেই হউক বুক ধড়্ধড়্ করিতে লাগিল। কয়েক পা গিয়া সে দাঁড়াইল। হেঁট হইয়া জুতাটা পরিয়া লইল। সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই সামনে দৃষ্টি পড়িল দেখিল বার্দ্ধক্য-মন্থর গতিতে শনিচরের বৃদ্ধা জননী আসিতেছেন।

বৃদ্ধা বলিলেন "খন্তরা? চলে যাচ্ছিস কেন বেটা? বাড়ীতে আয়।"

খন্তর তখন আর চাহিতে পারিতেছে না, কথা বলিতে পারিতেছে না। ভারি গলায় অস্পষ্ট ভাবে "না" বলিয়া স্খলিত চরণে অগ্রসর হইল।

মাতার সাড়া পাইয়া—ভিতর হইতে উল্লসিত কণ্ঠে শনিচর বলিল "মা, খন্তরাকে ফেরাও, ফেরাও। সুখবর আছে।"

বৃদ্ধা সস্নেহে বলিলেন "আয়-না বেটা। কি সুখবর রে?"

মাথা হেঁট করিয়া রুদ্ধ-জড়িত স্বরে খন্তর বলিল "ছোড়াগুলো আমায় ভাং খাইয়ে দিয়েছে। বড্ড নেশা ধরেছে। আমি দাঁড়াতে পারছি না।"—এ সমাজে এ-সব নেশার কথা গুরুজনদের কাছে স্বীকার করা কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নয়, ইহা বলা বাহুল্য।

টলিতে টলিতে নিজের বাড়ীর দিকে চলিল। শুনিতে পাইল বৃদ্ধা নিজের পুত্রকে তিরস্কার করিতে করিতে বাড়ীতে ঢুকিতেছেন—"তোদের কি সব মন্দ? যে জন্মে ও-সব খায় না, তাকে কেন খাওয়ানো? যা এখন গিয়ে জাগ্ ছেলেটাকে। মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে দে।"

খন্তর যখন নিজের বাড়ীর কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন শনিচর হাসিতে হাসিতে ধীরে সুস্থে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। আবাল্য নেশা করিয়া নেশা-তত্ত্বে তাহার অস্থিমজ্জা পরিপক্ক।—নূতন নেশার্থীরা যে কত অল্পে কত সহজে বিহ্বল অভিভূত হইয়া পড়ে, সেটা তাহার জানা ছিল। এরূপ অবস্থায় নব নেশার্থীকে জব্দ হইতে দেখিলে তাহারা বিলক্ষণ আমোদ বোধ করিত। সুতরাং খন্তরের জন্য যে তাহার কিছুমাত্র উদ্বেগ ছিল না, সে কথা না বলিলেও চলে।

খন্তরের আঙিনায় তখন যুবকেরা ঘোর কোলাহলে শুধু নাচ গান নয়,—হুড়াহুড়ি, মারামারি পর্য্যন্ত জুড়িয়া দিয়াছিল! খন্তর আঙিনায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে—অন্তরালে শনিচরের দুই হাত চাপিয়া ধরিল। সকাতরে রুদ্ধস্বরে চুপি চুপি বলিল "ভেইয়া, সে হয়ত আমার মাৎলামি শুনতে পেয়েছে। তাকে মাফ্ করতে বলিস্। না, তাকে তোরা পীড়াপীড়ি করিস্ নি। তার ইচ্ছামত পথে তাকে যেতে দে। বুঝ্লি? ত্যক্ত করিস্ নি।"

শনিচর হাসিয়া বলিল—"আরে না না, তোর ভয় নেই। থাম।"

খন্তর থামিল না। অনুতপ্ত—উত্তেজিতস্বরে পুনরায় বলিতে লাগিল "ঝোঁকের মাথায়···এ কি করলুম আমি? এ কি করলুম? এ তো আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি যে এর জন্যে নিজের মনের সঙ্গে কত লড়াই করেছি। তবু কি করে এমন ভুল করলুম? শনিচর উঃ, আমার মাথা গেল!"

শনিচর ধমক দিয়া বলিল "নাৎলামি করিস্ নি।" যুবকদের বলিল "কতটা খাইয়েছিস্ একে? এর যে বড্ড কড়া নেশা ধরেছে।—জল আন্।"

গানের আসর ভাঙিয়া গেল। যুবকেরা খন্তরের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ তাহাকে লইয়া একটু কৌতুকও করিল। মাথায় জল দিয়া ভাংএর নেশা কাটাইবার জন্য দু একটা ঠাণ্ডা পানীয় সেবন করাইয়া খন্তরকে আঙিনায় চ্যাটাইয়ের উপর শোয়াইল। নেশার ঝোঁকে, তন্দ্রাঘোরে নানাবিধ বিলাপোক্তি করিতে করিতে খন্তর ঘুমাইয়া পড়িল।

সুমার বলিল "ওরে, রাত্রে এর কাছে কেউ একজন থাক।"

ননকু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল "আচ্ছা, আমি থাক্‌ব। গণপতি তুইও থাক।"

তাহারা খাইতে গেল। শনিচর ও সুমার অচেতন খন্তরের কাছে বসিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার মতি পরিবর্ত্তনের কথা আলোচনা করিতে লাগিল।

১৬

কয় ঘণ্টা অগাধে ঘুমাইয়া খন্তরের নেশা এবং ঘুম দুই তখন পাৎলা হইয়া আসিয়াছিল। তন্দ্রাঘোরে এক সময় মনে হইতে লাগিল সর্ব্বাঙ্গে শীতল বায়ুপ্রবাহের ঝাপ্টা লাগিতেছে। আরও মনে হইল—ঝড়ের হু হু শব্দের সঙ্গে ভয়ানক মেঘগর্জ্জন করিতেছে। খন্তর চোখ মেলিয়া প্রথমে চাহিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। অনুভব করিল—অসহ্য তৃষ্ণায় জিভ্ ভিতরে টানিতেছে। গলা শুকাইয়া গিয়াছে। অতএব নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, উঠিতেই হইবে এবং কষ্টে-সৃষ্টে জল সংগ্রহ করিতেই হইবে।

মনে পড়িল সে নেশা করিয়াছিল এবং নেশার ক্রিয়া-ফলে এখনও তাহার মস্তিষ্ক জড়ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে খন্তর নিজের বাহ্য-চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল।

সহসা পায়ে ও-কিসের স্পর্শ? হাঁটু বাহিয়া সাপ উঠিতেছে না কি?

তীক্ষ্ণ-চমকে সমস্ত অনুভূতি ত্রাসিত হইয়া উঠিল! নেশার অসাড়তা-ঘোর আংশিক ভাবে টুটিয়া গেল! প্রাণপণ শক্তিতে খন্তর উঠিয়া বসিল।—অর্দ্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল।—দেখিল, না সাপ নয়। একখানা চুড়ি-পরা হাত পায়ের উপর হইতে সরিয়া যাইতেছে!

খন্তর ত্রস্তে পা টানিয়া লইল। দু'হাতে ভর দিয়া, অর্দ্ধ-লম্ফে দূরে সরিয়া বসিল! উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল স্বরে বলিল "কে কে?"

প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার ঠাণ্ডায় গায়ে কাঁটা দিতেছিল, তবু তার মাঝে খন্তরের সর্ব্বাঙ্গে যেন কাল-ঘাম ছুটিতে আরম্ভ হইল! এই নির্জ্জনে,

গভীর রাত্রে···তাহার এত নিকটে সালঙ্কারা নারী! কে এ কাণ্ডজ্ঞান হীনা মূঢ়া? ·

নিরতিশয় বিরক্তি বোধ হইল।—এ কি নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ?

শুক্লা-চতুর্দ্দশার জ্যোৎস্না তখন ঢাকিয়া গিয়াছিল। পশ্চিমাকাশ হইতে ঘন কৃষ্ণ মেঘদল, একপাল ক্রুদ্ধ বন্য মহিষের মত ছুটিয়া আসিয়া মাথার উপর আকাশ জুড়িয়া, মত্ত-তাণ্ডবে ছুটাছুটি করিতেছিল। মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। ধরণীর বুকে প্রচণ্ড শব্দে গাছপালা ভাঙিয়া মচকাইয়া, ধূলা-বালি উড়াইয়া প্রমত্ত হুঙ্কারে ঘূর্ণি ঝড় বহিতেছিল।

চোখ মেলিয়া সেই অস্পষ্ট আঁধারে, ধূলা-ঝড়ের মধ্যে চাহিয়া দেখা দুঃসাধ্য। তবু খন্তর প্রাণপণে, বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে চাহিল। অস্পষ্টতা সত্ত্বেও স্পষ্ট বোধ হইল—সামনে এক নারী-মূর্ত্তি বসিয়া আছে।

নারী নীরব। কিন্তু তাহার অলঙ্কার-শিঞ্জন স্পষ্ট শোনা গেল।

মুহূর্ত্তে—চিক্ মিক্ করিয়া বার বার বিদ্যুৎ হানিল। নেশায় এবং ঘুমের ঘোরে দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্সা,—তবু স্পষ্ট মনে হইল নারীর অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখে জঘন্য হাসি, সাজসজ্জা দৃষ্টি বিভ্রমকারী নর্ত্তকী-জনোচিত—দেখিলে অশ্রদ্ধায় মাথা হেঁট হয়।

কিন্তু চিনিতে পারিল না, এ কে?

মুহূর্ত্তে খন্তরের মস্তিষ্কে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল! অনুতপ্ত চিত্তের মাঝে জাগিল,—সন্ধ্যার স্মৃতি!

সঙ্গে সঙ্গে মগ্নচৈতন্যের গভীরতর বিস্মৃতিস্তর ভেদ করিয়া, স্মৃতিপটে চমক হানিল,—এক বৎসর পূর্ব্বের কথা!···শনিচর তাহার শ্যালিকাকে বিবাহ প্রসঙ্গে আলাপ করিবার জন্য পাঠাইতে চাহিয়াছিল, নয়?···এটা কি শনিচরের সেই পরিহাস কীর্ত্তি?···খন্তর আজ নেশার খেয়ালে সাগার

প্রস্তাব করিয়াছে। সেইজন্য···কৌতুকচ্ছলে তাহাকে পাঠাইয়াছে কি ?··

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত ভাবিবা,—চিন্তাগতি সসম্মানে থামিল।···শনিচরের কাণ্ডজ্ঞান না থাকিতে পারে,—কিন্তু সে নারী ?··সে কি, এই গভীর রাত্রে, নির্জ্জনে সুষুপ্ত, নিঃসম্পর্কীয় যুবার শয্যাসন্নিধানে··আলাপ করিতে আসিবে ? এমন ঘৃণিত ইতর নারীর মত ? না, সে তত অধম কখনই নয় ! তাহার আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান নিশ্চয় আছে, আছে।

ঘৃণায় উদ্বেগে কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল। ঢোঁক গিলিয়া, ঈষৎ রুক্ষ-স্বরে বলিল—"কে তুমি ? কি চাও ?"

পরম ন্যাকামির সুরে উত্তর হইল "চেন না কি ?—কি চাই জান না ?"

অপরিচিত কণ্ঠস্বর, সন্দেহ নাই। তাহার কথার ভঙ্গীতে অধিকতর বিরক্ত হইয়া খন্তর বলিল "কোথাকার উল্লুক তুমি ? কাকে খুঁজছ ? আমি খন্তর।"

ছলনাময়ী আব্দারের সুরে উত্তর দিল—"তোমাকেই। বড় ঝড় উঠেছে, ঘরে চল।"

ঘরে যাইবে ? তবে সে রহিয়াছে কোথা ?

ঘুমের ঘোর এবং নেশার ঝোঁক এক সঙ্গে তীব্র ধাক্কা খাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিল ! ব্যাকুলদৃষ্টিতে খন্তর চারিদিক চাহিল।

ঝড়ের প্রকোপ সেই সময় ক্ষণেকের জন্য শান্ত হইল। পুনরায় বিদ্যুৎ চম্‌কাইল। খন্তর দেখিল, তাহারই আঙিনায় যুবকদের পরিত্যক্ত চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়া আছে। লাঠি লণ্ঠন কিছুই আজ কাছে নাই। জামার পকেটে হাত দিয়া দেখিল, দেশলাই আছে, ঘরের চাবিও আছে।

খন্তর আশ্বস্ত হইল। তৎক্ষণাৎ উঠিল। স্খলিতচরণে দাওয়ার দিকে চলিল। স্ত্রীলোকটির দিকে দৃকপাত করিল না। তাহার পরিচয়

জানিবার জন্য, প্রয়োজন জানিবার জন্য, কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিল না। পাছে নেশার ঝোঁকে রাগ বাড়ে, পাছে আরও কিছু কটূক্তি করে, সেটা ভয় হইতেছিল।

মনে পড়িতে লাগিল, সে নেশা করিয়াছে। হয়ত এখনও তাহার মস্তিষ্কে মত্ততাঘোর রহিয়াছে।· এ সময় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করিবার উপযুক্ত অবস্থা তাহার নয়। বিশেষতঃ উহাকে চেনেও না, উহার পরিহাস-স্পর্দ্ধার অর্থও বোধগম্য হইতেছে না। হয়ত নেশার খেয়ালে সব গোলমাল লাগিতেছে। স্ত্রীলোকটির কথা বুঝিতে না পারিয়া সে অনর্থক রাগ করিতেছে।

মনকে প্রবোধ দিল—স্ত্রীলোকটি হয়ত কাছাকাছি আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীর কেহ। খন্তরকে ঝড় হইতে বাঁচাইবার জন্য, দয়া করিয়া সদুদ্দেশ্যে জাগাইয়া দিতে আসিয়াছিল। নেশার ঝোঁকে খন্তর উহাকে চিনিতে পারিল না।·· যাক, কাল জানিতে পারিবে। রূঢ়তার জন্য ক্ষমা চাহিলেই চলিবে।

দাওয়ায় উঠিয়া মনে হইল—যেন কাহারা ও-ঘরের দুয়ারের কাছে চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। অন্ধকারে স্পষ্ট ঠাহর হইল না। একবার মনে হইল ডাকিয়া সাড়া লয়। আবার মনে হইল নেশার ঝোঁকে হয়ত ভুল দেখিতেছে। বৃথা চেঁচাইয়া লাভ নাই। তাহার বাড়ীতে ত কেহ শুইতে আসে না।

নিজের ঘরের চাবিটা আন্দাজে ঠিক করিয়া তালায় লাগাইল। তালা খুলিয়া গেল। ভিতরে ঢুকিয়া লণ্ঠনটা হাতড়াইয়া খাটের তলা হইতে বাহির করিল, জ্বালিল। ঘরের কোণে গাগ্‌রায় জল ছিল, ঘটিতে ঢালিয়া খানিক খাইল। খানিক মুখে চোখে মাথায় দিল! জড়তা ঘোর অনেকটা দূর হইল। মনে হইল আঃ, এতক্ষণে সুস্থ হইল!

মনে আবার অনুতাপ জাগিল,—হতভাগা ছোঁড়াগুলোর অনুরোধে নেশায় মজিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছে! ঝোঁকের মাথায় সাগার প্রস্তাব শনিচরের কাছে করিয়াছে। এখন সে ত্রুটি সংশোধনের উপায় কি?

ভাবিলে হাসি পায়! নেশার খেয়ালে হাতী কিনিতে চাহিয়াছে। কিন্তু হাতী লইয়া করিবে কি? না না, সংসার-পাতার বাসনা দূর করাই ভাল। সাময়িক মনশ্চাঞ্চল্যে অভিভূত হইয়া, চিরস্থায়ী ভুল সে করিবে না। শনিচরের শ্যালিকাকেও বহু ধন্যবাদ! খন্তরের সাময়িক মোহ-মত্ততার আবেদন সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। খন্তর উপকৃত হইয়াছে। ডাক্তার ঠিক বলিয়াছেন, বিষয়ভোগে শক্তিনাশ করা, ধর্ম্মার্থীর পক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতিকর!

বাহিরে ভয়ানক শব্দে ঝড় বহিতেছে। দুয়ারটা এক সময় সশব্দে আছড়াইয়া বন্ধ লইয়া গেল।

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। শব্দলক্ষ্যে চিত্ত সেই দিকে আকৃষ্ট হইল।··· তাই ত, দুয়ারটায় খিল বন্ধ করা হয় নাই!

আলো তুলিয়া খন্তর দুয়ারের দিকে পা বাড়াইয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। এ কি!···আবার সেই অপরিচিতা নারী!

ইহার মধ্যে সে কখন গৃহের ভিতর ঢুকিয়াছে। বন্ধ দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অধরে সেই কুৎসিত ছলনাময় হাসি।

ঘৃণায় খন্তরের শরীর শিহরিয়া উঠিল! নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ বোধ হইল! নেশার ঘোরে এখনও ভুল দেখিতেছে না-কি?

প্রাণপণ শক্তিতে মস্তিষ্ক স্থির রাখিবার চেষ্টা করিল। আলোটা তুলিয়া তাহার মুখের উপর আলোক-রশ্মি ফেলিল। চক্ষের জড়তাঘোর কাটিয়া গিয়াছিল। এবার নিঃসন্দেহে চিনিল!···কি পাপ!···এ যে গয়লাবুড়ীর সেই বোনঝি!

হাঁ, তাহার সাজ-সজ্জায় অসাধারণ রঙচঙের বিশেষত্ব! সর্ব্বাঙ্গে অস্বাভাবিক উত্তেজনা-চাঞ্চল্যের হিল্লোল! দৃষ্টিতে, হাসিতে,—রাক্ষসী-বুভুক্ষার তীব্র ঝিলিক্ হানিতেছে!

মনে পড়িল ইহার চরিত্রের কথা। ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে বাকী রহিল না। নির্লজ্জার স্পর্দ্ধা দেখিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য এই শ্রেণীর সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর রাগ হইল!...আঃ, নিপাত যাউক এই নরকের কীটগুলা!

ঘৃণাভরে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া খন্তর বিরক্তি-রূঢ় স্বরে বলিল "এখানে কি মনে করে? কার সঙ্গে এসেছ?"

"তা কি জান না?"

"না, জান্‌তে চাই না। এত অধঃপাতে গেছ! ছিঃ! যাও, এখনি চলে যাও।"

নির্লজ্জ আব্‌দারমাখা সুরে উত্তর হইল "এত ঝড়ে যাই কি করে? —না, আমি যেতে পার্‌ব না। এইখানে থাকব।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া খন্তর বলিল "এসেছিলে কি করে?"

বিলোল কটাক্ষ হানিয়া, নারী ঘাড় মাথা দুলাইয়া সাহ্লাদে বলিল "তুমি ডেকে পাঠিয়েছিলে যে। ভুলে গেছ না-কি?"

কঠোর গর্জ্জনে খন্তর বলিল "কক্ষণো নয়।"

প্রচণ্ড ক্রোধে আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল! এত বড় মিথ্যাপবাদ তাহার নামে! সে নেশা করিয়া নিজের বাহুশক্তিকে কিছুক্ষণের জন্য বেদখল করিয়াছিল বটে। কিন্তু তাহার মন এত ইতর, এত হীন নয়,— যে একটা ভ্রষ্টা নারীর সঙ্গ কামনা করিবে! উহাদের কুৎসিত সংস্রব সে চিরদিন মর্ম্মান্তিক ঘৃণার চক্ষে দেখে। তবু এত বড় দুঃসহ স্পর্দ্ধার বাণী!

চরিত্র—যাহার কাছে যত অবহেলার বস্তু হউক, খন্তরের কাছে উহা

সর্ব্বপ্রধান,—সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সম্মানের বস্তু। এক শ্রেণীর ধনীরা, না-কি অর্থবলে চরিত্র কেনা-বেচা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মও না-কি অর্থবলে ক্রয় করা যায়। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, খন্তর দরিদ্র। চরিত্র-রক্ষা সম্বন্ধে, তাহার জীবনে পরম আশীর্ব্বাদ—এই দারিদ্র্য। চরিত্রগত পবিত্রতাই তাহার জীবনের গৌরব-মুকুট, তাহার হৃদয়ের সব শক্তির মূল উৎস,—তাহার ধর্ম্ম-সাধনার প্রাণশক্তি। সে চরিত্র-মর্য্যাদায় যে মিথ্যা কলঙ্কক্ষেপ করে, তাহাকে বিনাবাক্যে হত্যা করিতে খন্তরের ইচ্ছা হয়!

তবুও স্মরণ হইল,—হউক মিথ্যাবাদিনী, হউক ভ্রষ্টা, তবুও…নারী। শারীরিক দণ্ড দিবার জন্যও ইহার অঙ্গ স্পর্শ করা ঘৃণার বিষয়। না, নিজেকে অত বড় অপমানে অপমানিত করিতে পারিবে না।

আর,—বেশ্যার, লম্পটের প্রধান অস্ত্রই ত—ছলনা, কাপট্য! উহার আচরণে যতই ঘৃণা হউক,—রাগিলে চলিবে না।

ক্রোধ দমন করিয়া খন্তর দৃঢ় আদেশের স্বরে বলিল "রাগিও না আমায়, আমি ভয়ানক বদ্‌রাগী। মিথ্যা কথা শুন্‌লে আমায় জ্ঞান থাকে না। যা করেছ, করেছ। এই মুহূর্ত্তে ঘর থেকে বেরোও।"

নারী দমিয়া গেল। ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "নেশা করে বাইরে পড়েছিলে। অমন আঁধি-ঝড় মাথার উপর দিয়ে বইছিল। জাগিয়ে দিয়ে উপকার করেছি ত? কিছু বকশিস দাও।"

খন্তর সাগ্রহে বলিল "দেব। কাল সকালে মাসির সঙ্গে এস। এখন যাও।"

নারী নীরবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। গেল না।

তাকের উপর একটা ছোট টাইমপিস্ ছিল। খন্তর আলো তুলিয়া সেটার দিকে চাহিল। দেখিল রাত্রি সাড়ে তিনটা।

দপ করিয়া মনে পড়িল ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিতেছে! স্নানাদি করিয়া পূজায় বসিলেই ত চলে!—সময় নষ্ট করা বৃথা।

অধীর হইয়া বলিল "দাঁড়িয়ে কেন? যাও, যাও।"

মধুর হাস্যরঞ্জিত মুখে, আবদারভরা সুরে নারী বলিল "একটা কথা মিস্ত্রীজি,—শুনবে?"

অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া খন্তর সজোরে বলিল "না, তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। চলে যাও।"

অনুনয়ের সুর ধ্বনিত হইল "যাচ্ছি, তবু বলি। তোমারও স্ত্রী নেই,—আমারও স্বামী নেই।—থেকেও নেই—"

"তা কি করতে হবে?··· ছ্যাচড়া কীর্ত্তন? উচ্ছন্নে যাও! না—ও-সবের মধ্যে আমি নেই।"

"কিন্তু···কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবেসেছি।"

"শিয়াল কুকুরেও হাড়মাংস চিবিয়ে খেতে ভালবাসে। সে ভাল-বাসার কোন খাতির আমার কাছে নাই। যাও বাছা, ভক্ত কোর না।"

প্রবল আবেগোত্তেজিত কণ্ঠে নারী বলিল "বোল না, বোল না। তোমায় না পেলে আমি মরে যাব।"

প্রাণপণ শক্তিতে মস্তিষ্ক শান্ত রাখিয়া খন্তর সংযত স্বরে বলিল "তোমার মত অসংযমী, অপদার্থ, মেয়ে-পুরুষেরা, কুৎসিত বাসনার বিষে ত মরেই আছে। মুখের কথায় শাসাচ্ছ কাকে? আমি কাযের মানুষ, কায দেখতে চাই। বুঝলে?...রেললাইন পাতাই আছে, যাও। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও—"

"তোমার দেখছি মিস্ত্রীজি। বড় সুপুরুষ তুমি—"

তীব্রস্বরে খন্তর বলিল "ধকামো কোর না, বেরোও। স্ত্রীলোক তুমি,

নইলে লাথি মেরে দূর করে দিতাম। যাও, পাড়ার লোকজন এখনও ঘুমুচ্ছে, পালাও এই বেলা। বদনামের ভয় ”

নারী সাহ্লাদে হাসিয়া বলিল “ওগো তাই রটুক, বদনাম। বাঁচি তাহলে। তোমার সঙ্গেই ত? সে ত আমার ভাগ্যি।”

মদিরালস মোহন কটাক্ষ হানিয়া নারী পুনশ্চ বলিল “না—আমি যাব ...। লাথিই নার ঝাঁটাই সার। আমি থাক্‌ব।”

ওঃ! নারীই হউক, নরই হউক,—অধঃপতনের পথে নামিলে, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়ের মাথা খাইয়া সে এমনই হীন পশুত্বে উপনীত হয়! কি বীভৎস এই অবস্থা! কি দারুণ মানসিক ব্যাধি!

ঘৃণায় খস্তরের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ক্রোধ অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। রূঢ় গর্জ্জনে বলিল “তাহলে তোমায় খুন করে, তার পর অন্য কথা!”

বলিতে বলিতে সে উত্তেজিত হইয়া খাটের তলা হইতে সত্যই অস্ত্রের বাক্সটা টানিয়া বাহির করিল। ভিতরে যন্ত্রগুলা সশব্দে বাজিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তে নারী মহা ভয় পাইল। আতঙ্ক-ব্যাকুল স্বরে বলিল “যাচ্ছি যাচ্ছি, থাম। তুমি এমন মানুষ, তা ত জানি না। মাপ কর।”

তাড়াতাড়ি ফিরিয়া সে দুয়ার খুলিতে গেল। কিন্তু দুয়ার খুলিল না। টানাটানির পর বোঝা গেল,—বাহির হইতে কে শিকল লাগাইয়া দিয়াছে!

সভয়ে সে খস্তরের মুখপানে চাহিল।

খস্তর বুঝিল, অতঃপর এ হতভাগিনীর আর দোষ দেওয়া চলে না। পিছনে কাহারা চক্রান্ত করিয়া এই কুৎসিত ব্যাপার ঘটাইতে চাহিতেছে।

মনে পড়িল—এ পল্লীর উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের কাছে এরূপ সব ব্যাপার নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান। আরও মনে পড়িল সেই হতভাগ্য কুকুরদের

জনকতককে সে সম্প্রতি প্রশ্রয় দিয়া মাথায় তুলিয়াছে। তাহাদের সহিত ভাং খাইয়াছে, নিজের বাড়ীতে তাহাদের যথেচ্ছ সঙ্গীতালাপ করিতে দিয়াছে।... এখন সে দুর্ব্বুদ্ধির উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে বই কি! অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ, ইহা ত প্রসিদ্ধ প্রবাদ।

ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া খন্তর ক্রোধ-বিক্ষিপ্ত চিত্ত সংযত করিয়া লইল। তার পর শান্তভাবে বলিল "তোমায় কে ডেকে এনেছিল, বল ত?"

মুখে ঘোমটা টানিয়া নতমুখে সে অস্ফুট স্বরে বলিল "আমি তাকে চিনি না।"

স্ক্রু-ড্রাইভারটা বাক্স হইতে তুলিয়া লইতে লইতে খন্তর অধিকতর ধীরভাবে বলিল "খুব চেন। না হলে তুমি আস্‌তে সাহস কর্‌তে কি? আচ্ছা, সরে দাঁড়াও। আমি কপাট খুলে দিচ্ছি।"

ক্ষিপ্রহস্তে দুয়ারের কব্জার স্ক্রুগুলা খুলিয়া ফেলিল। দুয়ার খুলিয়া আলো হাতে লইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল—কেহ কোথাও নাই।

স্ত্রীলোকটির উদ্দেশে বলিল "যাও বাছা, তারা বাইরে তোমার জন্যে কোথাও অপেক্ষা কর্‌ছে নিশ্চয়। ঝড় কমে গেছে, চলে যাও। ভগবান করুন, তোমার সুমতি হোক। তাদের বলে দিও, এমন নষ্টামি কর্‌লে আমি কারুর খাতির রাখ্‌ব না। হাতুড়ির ঘায়ে সব উল্লুকের মাথা গুঁড়িয়ে দেব।"

স্ত্রীলোকটি বিনাবাক্যে নতমুখে আঙিনার ভগ্ন প্রাচীর ডিঙাইয়া বাহিরে অদৃশ্য হইল।

খন্তর ঘরে আসিয়া পুনরায় দুয়ারের স্ক্রুগুলা আঁটিতে বসিল।

ভোরে তাহার বৃদ্ধ ভৃত্য কায করিতে আসিয়া দেখিল খন্তর ইতোমধ্যে স্নানপূজা শেষ করিয়াছে। জামা জুতা পরিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। বৃদ্ধ বলিল "কোথা যাচ্ছ বাবা?"

চিন্তাকুল মুখে বিমর্ষভাবে খন্তর বলিল "আমায় দারুণ কুগ্রহ ধরেছে বাবা। নানা উৎপাতে মন বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। আজও চতুর্দ্দশী খানিকক্ষণ আছে। চণ্ডীপাঠ করাতে, পাহাড়ে সাধুবাবার কাছে চল্লুম।"

"ফিরবে কখন?"

"সন্ধ্যা নাগাদ। চাবি নাও। গোয়ালের, রান্নাঘরের কায সেরে সুমারের কাছে চাবি দিয়ে যেও।"

প্রস্তানোদ্যত হইয়া খন্তর পুনরায় বলিল "হাঁ, আজই জনকতক মজুর ঠিক করে রাখ। পার ত বিকালের দিকে কাদা করিয়ে রেখ। কালই আঙিনার পাঁচীল মেরামত করা চাই।"

খন্তর প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর, দোকান হইতে রাত্রের খাওয়ার পাট চুকাইয়া খন্তর শ্রান্তপদে যখন পল্লীতে ঢুকিল, - তখন ঘরে ঘরে সন্ধ্যার দীপ জ্বলিয়াছে। সারাদিনের হোলির উৎসব-মত্ততার পর অবসাদ-ক্লান্ত নরনারীর দল তখন নীরব নিঝুম হইয়াছে। যে যার ঘরে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতেছে।

লাঠিটা ঘাড়ের উপর শয়ন করাইয়া, তার দুই পাশে পেশী-সবল হাত দুটা ঝুলাইয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া খন্তর নিজের বাড়ীর কাছে পৌঁছিল এবং আঙিনায় পা দিয়া সহসা চম্‌কাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

জ্যোৎস্নালোকে দেখিল আঙিনায় তিন চার খানা খাটিয়া পাতা হইয়াছে। সুমারের পিতা প্রভৃতি পল্লীর গণ্যমান্য মাতব্বরগণ সকলে জড় হইয়া, অতিশয় ধীর গম্ভীর ভাবে কি সব আলাপ আলোচনা করিতেছেন। তাহাদের দলের মধ্যে রহিয়াছে সুমার, শনিচর এবং তাহার নিজের ভাই জয়পাল।

"কে রে খন্তরা?"— সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

"জাঁ, হাঁ।" -বলিয়া খন্তর কুন্ঠিত হইয়া গুটি গুটি চরণে নিকটে আসিল। ঘাড়ের লাঠি নামাইয়া প্রথমে গুরুজনদের, পরে ভাইকে, যথারীতি 'গোড় লাগি' অভিবাদন জানাইল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া সসঙ্কোচে বলিল "তুমি কখন এলে?"

ভাই স্থির দৃষ্টিতে খন্তরের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিতেছিল। একটু দুঃখের সহিত বলিল "বেলা এগারটার সময় এসেছি। সেই থেকে তোর জন্যে বসে আছি। চণ্ডীপাঠ হোল?"

একটু লজ্জিত হইয়া খন্তর বলিল "হোল। তুমি আসবে আগে জানাও নি কেন? তাহলে আজ ঘরেই থাকতাম। সেখানে ছেলেরা সব ভাল আছে?"

"হাঁ। তোর শরীর কেমন আছে?"

খন্তর মাথা চুলকাইয়া বলিল "মন্দ নয়। তোমার ওবেলা খাওয়া দাওয়ার কি হোল?"

সুমারের পিতাকে দেখাইয়া ভাই বলিল "চাচার বাড়ী খেয়েছি।"

"তা হলে এবেলা? দোকানে টাটকা খাবার তৈরী হচ্ছে, কিনে আনি এই সময়।"

শনিচর ধমক দিয়া বলিল "রাখ রাখ! খুব জ্যাঠামো শিখেছিস্। এবেলা আমার বাড়ীতে খাবার হচ্ছে, তুই শুদ্ধ খাবি চ!"

সবেগে মাথা নাড়িয়া খন্তর বলিল "আমি? না, না, এই মাত্র আমি দোকান থেকে খেয়ে আসছি—"

"হলেই বা। আর একটু রাত্রি হোক, যা পারিস্ দুখানা খেয়ে আস্‌বি।"

"আরে না না। সমস্ত দিনের উপবাসের পর ক্ষিদের মুখে আমি খুব খেয়েছি। আর পারব না। আজ মাফ কর ভাই।"

শনিচর এবং সুন্নার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া সকলের অলক্ষ্যে মুচকি-হাসি হাসিল। সে হাসি খন্তর লক্ষ্য করিল। গত রাত্রে শনিচরের বাড়ী গিয়া নেশার ঝোঁকে যে কাণ্ড করিয়াছে তাহা মনে পড়িল। মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

জামা জুতা ছাড়িবার অছিলা করিয়া খন্তর গিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিল "ভেইয়া, তুমি কি আজ রাত্রের গাড়ীতে শুজতি ফিরবে?"

ভাই উত্তর দিল "না। কালও আমি থাকব।"

তার পর সে বৃদ্ধদের সহিত নিম্নস্বরে আবার কি পরামর্শ করিতে লাগিল।

জামা জুতা ছাড়িয়া হাত পা ধুইয়া, খন্তর আসিয়া দাওয়ায় দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিয়া সকলে সহসা চুপ করিল।

খন্তরের মন অস্বস্তি-পীড়িত হইয়া উঠিল। ইহাদের কাছ ঘেঁষিতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল তাহার সম্বন্ধেই কিছু একটা আলোচনা চলিতেছে। নিজে গোলযোগ পাকাইয়া রাখিয়াছে। —শনিচরও সশরীরে সম্মুখে বর্ত্তমান। এ সময় উহাদের বেশী কাছে যাইতে সাহস হইল না। দাওয়ার প্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

বৃদ্ধদের একজন খন্তরকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন "তা হলে জয়পাল, এই শনিবারেই খন্তরার সাগার দিন ঠিক হোল ত?"

জয়পাল বলিল "হাঁ, আর দেরী করবার সময় নেই, সামনে চৈত্র মাস। আজ মঙ্গলবার, মাঝে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, এই তিনটে দিন। তোমরা সব যোগাড় যন্ত্র করে ফেল চাচা। তোমাদের উপর সব ভার।"

শুধু প্রস্তাব মাত্র নয়,—একেবারে দিন স্থির পর্য্যন্ত! খন্তর আড়ষ্ট স্তব্ধ!—এ কি ভয়ানক কর্ম্মভোগ!

মনে পড়িল আজ পাহাড়ে সাধুটির দ্বারা চণ্ডীপাঠ করাইবার পূর্ব্বে পূজায় বসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, যে কোন প্রণালীতে হউক, আন্তরিক নিষ্ঠায় ঈশ্বরারাধনার ফল কখনও ব্যর্থ হয় না। উহা সকাম ভাবে করিলে কামনা সিদ্ধ হয়, নিষ্কামভাবে অর্চ্চনা করিলে নির্ব্বাণ লাভ হয়। খন্তর প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়াছিল নিষ্কাম চিত্তে অর্চ্চনা করিবার জন্য। কিন্তু অজ্ঞাতেই চিত্তপটে বার বার কাহার স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল! দুর্ব্বল হৃদয় কামনার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ভিন্ন পথে ছুটিয়াছিল! নিষ্কাম অর্চ্চনা ব্যর্থ হইয়াছে!

না, দোষ কাহারও নাই। মহামায়ার বিচার নির্ভুল! বিবেকের বিরুদ্ধে মন যাহা চাহিয়াছিল, তাহাই ত ফলিতে চলিয়াছে!—ইহার পর পার্থিব দুঃখ ক্লেশ, সাধন-ভজনের ক্ষতি,—আত্মিক শক্তিহানি, যাহাই ঘটুক, সহ্য করিতেই হইবে!

জয়পাল বলিল "বুঝেছিস্ খন্তরা, শনিচরের বহুর বহিনটির সঙ্গে তোর সাগার ব্যবস্থা ঠিক করলুম। এর পর আর মত বদ্‌লাস্ নি! ঢের জ্বালাতন করেছিস, এবার ভালয় ভালয় কাব শেষ কর্‌তে দে।"

সুমারের পিতা শাসাইয়া বলিলেন "না দিলে খন্তরাকে ছাড়ছে কে? এর পর খন্তর মত বদ্‌লালে কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। স্পষ্ট বলে দিচ্ছি জয়পাল, তাহলে তোমার ছেলে মেয়ের বিয়েতে,—তোমাদের কোন কাযে, কোন কথায় জ্ঞাতি গোত্র কেউ আর দাঁড়াবে না। আর খন্তরা কি এতই লায়েক হয়েছে যে, ওর হিতাহিতও আমাদের চেয়ে বেশী বুঝ্‌বে? যতই রোজকার করুক, যতই স্বাধীন হোক, তবু আমাদের কাছে ও সেদিনের ছেলে। বাপ চাচার কথা মান্‌বে না কি? মানতেই হবে!"

বৃদ্ধেরা তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন "কথাই ত!"

খন্তরা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। মনে হইল এই ঠিক শাস্তি!

—যাক, 'জনসাধারণের বাণী ঈশ্বরের আদেশ' বলিয়া মানিয়া লওয়া হউক ; এবং ইহার পর হাত পা ছাড়িয়া অদৃষ্টস্রোতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় কি ?

জ্ঞাতি-ভোজনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতে লাগিল। খন্তর কোন কথায় কর্ণপাত করিল না, গালে হাত দিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরে যাইতে যাইতে বলিল "শনিচর, বাড়ীর জন্যে প্রসাদ নিয়ে যা।"

শনিচর ঘরে গেল। পাগড়ির প্রান্ত হইতে প্রসাদী চিনি ও পেঁড়ার ঠোঙা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া খন্তর বলিল "ওদের সকলের ঘরে একটু একটু পাঠিয়ে দিস্।"

তার পর শনিচরের মুখের দিকে অনুযোগ-করুণ কটাক্ষপাত করিয়া নিম্নস্বরে বলিল "আমিই না হয় নেশার ঝোঁকে তার দুঃখে কেঁদে কোকিয়ে মাংলামি করেছিলুম। কিন্তু তোর মনে এই ছিল ?"

"ছিল-ই ত।"—শনিচর হাসিল।

"সে কেন রাজী হোল ? এদের পীড়াপীড়িতে, নয় ?"

শনিচর বিপন্নভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "পীড়াপীড়ি আর এমন কি ? দুপুর বেলা তাকে ডেকে এনে সবাই বোঝালে, তোর ভাইও বল্‌লে। সে রাজী হোল, আর কি ?"

"অন্যায় কর্‌লে। শোন, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, ঝেড়ে জবাব দিতে বলগে।"

ব্যঙ্গ ভরে শনিচর বলিল "আমার কথা চলবে না। কি করি ভাই, আমায় সে মোটে পছন্দ করে না। নইলে আমিই সাগা করে তাকে ঘরে তুল্‌তাম। এখন চোখ কাণ বুজে তুই ঘরে আন। তার পর ধীরে সুস্থে সব শিখিয়ে দিস্।"

নেশার ঝোঁকে মত্ততার আবেগে বিপন্না নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া খন্তর কথাটা মুখে উড়াইয়া দিতে চাহিল বটে, কিন্তু মনে মনে স্বীকার করিল মনের যে গুপ্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ঢাকিবার জন্য সে বৃথাই মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে! এ কপটতা তাহার ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে হানিকারক। তাহার অস্থিরমতিত্ব এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। মন যাহার প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হইযাছে,—হউক মনের এ মোহ অস্থায়ী বা দীর্ঘ কালস্থায়ী,—তাহাকে বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য গুরুজনগণ যখন শুধু নির্দ্দেশ করিয়া মাত্র ক্ষান্ত নন, সেই নারীকে জানাইয়া আযোজন পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন, তখন আর আপত্তি না করাই ভাল।

তা ছাড়া, ঠিক ভাবে চলিতে পারিলে, স্ত্রীর দ্বারা সাধন-জীবনে সে যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারে। কিন্তু যদি না পারে?

তাহা হইলে-ই যে বিপদ! আশঙ্কা যে সেইখানে!

বিবেক যেন অন্তরে অন্তরে ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করিল—তাই ঘটা সম্ভব! এ স্ত্রীর দ্বারা বিবাহিত জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্যের চরিতার্থতার আশা, দুরাশা মাত্র!

মন 'মোরিয়া' হইয়া বলিল হউক দুরাশা! তবু আশা করিতে কে ছাড়ে? তা ছাড়া, এখন আর পিছাইবার পথ কই? গুরুজনদের আদেশ! এ-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিবার মত বুকের বল আর কই?

ক্ষণেকের জন্য গুম্ হইয়া ভাবিয়া খন্তর ম্লানহাস্যে বলিল "তাই শেখাব। তার পর যা তার আর আমার অদৃষ্টে আছে, তাই ঘটবে।"

বলিয়া সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। তার পর একটু নীরব থাকিয়া বলিল "একেই বলে কর্ম্মফল! যাক্, ও কথা। হ্যাঁ রে, আমি ত কাল নেশার ঘোরে বে-এক্তার হয়ে পড়েছিলুম। তোরা কোন আক্কেলে ও টাকে এখানে পাঠালি?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া শনিচর বলিল "নন্কুকে? গণ্পতিকে? ওরা নিজেরাই ত তোর কাছে থাক্‌তে চাইলে। ওই দাওয়ায় ওরা শুয়ে রইল। বল্‌লে নেশা কাট্‌লে তোকে ঘরে তুলে দিয়ে যাবে। যায় নি?"

"হুঁম্! নন্কু? গণপতি? আচ্ছা, তুই শূয়ারকে মনে রাখ্‌ব। সুনার ছোড়াকে ডাক ত এখানে। বল্, রান্নাঘরের চাবি দিয়ে যা।"

শনিচর সুনারকে ডাকিল। সুনার ঘরে আসিল। শঙ্কর তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "আজও ভাং খেয়েছিস?"

মুচকি হাসিয়া সে বলিল "খেয়েছি একটু। হোলির দিন। তুই খা' একটু।"

নিজের ডান কানটা মলিয়া শঙ্কর বলিল "আর নয়। আজ পাহাড়ে উঠ্‌বার সময় টের পেয়েছি, নেশায় হৃদ্‌পিণ্ড কতখানি জখম হয়! তোর কথা তখন মনে পড়্‌ল। শোন সুনার, ও বিষ আর খাস নি। আর যা বলে দিয়েছি, মনে আছে ত?"

শনিচরের দিকে চাহিয়া সুনার শশব্যস্তে বলিল "আছে, আছে। চাবি নে।"

"বাচ্চা দুটো কেমন আছে?"

"ভাল আছে।"

"ওদের মা?"

"এখন ত ভালই মনে হচ্ছে।"

সহসা সুনারের ঘাড় ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিয়া শঙ্কর ঈষৎ তীক্ষ্ণ

স্বরে বলিল "ননকু তোর বড় পেয়ারের দোস্ত নয় ? মিশ্‌বি আর ও ছোঁড়ার সঙ্গে ? বল্‌ মিশ্‌বি কি-না ?"

নিজের ঘাড় ছাড়াইবার চেষ্টায় টানাটানি করিতে করিতে সুমার সলজ্জ হাস্যে বলিল "ননকু তোকে রাগিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া কর্‌। আমার উপর ঝাল ঝাড়ছিস্‌ কেন ?"

পুনশ্চ ঝাঁকানি দিয়া খন্তর বলিল "তুই ও দলে ছিলি ত ?"

সুমার সজোরে বলিল "গঙ্গা মাঈ 'কিরিয়া' আমি কিচ্ছু জানি না। আজ বিকালে খবর পেলুম, ননকু তোর ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে আজ হোলি খেল্‌তে পর্য্যন্ত বেরোয় নি। তুই পাহাড়ে গিয়েছিস শুনে সন্ধ্যার সময় চুপি চুপি আমার কাছে এসেছিল। যোড় হাত করে বল্‌লে "আমি না বুঝে দোষ করেছি। মিস্ত্রীজিকে মাফ কর্‌তে বল।"

খন্তর তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

শনিচর বিস্মিত হইয়া বলিল "কি করেছিল সে ?"

গম্ভীর হইয়া খন্তর বলিল "বাঁদরামি। ওই সব হতভাগা ছোঁড়াগুলোর রকম-সকম দেখ্‌লে আমার এত মন খারাপ হয়ে যায়, ইচ্ছে হয়, ওদের জীয়ন্ত কবর দিই। যা, শনিচর। ভাইকে খাইয়ে আন।"

শনিচর যোড় হাত করিয়া ব্যঙ্গ ভরে বলিল "সাধুজি, দয়া করে তুমিও চল। না খাও, শুধু বেড়িয়ে আস্‌বে।"

"না না না। ওখানে আমি যেতে পার্‌ব না। তোরা যা কর্‌ছিস্‌, নিজের ইচ্ছেয় কর। আমায় কেউ কিছু শোনাস্‌ নি।"

অতিশয় নম্রভাবে শনিচর বলিল "তাহলে আমরাই কেউ তোমার হয়ে বর সেজে গিয়ে সাগাটা করে আন্‌ব কি ?"

খন্তর বিষাদ ভরে হাসিল। কোন উত্তর দিল না।

শনিচর বলিল "বল সাধুজি—"

বিষণ্ণভাবে খন্তর বলিল "কি যে তোরা আমোদ করিস্ আমার ভাল লাগে না। আমার এখন কত ভাবনা যে ভাব্‌তে হচ্ছে, তোরা বুঝ্‌বি না।"

"একান্তই যাবি না? চল ভাই, চল।"

"না। ওখানে এখন নানা রকম কথাবার্ত্তা হবে। হয়ত তোরা তাকেও ওখানে এনে হাজির কর্‌বি। এই সব আয়োজন উদ্যোগের কথার মাঝে তার হয়ত স্বামী-পুত্রের কথা মনে করে চোখে জল আস্‌বে। আমার হয়ত স্ত্রী-পুত্রের কথা মনে করে, মন বিষিয়ে উঠ্‌বে! · সে বড় ভয়ানক শনিচর!"

বলিতে বলিতে দুই হাতে উদ্বেলিত বক্ষ চাপিয়া খন্তর খাটে বসিয়া পড়িল। আর কথা বলিতে পারিল না।

সুমার শশব্যস্তে বলিল, "যা যা ভেইয়া। তোরা সেখানে যা। খন্তরার গিয়ে কায নেই। এখন ওর মন ভাল নেই। এর পর সবই হবে, সব ভুলে যাবে। এখন,·· ও যা বল্‌ছে তাই ঠিক। তোরা যা।"

শনিচর বাহির হইয়া গেল।

পরদিন জয়পালের নির্দ্দেশ মত খন্তর পোষ্টাফিস হইতে তাহার সঞ্চিত টাকা বাহির করিয়া দিল। উৎসবের আয়োজন সুরু হইল। আঙিনার প্রাচীর মেরামত হইল। গুজন্তি হইতে জয়পালের বধূ পুত্র-কন্যাদের লইয়া আসিল।

যথাসময়ে যথানিয়মে সাগা করিয়া খন্তর নির্ব্বিঘ্নে বধূ ঘরে আনিল।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং জ্ঞাতি-গোত্র বন্ধু-বান্ধবের ভোজোৎসবের ব্যাপারে খন্তর কয়দিন এত ব্যস্ত রহিল যে, নিজের মনের দিকে তাকাইবার এতটুকু সময়ও পাইল না, সাহসও পাইল না। ভয় হইতে লাগিল, পাছে অসহিষ্ণু হইয়া কোন বিপরীত কাণ্ড ঘটাইয়া এই উৎসব-মত্ত লোকগুলাকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তোলে!

খন্তরের মত একজন গুণবান, স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র, উপার্জ্জনক্ষম যুবাব, স্ত্রী-পুত্রের শোক বুকে পুষিয়া বিপত্নীক জীবন যাপনের আড়ম্বর দেখিয়া যাহারা এতদিন প্রবল অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, তাহারা এবার পরম স্বস্তিবোধ করিল। ভোজ শেষে দম্পতীর কল্যাণ কামনা করিয়া আত্মীয় স্বজন প্রস্থান করিল। খন্তর নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজ মনে ম্লান হাসি হাসিল।

প্রথম মিলনোৎসবের রজনী আসিল। খন্তরের বন্ধু ঝমরু কোন সাহেবের ফুল বাগানে মালীর কায করিত। সাহেব সেই সময় কয়দিনের জন্য সস্ত্রীক স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। অতএব তাহার বাগানের ফুলগুলা ঝমরু ওয়ারিশান্ স্বত্বে একান্ত নিজস্ব বিবেচনা করিয়া প্রচুর পরিমাণে তুলিয়া, রাত্রে বন্ধুর গৃহে পৌঁছাইয়া দিল। বন্ধুর শোকাহত জীবনে নব-মিলনের সাফল্য কামনা করিল।

খন্তর অনেক রাত্রি অবধি বন্ধুদের লইয়া বাহিরে মাঠে বসিয়া রহিল। বন্ধুরা গাঁজা টানিয়া ভাং খাইয়া, নাচ-গান করিতে লাগিল। খন্তরকেও ভাং সেবনের জন্য অনুরোধ করিল, খন্তর দৃঢ় আপত্তিভরে মাথা নাড়িল—'না।'

বাড়ীর ভিতর মেয়েরা নববধূকে লইয়া মঙ্গলগীত গাহিল, আমোদ-প্রমোদ করিল। রাত্রি বাড়িয়া চলিল, ক্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া যে যার নিজের কুটীরে চলিয়া গেল। জয়পাল আঙিনায় খাটিয়া পাতিয়া শুইল। তাহার বধূ ছেলে-মেয়েদের লইয়া বড় ঘরে অন্য দিনের মত আশ্রয় গ্রহণ করিল। নববধূ খন্তরের শয়ন-কক্ষে একা রহিল।

জয়পাল খন্তরকে বার বার ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিল। খন্তরের আসিবার তাড়া দেখা গেল না। শেষে জয়পাল নিজেই ডাকিতে গেল। দেখিল গানের আসরের একপাশে তাহার স্বভাবতঃ বিষণ্ণ-চেতা ভাই

চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখে সেই চির-পরিচিত নীরব-ম্লান হাসি।

জয়পালের ইঙ্গিতে, লজ্জিত-অনিচ্ছুক খন্তরকে ঠেলাঠেলি করিয়া উঠাইয়া বন্ধুরা বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

শোবার ঘরে ঢুকিয়া খন্তর খিল বন্ধ করিল। গোলাপের উগ্র-মধুর সুবাসে ঘরের বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। শয্যার শিয়রে মোম-বাতি জ্বলিতেছে। উজ্জ্বল আলোর মাঝে চারিদিকে ফুলের মেলা সাজাইয়া, ফুলের মালা পরিয়া রঙীন কাপড় ও নূতন গহনাপরা বধূ শুইয়া ছিল। খন্তরকে দেখিয়া সসঙ্কোচে উঠিয়া, মুখের উপর ঘোমটা টানিল। শয্যার এক পাশে জড়সড় হইয়া বসিল।

খন্তর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বধূর দিকে চাহিল,—মনে পড়িল আর একজনের কথা! মনে পড়িল প্রথম জীবনের—প্রথম মিলন-রজনীর স্মৃতি! সে বধূ তখন নিতান্ত ভীরু বালিকা মাত্র। তাহার ভয় ভাঙাই-বার জন্য, তাহাকে দুই চারিটা কথা বলাইবার জন্য,—সেদিন তরুণ জীবনের উচ্ছ্বসিত আবেগে খন্তরকে কত চপলতার আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল!···

আজ আবার সেই ব্যাপারের পুনরভিনয়ের দিন?—

নাঃ, অত ধৈর্য্য আর নাই!

হৃদপিণ্ড বিদ্রোহভরে দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল! মন বিস্বাদ-তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল!—খন্তর সভয়ে তাড়াতাড়ি আত্মদমন করিল! নাঃ, বিধাতার চক্রে পড়িয়া এই নারীকে যখন পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তখন ইহাকেই সেই হারানো প্রেয়সীর আসনে বসাইতে হইবে। যে-কোন রূপে হউক, পূর্ব্ব-জীবনের স্মৃতি—নিজেকেও ভুলিতে হইবে, ইহাকেও ভুলাইতে হইবে!—ইহাকে আনন্দ দিতে হইবে, আশা দিতে হইবে,—

ইহাকে লইয়া নূতন করিয়া গার্হস্থ্য-জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে! বন্ধুরা বলিয়া দিয়াছে, অতীত স্মৃতি সব ভুলিবার, সব ভুলাইবার দায়িত্ব শুধু খন্তরের!

হাঁ, ভগবানের নামে ইহাকে যখন পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছে তখন স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করিবে বই কি! অপর সাধারণ মানুষের মত,—অতঃপর খন্তরও নিজের সুবিধার অনুকূল সুযুক্তি কুযুক্তিগুলা সব আবিষ্কার করিয়া লইবে বই কি!

কিন্তু—আজ মনস্তত্ত্বের মধ্যে কোথায় কি একটা দারুণ জটিলতা জাগিতেছে। বুক অজ্ঞাত বিষাদভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। মন আজ কোন আনন্দ-মত্ততায় যোগ দিতে পরাঙ্মুখ!

খন্তর নিঃশ্বাস ফেলিয়া, মাথার মুরেঠা এবং গায়ের জামা খুলিতে খুলিতে নিম্নস্বরে বলিল, "তোমায় অনেকগুলা কথা বল্‌বার আছে। কিন্তু আজ মনের অবস্থা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে। তোমারও বোধ হয় মন ভাল নেই। আজ সে সব কথা থাক। রাতও অনেকটা হয়েছে। ক'দিনের খাটুনিতে, রাত জাগায় শরীরও ভাল নাই। এখন ঘুমানো যাক্, কি বল?"

বধূ কিছু বলিল না। আঁচলের প্রান্ত হইতে গিঁট খুলিয়া কাগজে মোড়া কি একটা জিনিস বাহির করিল, খন্তরের হাতে দিতে গেল। খন্তর বলিল, "কি ও?"

বধূ নতমুখে অস্ফুট স্বরে বলিল, "বিশ্বনাথের প্রসাদী ফুল চেয়েছিলে সেদিন।"

সেদিন!—মনশ্চক্ষের সামনে সেদিনের স্মৃতি অস্পষ্টভাবে জাগিয়া উঠিল! উঃ, কি মোহের নেশাই সেদিন মনকে অকস্মাৎ মাতাল করিয়াছিল! আজ মনের সে অবস্থার কথা ভাবিতে বিজাতীয় লজ্জায়

ঘৃণায়—নিজেকে পদাঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে!···এই নারীকে সেদিন ভাল লাগিয়াছিল, উত্তম। দূর হইতে ভালবাসিয়া নিরস্ত থাকিলেই ত ভাল করিত। ইহাকে এত নিকটে আনিয়া, এত নিজস্বরূপে অধিকার করিবার কামনা দমন করাই উচিত ছিল।

যাক, বিশ্বনাথের প্রসাদী নির্ম্মাল্যের প্রতি সেদিন যে ভক্তির আকস্মিক প্রাবল্য জাগিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত পুরস্কারই মিলিয়াছে! বিশ্বনাথ ইচ্ছাময়, কিন্তু নির্ব্বোধ নহেন!

একটা অদ্ভুত শ্লেষের শীর্ণ হাসি শস্তুরের অধর-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। কিছু বলিল না, হাত পাতিয়া নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইল। তার পর জামার পকেটে সেগুলা রাখিয়া জামা ও মুরেঠা দেয়ালের আনলায় রাখিল।

একটা বিঁড়ি ধরাইয়া ঘরের মেঝেয় পায়চারি করিতে করিতে শস্তুর নতমুখে খানিক ভাবিল। দু-একবার মুখ তুলিয়া গভীর মনোযোগের সহিত বধূর মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিবার চেষ্টা করিল। মুখ দেখা গেল না। মাথায় কাপড় টানিয়া বধূ অত্যন্ত হেঁট হইয়া বসিয়া রহিল।

ধূমপান করিতে করিতে শস্তুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদুস্বরে বলিল, "প্রসাদী নির্ম্মাল্য তোমার কাছে সেদিন চেয়েছিলাম, মনে ছিল না। ওটা মনে করে রেখেছ দেখে খুশী হলাম। ওটা আজ আমায় দিয়ে উপকার করেছ। একটা ভাল কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছ। দেখ, ভগবানের নামের শপথ নিয়ে বিয়ে-থা অনেকেই করে। তা'পর তারা আমোদ-প্রমোদ, ঘর-সংসার, ছেলে-মেয়ে নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়ে,—যে ভগবান তখন তাদের জীবনের পক্ষে একটা অনাবশ্যক উপসর্গ সাব্যস্ত হন। তার পরিণাম বড় জ্বালাময়। ভগবানকে বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে চায়, সেটা ফাঁকির কারবার!"

পোড়া বিঁড়িটা দূরে ছুঁড়িয়া, খন্তর বধূর পাশে বসিল। অধিকতর মৃদুস্বরে বলিল, "স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাঝে যখনই তারা ভগবানের মঙ্গলময় শক্তি, আনন্দময় রূপ, প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পায়,—সমস্ত সম্ভোগের মধ্যে থেকে যখন স্থূল আসক্তির নেশা কাটিয়ে, ভগবানের ধ্যানে তাদের একাগ্র চিন্তা ঊর্দ্ধলোকে ছুটে যায়, সে চিন্তার পায়ের তলায় যখন ইন্দ্রিয়জ্ঞান আপনা আপনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে,—তখনই মিলন সার্থক! স্বামীও ধন্য, স্ত্রীও ধন্য। এর জন্যে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে চাই—কঠোর সংযম, পবিত্রতা। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার আছে। পরে বল্‌ব, কি বল?"

বলিতে বলিতে বধূর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া অন্য হাতে ঘোমটা খুলিয়া দিল। মুহূর্ত্তে অনুভব করিল, বধূর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে! মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার চক্ষু হইতে নিঃশব্দে অশ্রু ঝরিতেছে!

অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। ইহার জন্য মন প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কাভরে প্রস্তুত ছিল। মাঙ্গলিক ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠানের মাঝে খন্তর সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত ছিল। সাহস করিয়া একবারও বধূর মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই—পাছে কোন সময় তাহার চোখে জল দেখিতে হয়!

নিজের দুর্ব্বলতার জন্যও কম আতঙ্ক ছিল না। বিবাহের সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে খন্তর সর্ব্বদা যেন আসন্ন বিপদের সূচনা দেখিয়াছে। কেবল মনে হইয়াছে—তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইল! কেন যে এমন শঙ্কা বোধ হইতেছিল, বলিতে পারে না। হয়ত উহা মানসিক দুর্ব্বলতা, হয়ত উহা অহেতুক আশঙ্কা। কিন্তু হৃদয়ের গুরুতর বিষাদভার কোন যুক্তি-তর্কে দূর হয় নাই।

সসঙ্কোচে হাত টানিয়া লইয়া খন্তর দূরে সরিয়া বসিল। সন্তর্পণে মৃদু নিঃশ্বাস ছাড়িল। মনে পড়িল অতীতের কথা। একদিন নিজের

সন্তান-শোকার্ত্তা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে হইয়াছিল।— আজ ইহাকেও সান্ত্বনা দিতে হইবে। কিন্তু কি বলিবে?

মনে পড়িল,— সে নারীর কাছে খন্তর ছিল তাহার মৃত সন্তানদের পিতা! কিন্তু এ নারীর কাছে সে— কে?

ঘরের পুষ্পবাস সুরভিত বায়ুমণ্ডলী যেন হঠাৎ চম্‌কাইয়া উঠিল! শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিল ফুলদল ইহার মধ্যেই ম্লান নির্জ্জীব! বাতির আলো চক্ষে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

খন্তর বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। দুই হাতে বক্ষঃ ছাদিয়া নতশিরে পায়চারি করিতে লাগিল।

একটু পরে আবার আসিয়া বধূর পাশে দাঁড়াইল। বধূ তখনও নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। তাহার দিকে চাহিয়া মন করুণায় আর্দ্র হইল —অভাগিনী সন্তান-শোকার্ত্তা মাতা!

খন্তরের বুকের ভিতর শোকাহত পিতৃ-হৃদয় বেদনাভরে মোচড় দিয়া উঠিল। বক্ষঃ মথিত করিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

কিন্তু অধীর হইলে চলিবে না। বলপূর্ব্বক আত্ম-দমন করিতেই হইবে।

ঝরা ফুলের পাপ্‌ড়িগুলা বিছানা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে ধীরভাবে বলিল, "কেঁদ না। একটা কথা মনে রেখ,— এ পৃথিবীতে কেউ কারুর নয়। সুখ-শান্তি এ সংসারে যদি কোথাও থাকে, তবে তা একান্ত-ভাবে ভগবানের পায়ে আত্ম-সমর্পণে। আর কোথাও কিছু দেখি নাই। চুপ কর, শোও।"

বধূ এবার অশ্রুসিক্ত চোখ তুলিয়া হতবুদ্ধির মত খন্তরের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ কি বোঝা কঠিন। হয়ত সে ইহাই বলিতে চাহিল—'আমার ব্যক্তিগত বেদনাশ্রু তোমার ন্যায্য প্রাপ্য মিলনানন্দের

উৎসাহ নিবাইয়া দিল কি ? - এ ত্রুটি তুমি সহ্য করিলে কি ? বাঁধা গৎ' এর ভালবাসার প্রিয়ভাষা না বলিয়া বৈরাগ্য-কঠিন সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়া তুমি অসহায়া ব্যথিতা নারীর প্রতি এতখানি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে ! তোমার এতটা ধৈর্য্যের অর্থ কি ? আমার ধাঁধা লাগিতেছে !

কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিল না। শুধু আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিল।

শ্বস্তর শান্তভাবে বলিল "আমায় একটা বালিশ দাও ত।"

বধূ সরিয়া গিয়া বিছানা হইতে একটা বালিশ টানিয়া শ্বস্তরের দিকে সরাইয়া দিল।

বালিশটা তুলিয়া লইয়া শ্বস্তর বলিল, "আমি মেঝেয় ওই শতরঞ্জিতে ঘুমব। একা না থাক্‌লে আমার ঘুম হয় না। তুমি এখানে ঘুমাও।"

বধূ এবার অসঙ্কোচে দৃষ্টি তুলিয়া,—এক অদ্ভুত অপ্রসন্ন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখে শ্বস্তরের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

শ্বস্তর সে দিকে লক্ষ্য করিয়াও করিল না। নিজ মনে পুনরায় বলিল, "দু'জনের কারুর মনের অবস্থা ভাল নেই। এ সময় দিনকতক একটু দূরে দূরে থাকাই ভাল। তোমার মন সুস্থ হোক, তার পর আমার যা বল্‌বার আছে বল্‌ব। শোও।"

বধূ নতমুখে অস্ফুট স্বরে বলিল "তুমি এখানে থাক, আমি ওখানে যাচ্ছি।"

একটু হাসিয়া শ্বস্তর বলিল "না। তুমি এ বাড়ীতে নতুন মানুষ এসেছ। তোমার আজ ওইখানে থাকাই উচিত। শোও। আমি বাতিটা নিবিয়ে দিই।"

বধূ এবার বিনাবাক্যে শয়ন করিল। বাতি নিবাইয়া শ্বস্তর গিয়া মেঝেয় শয়ন করিল এবং অল্পক্ষণ পরে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

নূতন স্থানে বধূর অনেকক্ষণ ঘুম হইল না।

ভোরের আলো ফুটিল; কাক-কোকিলের ডাক শুনিয়া শ্বশুরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। আলস্য ভাঙিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিল—বধূ অদূরে দেয়ালে ঠেস দিয়া মোহাবিষ্টের মত বসিয়া আছে। তাহার তৃষিত-ব্যাকুল দৃষ্টি শ্বশুরের মুখের প্রতি ন্যস্ত।

শ্বশুর উঠিয়া বসিল। ঘুম চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল "রাত্রে ঘুমতে পেরেছিলে ত? না, নতুন জায়গায় এসে ভাল ঘুম হয় নি?"

বধূ নতমুখে সংক্ষেপে উত্তর দিল "হয়েছিল।"

শ্বশুর মৃদুহাস্যে বলিল "তোমায় এক এক সময় ভয়ানক নির্ব্বোধ মনে হয়। অমন বোকার মত চেয়ে থাক কেন?"

বধূ নিরুত্তর রহিল। শ্বশুর তাহার মাথাটা ধরিয়া স্নেহভরে একটু নাড়া দিয়া, নীরবে বাহির হইয়া গেল।

১৮

তার পর কয় দিন কাটিল।

দেহযাত্রা নির্ব্বাহের এবং পারিবারিক জীবনের নানা তুচ্ছ বৃহৎ প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া উভয়ের প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ কতকটা কাটিয়া গেল। শ্বশুর বধূকে স্নেহযত্ন করিল, তাহার সুখসুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিল। নিভৃত বিশ্রান্তালাপের অবকাশে তাহাকে ক্রমাগত শুনাইল,—নশ্বর জীবনের অনিত্যতা; ধর্ম্মজীবনের উন্নতির কৌশল; সাধন-ভজনের উপকারিতা, এবং গৃহী-জীবনে সৎ-সন্তান সৃষ্টির জন্য দম্পতির দৈহিক ও মানসিক সংযম পবিত্রতা সম্বন্ধীয় নানাবিধ লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় উপদেশ।

বধূ নীরবে সব শুনিল, নীরবে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কি বুঝিল—কি না বুঝিল, তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না।

ক্রমে খন্তর লক্ষ্য করিল বধূ এ সকল আলোচনায় বিরক্তি-চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। নিরুৎসাহ হইয়া বলিল "তোমার কি এ-সব কথা ভাল লাগছে না?"

বধূ অপ্রসন্নভাবে বলিল "রাত দিন এই সব কথা নিয়ে থাক্‌তে তোমার ভাল লাগে?"

"হাঁ, লাগে। কেন না এতে জীবন-গঠনের সহায়তা করে।"

হঠাৎ বধূ বলিল "আমাকে তোমার একটুও ভাল লাগে না, নয়?"

স্মিত মুখে খন্তর বলিল "ভাল লাগে বলেই ত তোমার কাছে এই সব কথা বল্‌ছি। যদি তোমায় ভাল না লাগত, তাহলে তোমার কাছে এ-সব মনের কথা বল্‌তাম না।"

অধীরভাবে বধূ বলিল "তোমার মন যে কেমন, তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছ কিন্তু মনে হচ্ছে, তোমার মন যেন অন্য কোথাও পড়ে রয়েছে।"

শান্ত ধীরভাবে খন্তর উত্তর দিল "তাই ত রাখবার চেষ্ট করছি। সকল কাযের মাঝেও যদি মনটা ভগবানের পায়ে সর্ব্বদা ফেলে রাখ্‌তে পারি, তাহলে ত এ যাত্রা বেঁচে যাই। তুমিও সেই চেষ্টা কর।"

অপ্রসন্নভাবে বধূ বলিল "আমি তোমার মত সাধু নয়। আমার রক্ত-মাংসের শরীর।"

ক্ষণেকের জন্য গুম্ হইয়া থাকিয়া খন্তর অধিকতর ধীরে বলিল "কিন্তু রক্ত-মাংসের শরীরের মায়ায় মনকে জড়ীভূত করে রাখা মানুষের মানসিক সুস্থতার লক্ষণ নয়। জ্ঞানীরা বলেন, ওতে প্রাণশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

হয়। বেশী বাড়াবাড়ির ফলে শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করা হয়। তার প্রমাণ ত চোখের সামনে সর্ব্বদা দেখ্‌ছি।”

শ্বশুর এ প্রসঙ্গটা বিশদভাবে বুঝাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে বধূ সহসা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল “দেখ, আমার সে স্বামীটি বড় দুশ্চরিত্র ছিল। তার পাপেই তাই—আমার ছেলেগুলো অসময়ে মারা গেল।”

বাধা দিয়া শ্বশুর বলিল “আঃ, ও-সব কথা কেন আর মনে কর্‌ছ? ও-সব ভুলে যাও। রাত হয়েছে, ঘুমোও গিয়ে। কিম্বা বস আর একটু। মনের শান্তিটা নষ্ট করে ফেল্‌লে। একটু তুলসীদাসের দোঁহা পড়ি, শোন।”

শ্বশুর পড়িতে লাগিল। বধূ অদূরে বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া শুনিতে লাগিল। তীব্র বৈরাগ্যভরা গভীরতর ভগবৎপ্রেম-নির্ভরতা, গভীরতম আশ্বাসপূর্ণ শান্তি বাণী, পড়িতে পড়িতে শ্বশুরের চক্ষু হইতে জল ঝরিল, বধূও ভূত-ভবিষ্যৎ ভুলিয়া শ্বশুরের মুখপানে চাহিয়া কাঁদিল। শ্বশুর বহি বন্ধ করিয়া বলিল “যাও। এবার গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর। মনটা আগাগোড়া বদলে ফেল। যা হয়ে-রয়ে গেছে, সে কথা আর মনে আস্‌তে দিও না। যা হওয়া উচিত, তার জন্য চেষ্টা কর। মনকে শান্ত কর। তোমার মনঃস্থির হোক, বুদ্ধির উন্নতি হোক, তার পর নারায়ণের ইচ্ছা হয় ত সংসারে ছেলে মেয়েদের সৃষ্টি কোর। নইলে তাদেরও অমঙ্গল, তোমারও শাস্তি।”

বধূ নতমুখে উঠিয়া নিজের শয্যায় গেল। শ্বশুর বাতি নিবাইয়া দিয়া “নারায়ণ, নারায়ণ” বলিয়া শুইয়া পড়িল।

শ্বশুরের নিষেধ ছিল বলিয়া উভয়ের এই পৃথক শয়নের সংবাদটা বাহিরে কাহারও কাছে বধূ প্রকাশ করে নাই। শ্বশুরের উচ্চ উদ্দেশ্য

যতই উচ্চ হউক, একান্ত আগ্রহে যাহা চাহিয়াছিল—সেই প্রলোভনের বস্তু করায়ত্ত করিয়াও প্রবৃত্তি দমনে রাখিবার,—সংযম সাধনায় আত্মজয়ী হইবার আকাঙ্ক্ষা খন্তরের মর্ম্মে মর্ম্মে যতই থাক—এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীর জনসাধারণ উহার অর্থ বুঝিবে না, ইহা ভালরূপে জানিত। লোকাচার সমর্থিত কোন অনিষ্টকর প্রথা লঙ্ঘন করিলে, লোক সমাজের নিকট হইতে কটু-তিক্ত মন্তব্য শুনিতে হইবে, তাহাতে নিজেদের মনের শান্তি নষ্ট হইবে। বিশেষতঃ অল্পবুদ্ধি বধূটি হয়ত তাহাতে অতিমাত্রায় বিচলিত হইবে, এ আশঙ্কা খন্তরের যথেষ্ট মাত্রায় ছিল। সেজন্য বধূর নিকট নিজের উদ্দেশ্য অতিশয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। বধূ তাহার উদ্দেশ্যের মর্ম্ম এক এক সময় বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল, তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি নিজের আন্তরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছিল। নিজের মনের উত্তপ্ত অনুরাগ—স্থূল ভোগক্ষেত্রের দিক হইতে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এক এক সময় সে কেমন যেন উদ্দেশ্যের খেই হারাইয়া ফেলিতেছিল, তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছিল। তখন কারণে অকারণে নানা ছুতায় তাহার মনের অসহিষ্ণুতা ও চাঞ্চল্যের উত্তাপ এমনভাবে বাহিরে ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, খন্তর তাহা লক্ষ্য করিয়া রীতিমত চিন্তিত হইল।

একেই নিজের মনের ভিতর ঝড়-তুফানের শেষ ছিল না। তার উপর পত্নীর মানসিক-বিপ্লব-সংঘাতে মন অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বামীর কর্ত্তব্য অভিমান মনের ভিতর হানা দিতে লাগিল। উচ্চ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিবে, কি নির্ব্বোধ অসন্তুষ্ট পত্নীর ইচ্ছা-স্রোতে নিজের লক্ষ্য বিসর্জ্জন দিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। বিষম মানসিক দ্বন্দ্বে পড়িল।

জয়পাল পনের দিনের ছুটি লইয়াছিল। ক্রমে ছুটি ফুরাইল। সে সপরিবারে কর্ম্মস্থলে ফিরিতে উদ্যত হইল। খন্তব ছেলেদের লইয়া আদর করিতে করিতে বলিল "চল্, কাল আমিও তোদের সঙ্গে গিয়ে গুজণ্ডিতে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

ছেলেরা আনন্দে নাচিতে লাগিল। খন্তরকে তাহারা অত্যন্ত ভালবাসিত।

ভোরের ট্রেণে উহাদের যাইবার কথা। খন্তর অন্ধকার থাকিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্ত্রীকে জাগাইয়া দিয়া বাহিরে গেল। পূজাহ্নিক করিবার সময় ছিল না। সকলকে জাগাইয়া তোলা, জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা, কুলি ডাকিয়া মালগুলা ষ্টেসনে পাঠান ইত্যাদি কাযে খন্তর ব্যস্ত হইল। বধূ আসিয়া যাত্রার আয়োজনে মা-ঠাকুরাণীকে সাহায্য করিতে লাগিল।

বধূর হাত দুইটা ধরিয়া মা-ঠাকুরাণী বলিল "ভাগ্যে তুই আমাদের দেশে এসেছিলি, তাই আমার সাধু সন্ন্যাসী দেওরটি সংসারী হোল। ওকে দেখিস্, যত্ন করিস্। ওর সব ভার তোর হাতে রইল। দুটিতে মিলে-মিশে ঘর কর। ভগবান করুক ছেলে-মেয়ে হোক, তারা যেন বেঁচে বর্ত্তে থাকে। তোরা যেন সুখী হোস।"

খন্তর ঘরে গিয়া জামা জুতা পরিতেছিল। বধূ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। দ্রুতচঞ্চল দৃষ্টিতে বার বার খন্তরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল—যেন কিছু একটা বলিতে চায়।

খন্তর হেঁট হইয়া জুতা পরিতে পরিতে বলিল "ঘরে জিনিসপত্র সব রইল। যা দরকার হয়, দেখে শুনে নিও। সকাল সকাল রেঁধে খেয়ে শনিচরের বহুর কাছে যেও। রাত্রের খাবার করে রেখ। আমি সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব।"

"সন্ধ্যা নাগাদ! এত দেরী! তোমাকে এতক্ষণ ছেড়ে থাক্‌তে হবে? আমি পার্‌ব না!"—সঙ্গে সঙ্গে সে নিকটে বসিয়া পড়িল। আব্‌দারের স্বরে বলিল "তুমি যেতে পাবে না।"

খন্তর অবাক হইয়া গেল! অনুরাগ না হয় অন্তরে অন্তরে বহুদিন হইতে সঞ্চিত ও পুষ্ট হইয়াছিল। তা বলিয়া এতটা ঘনিষ্ঠতা,—এতটা আধিপত্য? কেমন যেন চমক লাগিল!

ধীরে বলিল "ছেলেরা চলে যাচ্ছে। আমি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব বলেছি। না গেলে ওদের মনে দুঃখ হবে। ওদের মন কেমন কর্‌ছে।"

"আর আমার? আমার কথা তুমি মনে কর্‌ছ না? আমি যে তোমার মুখ চেয়ে সব ভুলে যেতে চাই।"—বধূ কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল "কাল থেকে আবার চাকরিতে পালাবে।"

খন্তর বিব্রত হইয়া বলিল "কি মুস্কিল! আমি পালাব আর কোথা? আমি ত তোমারই রইলাম। কিন্তু কর্ত্তব্য—"

"হোক্‌। আজ তুমি আমার নজর-ছাড়া হতে পাবে না। আজ কোথাও বেরুতে পাবে না, আমার কাছে থাক।"

ঈষৎ গম্ভীর হইয়া খন্তর বলিল "এর নাম নেশা।"

জেদের সহিত বধূ বলিল "হোক নেশা। তুমি যেতে পাবে না।" সঙ্গে সঙ্গে খন্তরের গলা হইতে চাদরখানা কাড়িয়া লইল।

খন্তর চাদরের অন্য প্রান্তটা ধরিল। মনে পড়িল আর একজনকে! মনে হইল—সে ত এমন ছিল না। সে চাহিত—খন্তর আগে বহির্জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য সুশৃঙ্খলে পালন করিয়া আসুক, স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া আত্মহারা হইয়া যেন কোন কর্ত্তব্যে কিছু ত্রুটি না রাখে। তার পর কর্ম্ম-শ্রান্ত স্বামী যখন গৃহে ফিরিয়া বিশ্রামের অবকাশ পাইবে, তখন সে

পরিপূর্ণ প্রেমে যত্নে সেবায় তাহার শ্রান্তি বিনোদনে আত্মনিবেদন করিবে। পাছে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া খন্তর আত্মবিস্মৃত হয়, কর্ত্তব্য দায়িত্ব ভুলিয়া যায়,—সে জন্য সে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত সজাগ থাকিত। এমন কি অবস্থা বিশেষে খন্তরকে কঠিন ভাষায় আঘাত দিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

কিন্তু, এ নারী? এ যেন দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত, অন্তঃসারশূন্য, অপদার্থ স্ত্রীলোকের মত! নিতান্ত লঘুচিত্ত!

একটু ক্ষোভ-মিশ্রিত ভর্ৎসনার স্বরে খন্তর বলিল "তুমি ছেলে মানুষ নও। কি চাও তুমি? স্ত্রীর আঁচল ধরে ঘরে বসে দিন রাত মেয়েলি ন্যাক্‌রা কর্‌ব? বাইরের কায সব ছেড়ে দেব?"

বাহির হইতে জয়পাল ডাকিল "খন্তর, গাড়ীর সময় হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ বাই—" বলিয়া খন্তর বধূর হাত হইতে চাদরটা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল।

বধূ ছাড়িল না। ব্যাকুল হইয়া বলিল "ভাইকে যাহোক কিছু ওজর দেখিয়ে দাও। বল—তুমি গুজন্তি যেতে পার্‌বে না।"

খন্তর এবার বেশ একটু উগ্রভাবে বধূর মুখের দিকে চাহিল। কোন কথা না বলিয়া কঠিন হস্তে বধূর মুঠা খুলিল। চাদরখানা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু ষ্টেশনে গিয়া সকলকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া, কি ভাবিয়া কে জানে খন্তর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। জয়পাল তাহার ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া নিজেই নিরস্ত করিল। বলিল "খন্তর আজ আর তোর গিয়ে কায নেই। থাকতে ত পাবি না, কেবল ছুটোছুটি করে যাওয়া আসাই সার হবে। বরঞ্চ কোন বড় ছুটিতে বহুকে নিয়ে যাস, দুজনে দিনকতক থেকে আস্‌বি।"

ট্রেণ ছাড়িল। মনটা খারাপ হইয়া গেল। বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা

হইল না। কয়েকজন সহকর্ম্মীর সহিত দেখা করিয়া ছোট ডাক্তারবাবুর কাছে চলিল।

ডাক্তারখানায় তখন রোগীরা কেহ আসে নাই। ডাক্তার একা বসিয়া তন্ময়চিত্তে বিবেকানন্দের "সন্ন্যাসীর গীতি" আবৃত্তি করিতেছিলেন। বলিলেন "এস, এস। ভাল আছ ত? কদিন দেখিনি।—অ! তার মধ্যে—নতুন বিয়ে করেছ, নয়?"

তুচ্ছ কথা। তবু যেন তিরস্কারের মত বাজিল। ম্লানহাস্যে মাথা নোয়াইয়া খন্তর বলিল "কেমন আছেন, দেখ্‌তে এলুম।"

হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন "মনের রাশ শক্ত হাতে টেনে রেখেছ? ধন্যবাদ। নতুন বিয়ের পর আমাকে ত বাপু কেউ দেখ্‌তে আসে না। বরঞ্চ আমাকেই যেতে হয়—বুঝেছ? তার পর বল সব। বৌটির দেহ-মনের স্বাস্থ্য কেমন? বয়স কত?"

খন্তর সংক্ষেপে পরিচয় দিল।

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া বলিলেন "বিধবা বিবাহ কর্‌লে? মন্দ কি? তবে দেশের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটী বেড়েছে। এখন সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে ঝোঁক না দিয়ে মনুষ্যত্ব বৃদ্ধির সাধনায় প্রাণোৎসর্গ করাই সুবুদ্ধির পরিচয়। বৌটির আগের স্বামী আর ছেলে দুটি কি ব্যামোয় মারা গেছে, খোঁজ নিয়েছ?"

"না।"

"নেওয়া উচিত ছিল। তোমার ভবিষ্যৎ সন্তানদের কল্যাণচিন্তার দায়িত্ব তোমার। অবশ্য আমার বিচারে।··অপরের বিচারে সে মুরুব্বিয়ানা হয়ত ধৃষ্টতা। থাক্—যা হয়েছে ভালই। ঈশ্বর মঙ্গল করুন।"

খন্তর মাথা নাড়িল। বলিল "নিজের নির্ব্বুদ্ধির দণ্ড নিজেকে ভুগ্‌তে হয়। সেখানে ঈশ্বর মঙ্গল করেন—শাস্তি দিয়ে।"

সেই সময় উৎসাহ-উত্তেজিত মুখে ডাক্তারের এক বাঙালী বন্ধু ঘরে ঢুকিলেন। হাতে একখানা বই! খন্তরকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "ব্যস্ত আছ ডাক্তার?"

"না, বস। কিছু খোশ খবর আছে?"

বন্ধু বসিলেন। সহাস্যে বলিলেন "জ্বালাতন কর্‌বার সাধু উদ্দেশ্য। ঋতুসংহার পড়েছ? কালিদাসের? পড়।"

তিনি বইখানা দিতে গেলেন, ডাক্তার তাঁহার বহি সমেত হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন "কালিদাসের রুচিজ্ঞানের দৌড় দেখবার জন্যে ওটা পড়েছি। আর প্রাণপণ চেষ্টায় তাড়াতাড়ি সব ভুলেওছি। মাতালে কাব্য নিয়ে ভদ্রসমাজে কেন?

বন্ধু একটা অনাবশ্যক দীর্ঘ ঈকার যোগ দিয়া সত্রাসে বলিলেন "কী! মাতালে কাব্য? অতবড় কবি কালিদাস!"

ডাক্তার চোখ বুজিয়া চিন্তিত ভাবে বলিলেন "জনশ্রুতি—ভদ্রলোকটির আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছিল বেশ্যাবাড়ী গিয়ে,—নয়?"

বন্ধু রাগিয়া বলিলেন "তা'পর? বাকী থাকে কেন? জিজ্ঞাসা কর,—লাংস, ম্যাপচার্, না হার্টফেল, না এ্যাপোপ্লেক্সি? কোন্ কোন্ ডাক্তার দেখেছিল? কে লিবারে সেঁক দিয়েছিল? কে পিণ্ডী দিয়েছিল?"

ডাক্তার হাসিলেন। উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "চটো না দাদা, থাম। পিণ্ডী তোমরা খাসা দিচ্ছ, দিব্য চক্ষে দেখছি।"

বন্ধু শাসাইয়া বলিলেন "ভাল চাও ত, পড়। নইলে ১৪৪ ধারা জারি কর্‌ব।"

ডাক্তার সকরুণ হাস্যে বলিলেন "১০৭ ধারার খবর আমিও যে রাখি বন্ধু!"

"নাঃ, হতাশ করে দিলে!"

"আক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন। এ-সব কাব্য এক শ্রেণীর কাব্যামোদীর কাছে আদরের জিনিস। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যার্থীর কাছে—বিরক্তিকর, ঘৃণ্য আবর্জ্জনা। লাফিয়ে উঠো না দাদা,—ধীরমস্তিষ্কে বিচার করে দেখ। অভিভাবকের পয়সায় অমিতব্যয়িতা, বিলাসিতা করবার সুযোগ যাদের আছে, তাদের পক্ষে এ-সব কাব্য নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন আরামে সময় কাটানো চলে,—তামসিক উচ্ছৃঙ্খলতার উৎসব চলে। আরও কত কি চলে।"

"সুনিদ্রা?"

"শ্রাদ্ধ! অনিদ্রা রোগ ধরানো চলে,—অকর্ম্মণ্য হওয়া চলে, মহানিদ্রা চট্‌পট্ আনানো চলে।"

"কিন্তু বেঁচে থাক্‌তে হলে—"

ডাক্তার দৃঢ়স্বরে বলিলেন "জেগে থাক্‌তে হবে বন্ধু, চরিত্রগঠন কর্‌তে হবে। তার জন্যে চাই—তত্ত্বজ্ঞানের চর্চ্চা, চাই বিবেক বিচার।"

বন্ধু বিপন্ন ভাবে বলিলেন "মাটী কর্‌লে। তা'হলে বৈষ্ণব কবিতা, কীর্ত্তন, দাঁড়ায় কোথা? গীত-গোবিন্দ—"

বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন "চিনির কোটিং দেওয়া কুইনিনের পিল্! কিন্তু চিনিটুকু চেটে নিয়ে, কুইনিনটা ফেলে দিলে ম্যালেরিয়া ঘুচ্‌বে না। উল্টে বিশ্রী বদখৎ নেশায় বিভ্রান্ত হবে। বৈষ্ণব কবিতা?—ও সেই স্থান, Where angel fears to tread! সাধারণ ইন্দ্রিয়াসক্ত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানসর্ব্বস্ব জীবকে আমি যোড়হাতে বলছি "দোহাই, যেও না ওদিকে। আগে মন তৈরী কর। উচ্চ লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তা'পর রসানন্দ সম্ভোগ!"

বহিখানা আছাড় মারিয়া বেঞ্চের উপর ফেলিয়া বন্ধু ক্ষোভের সহিত

বলিলেন "সোজা হাঁকিয়ে দিলে! এখন এই উৎকট রসানন্দ নিয়ে আমি করি কি?"

"গলায় দড়ি দাও। সুবুদ্ধির প্রতিফল!" সুগম্ভীর ভাবে বলিতে বলিতে খন্তরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। ডাক্তার দেখিলেন সে আত্মবিস্মৃতের মত বসিয়া, গভীর মনোযোগের সহিত একান্ত আগ্রহে তাঁহার কথাগুলা যেন গ্রাস করিতেছে!

একটু হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন "এই খন্তর ছোকরার সঙ্গে আমার রাশি নক্ষত্রের কোথায় কি মিল আছে জানি নে। কিন্তু বুঝ্‌তে পারি, —ও আমার অন্তরের ভাবগুলা বুঝ্‌তে পারে, আমিও বোধ হয় ওকে কতক কতক বুঝ্‌তে পারি। কি হে, আমাদের কাব্যচর্চ্চার মানে কিছু বুঝ্‌লে?"

মাথা নাড়িয়া চিন্তিত ভাবে খন্তর বলিল "না, হুজুর। আপনি রসানন্দ সম্ভোগের কথা তুললেন, তাই ভাব্‌ছি। ও সব ত যোগী সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজনের ব্যাপাব। আপনি এত খবরও রাখেন! আশ্চর্য্য!"

ডাক্তার বলিলেন "পল্লবগ্রাহী মানুষ বাবা!—তুমিও ত আগে পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটোছুটি করে নোটবুকে সাধু-সন্ন্যাসীদের উপদেশ টুকে নিতে। এবার বিয়ে করেছ, আর ত সে সব তত্ত্ব নাড়াচাড়া কর্‌বার সময় পাবে না। ব্রাহ্মণকে সেটা দান কর। দুনিয়ার খবর রাখ্‌বার বাতিক আমার আছে।"

বন্ধু বলিলেন "তাহলে কালিদাসের ঋতুসংহার কি অপরাধ কর্‌লে শুনি? তিনি এত বড় মহাকবি; তাঁর উপমা অনুপম। অভিজ্ঞতা—হোক্ সে স্থূল ইন্দ্রিয় বিলাসিতা ব্যাপারে, তবু সে অভিজ্ঞতার দাম আছে।"

ডাক্তার ঘুরিয়া বসিয়া চেয়ারের হাতলে দুই পা তুলিয়া দিয়া স্মিত-মুখে বলিলেন "আছে বই কি। নইলে তোমরা পয়সা খরচ করে সে গরল কিনে গলাধঃকরণ কর্‌বে কেন? কিন্তু ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, মনে রেখ।"

তার পর অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে আবার সন্ন্যাসীর গীতি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"পশিতে না পারে কভু তথা সত্য
কাম লোভ বশে যেই হৃদি মত্ত ;
কামিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যে জন
হয় না তাহার বন্ধন মোচন ;—"

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন "ডাক্তার, এবার আমি মনে করতে পারি যে তুমি বিবেকানন্দের জবানীতে কালিদাসের প্রতি কটাক্ষ করছ। প্রাণ বিট্‌কেলে চেঁচিয়ে ঋতুসংহার পড়্‌ব ?"

ডাক্তার বলিলেন "তা'হলে আমার অসুস্থ রোগী যারা এখুনি আস্‌বে, তাদের প্রাণসংহার করবার জন্যে দায়ী হবে। সরে পড়। জ্ঞানীরা বলেছেন স্ত্রীলোক, আর স্ত্রী-সঙ্গীদের সঙ্গ ত্যাগ করাই ভাল।"

"ডাক্তার, তোমার রোগীদের মধ্যে স্ত্রীলোক কেউ নাই ?"

"মায়েদের স্ত্রীলোক বলে মনে করে যে,—সে তোমার মত পণ্ডিত! ঋতুসংহার দেখ্‌ছি তোমার আক্কেল-বুদ্ধি সংহার করেছে! যাও, চাড্ডি পচা পাঁক মাথায় চাপিয়ে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকগে।—লোকসমাজকে সুস্থ থাক্‌তে দাও।"

বন্ধু আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন, ডাক্তার তাঁহার কথায় বাধা দিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয়—সহসা উচ্চ কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"এ মর মহীতে, মা'ক মা বলিতে,
মন রে, যে জন শিখেছে।
সে কি পাপ-চোখে, দেখে কামিনীকে
মাতৃ-ভাবে তার মন যে ভুলেছে॥
কে-বলে সে বলে মায়াবিনী বামা
আমি দেখি মার জীবন্ত প্রতিমা—"

ভদ্রলোক বলিলেন "ঘাট হয়েছে মশাই, চল্লুম।" বইখানা তুলিয়া লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

খন্তর নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল "আমিও উঠি। নমস্কার। বেশ আছেন ডাক্তার বাবু, বেশ আছেন। বালকের মত মন নিয়ে অখণ্ড আনন্দে বিভোর! দেখ লে তৃপ্তি হয়। যে মা আপনাকে পৃথিবীতে এনেছিলেন তাঁর পায়ে শত শত প্রণাম। তিনি বেঁচে নাই, নয়?"

ডাক্তার চোখ বুজিয়া মাথা নাড়িলেন। বলিলেন "না। কিন্তু পৃথিবীর সকল মায়ের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান, এটা যেন না ভুলি, এই আশীর্ব্বাদ কর বাবা।"

খন্তর সন্ত্রস্ত হইয়া নমস্কার করিল। বিদায় লইল।

পূজাহ্নিক এখনও হয় নাই। মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তবু এতক্ষণ বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা হয় নাই, এবার হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—খোকাবাবুর খবর লওয়া যাক। পার্ব্বতীকে বলিতে হইবে।

বড় বাবুর বাড়ীর দিকে চলিল।

অন্তরে মোহময় প্রেম ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের মধ্যে গোপন দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল। যাহাকে ভালবাসে তাহার সবটুকুই ভাল দেখিতে চায়, তাহার অন্যায় খন্তরকে অত্যন্ত আঘাত করে। ভাইয়ের কাছে মিথ্যা বলার প্রস্তাবটা

কানে বড় কটু লাগিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া উগ্র দৃষ্টির নির্ব্বাক্ তিরস্কারে পার্ব্বতীকে ব্যথা দিয়াছে, নিজের মন তাহাতে বেদনাক্ষুব্ধ। এখন পার্ব্বতীর প্রিয় কায কিছু করিয়া তাহার ব্যথা দূর করা চাই।⋯ পার্ব্বতীর প্রিয় শিশুটির কথা মনে জাগিল। আশা হইল তাহার সংবাদ উপলক্ষ্য করিয়া মনোমালিন্যটা মিটাইয়া ফেলিবে।

ডাক্তারের সংসর্গ-প্রভাবে মনে পরম সুষমাময় মাতৃস্নেহের মাধুরী জাগিল। মনে পড়িল,—পার্ব্বতীও এ পৃথিবীর একজন মা। আহা, বেচারী সন্তানশোকার্ত্তা, অসুস্থ-চিত্ত। কে জানে, হয়ত মনের জ্বালা ভুলিবার জন্য দুর্ব্বলচিত্ত নারীর মত তুচ্ছ আদর আব্দারে আত্মহারা হইয়া থাকিতে চায়।⋯ক্ষমার পাত্রী!

নিজের রূঢ়তার জন্য অনুতাপ হইল। পার্ব্বতীর প্রতি গভীর করুণায় মন ভরিয়া গেল।

একটা দোকানে গিয়া পার্ব্বতীর জন্য এক বাক্স ভাল সাবান ও খোকা বাবুর জন্য কিছু বিস্কুট ও লজঞ্জুস কিনিয়া পকেটে পূরিল। আহা, পাইলে তারা খুশী হইবে!

মনটা বেশ একটু হাল্কা বোধ হইল।

১৯

বড়বাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হইল না। রাস্তার মোড়ে কানহাইয়ালালকে দেখা গেল। তাহার কোলে প্রচণ্ড চীৎকারপরায়ণ খোকাবাবু। কি একটা বায়না লইয়া সে বিষম উৎপাতে দাপদাপি করিতেছে, কাঁদিতেছে। কানহাইয়ালাল তাহাকে ভুলাইবার জন্য এটা ওটা দেখাইয়া, উদ্ভ্রান্ত ভাবে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে।

খন্তর বলিল "কি হোল বাবু, কাঁদছ কেন?"

কানহাইয়ালাল মহা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে তাহাকে কতকগুলা গালাগালি দিল। তার পর বলিল "তোর জন্যেই যত গেরো জুটেছে! বাবুয়ার মা বেশ ছিল এখানে। তুই উল্লুক, লোভ সাম্‌লাতে পারলি না, তাকে লুটে নিয়ে গেলি। এখন এ-শয়তান ছেলে তার জন্যে হেদিয়ে সারা হচ্ছে। নানা বাহানায় আমাদের জান্ হায়রান্ করছে। তাকে নিয়ে গেছিস, এটাকেও নিয়ে যা।"

খন্তর হাসিমুখে বলিল "যাবে বাবু তার কাছে? বাবুয়ার মার কাছে? এস, নিয়ে যাই—"

হাত বাড়াইল। খোকাবাবুর কান্না চকিতে স্তব্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সাগ্রহে সুদীর্ঘ ছন্দে বলিল "ক—ই?"

শিশুকে বুকে লইয়া, অদূরে পল্লীর দিকে হাত বাড়াইয়া খন্তর বলিল "ওই—ওখানে। যাবে তার কাছে?"

শিশু পরম আগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"এঁহ্। তোয়ো!"

অর্থাৎ—'হাঁ, চল!"

খন্তর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কান্‌হাইয়ালালের দিকে চাহিয়া বলিল "নিয়ে যাব? মাইজীকে জিজ্ঞাসা কর।"

বড়বাবু সেই সময় বাহিরে আসিতেছিলেন। খন্তরের কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন "ওকে নিয়ে যাবে? যাও বাপু, এখনি নিয়ে যাও। এই পাজীটা আমাদের হাড় জ্বালিয়ে তুলেছে। তোমাদের ওখানে ক'দিন খাওয়ান-দাওয়ানের হাঙ্গাম ছিল। কোথা গিয়ে কি খাবা দিয়ে মুখে পূরবে, শেষে অসুখ ধরাবে, সেই ভয়ে কদিন যেতে দিই নি। এবার নিয়ে যাও। তাকে বারণ কোর, যেন কিছু খেতে না দেয়।"

খোকার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কি রে? বাবুয়ার মার কাছে গিয়ে থাক্‌বি? রাত্রেও থাক্‌তে পার্‌বি ত?"

খোকা ঘাড় কাৎ করিয়া পরম আহ্লাদে বলিল "এঁহ্‌।"

পিতা সহাস্যে বলিলেন "সে বেটী তোকে যাদু করেছে। খন্তর যাও বাবা, নিয়ে যাও। কানিলাল, তুমি ঘণ্টাখানিক পরে গিয়ে ওকে এনো।"

খন্তর অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। কানহাইয়ালাল নষ্টামি করিয়া অতিশয় ভালমানুষের মত বলিল—"হ্যাঁরে খন্তরা, তুই না-হয় সাগাই করেছিস। তা বলে তাকে আর এখানে আসতে দিবি না? কায কর্‌তে দিবি না?···দু'টো ত মানুষ তোরা। কতই-বা ঘরের কায। তুই কাজে বেরিয়ে গেলে, সে একা ঘরে বসে কর্‌বে কি? বরঞ্চ সে সময় এখানে এসে খোকাবাবুকে যদি আটকে রাখে, আমাদের উপকার হয়। আস্‌তে দিবি না?"

খন্তর আড়চোখে চাহিয়া দেখিল বড়বাবুও সেই সঙ্গে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টিতে খন্তরের দিকে সহাস্যে লক্ষ্য করিতেছেন। বোধ হয় তাঁহারও মনোগত অভিপ্রায় তাই। তিনিও প্রশ্নের উত্তর চাহেন। লজ্জিত হইয়া খন্তরা বলিল "আমি ছোট বেলা থেকে এখানে মানুষ। এ তো আমার নিজের ঘর। দরকার হলেই ডেকে নেবে। আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন?"

খোকাবাবুকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। বড়বাবু পিছন হইতে বলিলেন "সে বেটীকে একবার পাঠিয়ে দিও। তোমার মাইজীর সঙ্গে দেখা করে যাবে।"

"জী—আচ্ছা।" বলিয়া খন্তর প্রস্থান করিল।

নিজের আঙিনায় ঢুকিয়া দেখিল, পার্ব্বতী তখন স্নান করিয়া রান্না

চাপাইবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহার নিকটে বসিয়া শনিচরের বধূ কুটনা কুটিতেছে। দুজনে নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

খন্তরকে দেখিয়া ভ্রাতৃজায়া বলিল "ওই ছাখ পার্‌বতিয়া, ওর গুজস্তি থেকে বেড়িয়ে আসা হোল! ওদের মনে যাই থাক, মুখে জারি করা খানিক চাই! ফিরলে কেন?"

পার্ব্বতী ঘোমটার আড়াল হইতে খন্তরের দিকে চাহিল। খন্তর দেখিল তাহার মুখভাব অস্বাভাবিক বিষাদ-শুষ্ক।

মনে মনে অনুতপ্ত হইল। ভ্রাতৃজায়ার প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে সলজ্জ হাস্যে বলিল "ভাই ফিরিয়ে দিলে।"

খোকাকে পার্ব্বতীর নিকট নামাইয়া দিয়া, তাহার মানসিক অশান্তি এবং বড়বাবুর মন্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করিয়া বলিল "নাও, তোমার বাবুয়াকে আদর কর।" বিস্কুট প্রভৃতি বাহির করিয়া দিল।

পার্ব্বতী কিছুমাত্র আনন্দ বা স্নেহের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল না। অতিশয় অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখে, অর্থশূন্য দৃষ্টিতে ক্ষণেক খোকার দিকে চাহিল মাত্র। খোকাও কেমন যেন বিস্ময়-বিকল হইল। পার্ব্বতীর নববধূজনোচিত বেশভূষা এবং ঘোমটা, গভীরতর সন্দেহের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া, হতাশভাবে নিঃশ্বাস ফেলিল। পার্ব্বতীর কাছে গেল না। পিছু হটিয়া খন্তরের গলা জড়াইয়া ধরিল। ম্লানমুখে বাহিরে যাইবার ইঙ্গিত করিল।

খন্তর আশ্চর্য্য হইল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা সেইখানে বসিল। পার্ব্বতীর উদ্দেশে সসঙ্কোচে বলিল "কি হোল বল দেখি?···তোমায় চিন্‌তে পার্‌ছে না?···যাও খোকাবাবু, ও যে তোমার সেই বাবুয়ার মা। যাও ওর কাছে।"

পার্ব্বতী ঘোমটার ভিতর হইতে চাপা গলায় ঝঙ্কার হানিয়া বলিল

"চিনতে পারছে কি, না পারছে,—কি করে জানব? ঘরের লোকে বড় চিনেছে, তাই পরের ছেলে চিনবে!"

পার্ব্বতীর এই অর্থহীন ক্রোধ-ঝঙ্কারের অর্থ কে কতদূর বুঝিল,—বোঝা গেল না। কিন্তু খোকা সে তর্জ্জনে রীতিমত ভয় পাইল। শঙ্কিত ভাবে খন্তরের আরও গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। কচি হাতের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রাণপণে খন্তরের গলা জড়াইয়া ধরিল।

বিপন্ন হইয়া খন্তর বলিল "মুস্কিলে ফেললে। আমার পূজাপাঠ হয় নি, ব্যায়াম করা হয় নি,—আর ত সময় নষ্ট করা চলে না।·· শুনছ, ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডেকে নাও না।"

বলিতে বলিতে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যের সহিত ঘন ঘন খন্তরের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে। খোকার প্রতি এখন তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ নাই।

বুঝিল—পার্ব্বতীর চিত্তের ভিতর এখন বাৎসল্য, স্নেহ, করুণা প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তির আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া,—এক অব্যক্ত মূঢ় চাঞ্চল্যের ঝড় বহিতেছে। মনে মনে অস্বস্তি ও বিরক্তি বোধ করিল। প্রসঙ্গান্তরের অবতারণায় পার্ব্বতীর মনটা অন্য দিকে ফিরাইয়া দিবার জন্য বলিল "ও বাড়ীর মাইজীদের সঙ্গে আজ বিকালে দেখা করতে যেও।"

অপ্রসন্ন ভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পার্ব্বতী বলিল "কেন, কি দরকার? আমার ঘরের কাযকর্ম্ম কে করবে?"

খন্তর কথা চাপা দিবার জন্য ত্রস্তে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল "ভৌজি কতক্ষণ এসেছ?"

ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে কয়েকটা অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া খন্তর পুনশ্চ পার্ব্বতীর উদ্দেশে অনুনয় করিয়া বলিল "ডাক, ডাক, খোকাবাবুকে ডেকে নাও। আমার···"

বাধা দিয়া রুষ্টস্বরে পার্ব্বতী বলিল “কেন ডাকব? কি গরজ? আমার কথা তুমি রাখ? কেন তোমার কথা রাখ্‌ব?”

হাসিয়া খন্তর ভ্রাতৃজায়াকে বলিল “রাগ দেখছ?”

ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণী এখন জ্ঞাতি-দেবর বলিয়া খন্তরকে সমীহ করিয়া চলিবার প্রয়োজন দেখেন না। জ্যেষ্ঠা-শ্যালিকাজনোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ভগিনীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিলেন “রাগাবার কায করছ, কাজেই রেগেছে। তুমি যে কি মানুষ কিছুই বুঝলাম না। কখনো সাপের মুখে চুমো দিচ্ছ, কখনো ব্যাঙের মুখে চুমো দিচ্ছ। বাইরের লোকে জানে না, তারা না-হয় বলছে—পাঁচজনে ধরে-বেঁধে তোমার সাগা দিয়েছে। কিন্তু তুমি ত মনে মনে জান, নিজে পছন্দ করে ওকে হাতে ধরে এনেছ। এখন যদি ওকে পছন্দ না কর, ভাল না বাস,—তাহলেই-বা ও-মানুষটা দাঁড়ায় কোথা?”

অভিযোগটা খন্তরের নিকট নিতান্তই ভিত্তিহীন তুচ্ছ পরিহাস মনে হইল। হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য বলিল “দিব্যি ত জেঁকে-জুঁকে বসে রয়েছে। দাঁড়াবার স্থানের অভাব ত দেখি না। নালিস কেন?”

“আহা তোমার ভালবাসা—”

“মাপ কর ভৌজি! সে ঝগড়া তোমার সামনে চালাতে পারি না। উঠ্‌তে হোল তা হলে—”

“না না, বস। বলি, ধর্ম্মসাক্ষী করে ভার নিয়েছ। ওকে ভালবাস্‌তে ত হবে? নিয়ে ঘর কর্‌তে ত হবে?”

“হবে না কে বল্‌ছে শুনি? তোমার বহিন্‌টি ত? ঢের ঢের অবুঝ দেখেছি, এমন আর দেখি নি—”

ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া পার্ব্বতী তীব্র শ্লেষভরে বলিল “আমি অবুঝ?

বেশ ত, বুদ্ধিওলা দেখে আর কাউকে ঘরে আন। তাকে নিয়ে মনের সুখে ঘর-সংসার কর। আমায় তাড়িয়ে দাও, আর কেন ?”

সে আরও বলিত। ভগিনী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল “থাম্ থাম্, করিস কি ? তেতে পুড়ে মানুষ এসেছে, একটু আক্কেল কর্। ও সব কথার কি সময় নাই ?”

খন্তর পরম ধৈর্য্যে সহাস্যে বলিল “ঝগড়ায় তোমার বহিনের ত বেশ দখল আছে ! এতটা জান্তাম না। হুঁঃ, পৃথিবী জুড়ে মানুষ রোগ শোক দুঃখদারিদ্র্য অভাব লাঞ্ছনায় কাত্‌রে সারা হচ্ছে,—আর তোমার বহিনটি নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে ভালবাসার কসুর নিয়ে ঝগড়া জুড়েছে ! বেশ মানুষ ত ! চল খোকাবাবু, আমরা ডন্—বৈঠক করিগে। কায হবে।”

খন্তর উঠিল। খোকাকে লইয়া ঘরে গেল। তাহাকে নিজের খাটিয়ায় বসাইয়া, কয়েকটা খালি দেশলাইয়ের বাক্স, রঙীন পেন্সিল ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস খেলিতে দিল। খোকা নিজ মনে খেলিতে লাগিল। খন্তর জামা জুতা খুলিয়া ধীরভাবে ব্যায়াম করিতে লাগিল।

তাহার ব্যায়াম-কৌশল লক্ষ্য করিয়া খোকা প্রথমে বিস্মিত হইল। পরে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিল। খাটিয়া হইতে নামিয়া, সে মহোৎসাহে খন্তরের ব্যায়াম প্রণালীর অনুকরণ আরম্ভ করিল। খন্তর সহাস্যে তাহাকে উৎসাহ দিল। শিশু মহা গাম্ভীর্য্যে প্রবল আড়ম্বরে ডন্ টানিবার প্রয়াস করিল। কিন্তু হায় ! দম রাখিতে না পারিয়া বেচারা বার বার “হঁক্-হ্বৎ, হঁক্-হ্বৎ,” শব্দে মেঝেয় শুইয়া পড়িতে লাগিল। তবু নিরস্ত হইল না। চমৎকার একটা খেলা হইতেছে ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গীতে সেই চেষ্টা করিতে লাগিল !

খন্তর হাসিল। চকিতে মনে পড়িল, নিজের শিশু পুত্রের স্মৃতি ! সেও এমনি ছিল,—ঠিক এমনিই করিত !…

শত দিনের শত তুচ্ছ ঘটনার স্মৃতি মনে পড়িল। বুক বিষাদে ভরিয়া উঠিল, মুখ গম্ভীর হইল। ব্যায়াম ছাড়িয়া খন্তর স্তব্ধ নিঝুম হইয়া শিশুর দিকে চাহিয়া রহিল। আহা, মা বাপের স্নেহের বাছা, বাঁচিয়া থাক, বাঁচিয়া থাক! তোমরা অতি ক্ষুদ্র, অতি কোমল, অতি মধুর, অতি আনন্দময় সুন্দর জীব ;—কিন্তু তোমাদের বিয়োগ-জ্বালা বড় প্রচণ্ড! বড় অসহ্য!

দুয়ার খুলিয়া একটা গ্লাস হাতে লইয়া পার্ব্বতী ঘরে ঢুকিল। তাহার দিকে চাহিয়া খন্তর চমকিয়া উঠিল! আহা, এই এক সন্তান-হারা জননী!...

সমবেদনায় মন করুণার্দ্র হইল। সন্তর্পণে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া হাঁটুর নীচে কাপড়ের প্রান্ত নামাইয়া দিতে দিতে নত মুখে বলিল "ভৌজি আস্‌ছে না কি?"

পার্ব্বতী বলিল "না, সে ঘরে গেছে! লেবুর সরবৎ এনেছি, খাও।"

"উহুঁ, এই মাত্র ব্যায়াম করেছি। রাখ, স্নান পূজা করে এসে খাব।"

অপ্রসন্ন হইয়া পার্ব্বতী বলিল "ওই জন্যে ঝগড়া করতে হয়। সকল কথায় তুমি নিজের জিদ বজায় রাখতে চাও।"

ম্লান মুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া খন্তর বলিল "কি মুস্কিল! ব্যায়াম করে উঠে, ঠাণ্ডা-জলো জিনিস খাওয়া যে বারণ। রাখ রাখ, পূজা করে এসেই খাব। রাগ কোর না।"

"নাঃ! দিন রাত বাইরে আড্ডা দিয়ে বেড়াও, ঘরের কথা মনে কোর না, তাহলেই রাগ করব না। বাড়ীতে একটা মানুষ যে তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে, সে কথা কি ভুলেও মনে করতে নেই?"

খন্তর মৃদু হাসিল।—অসতর্ক হইলে আর চলিবে না। নব-বিবাহিতা

স্ত্রীর নিকট এখন সুকৌশলে সতর্ক-প্রণয়ীজনোচিত চরিত্রের অভিনয় করিতে হইবে, নচেৎ ক্ষমা নাই !

স্মরণ রাখিতে হইবে জগৎটা মহামায়ার বিরাট নাট্যশালা। যে অংশ অভিনয়ের ভার তাহার উপর আছে, তাহা সাবধানে অভিনয় করিয়া যাওয়াই ভাল। অধীর হইলে সব পণ্ড !

স্মিতমুখে বলিল "বাড়ীতে প্রাণ পড়ে আছে,—বাড়ীর কথা ভুলব,·· কি রকম ? কিন্তু তুমি এত ছেলেমানুষ ! ছিঃ ! বহিনের কাছে কাঁদুনি গাইতে গেছ, ভালবাসার দুঃখ নিয়ে ? একটু লজ্জা হোল না ? তোমার বহিন—কিন্তু আমার বড় ভাজ ত ?"

পার্ব্বতী বসিল। ঠোটের উপর আঙুল রাখিয়া ক্ষণেক গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া রহিল। তার পর বলিল "সে কথা পরে হবে। ঢের বেলা হয়েছে,—চট্ করে নেয়ে এস।"

"দাঁড়াও। কানিলাল আসুক। খোকাবাবুকে তার কাছে দিয়ে যাই। আমার উপর রাগ হয়েছে, তুমি ত ওকে নেবে না। এমন বে-আক্কেল রাগও কখনো দেখি নি। ছোট ছেলের অপরাধ কি ?"

পার্ব্বতী অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্বশুরের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু বলিল না। শ্বশুর হাসিমুখে বলিল "কি ভাবছ বল ত ?"

পার্ব্বতী সে প্রশ্নের উত্তর দিল না। সহসা খোকার দিকে চাহিয়া শাসনের স্বরে ডাকিল "বাবুয়া কি হচ্ছে ?"

বাবুয়া এতক্ষণ হেঁটমুখে থাবা পাতিয়া বসিয়া ডান হাতের তর্জ্জনীর দ্বারা মেঝের মাটী খুঁড়িয়া জড় করিতেছিল, কোন দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। এবার দু' আঙুলে ধরিয়া মাটীগুলি পরম আগ্রহে মুখে তুলিবার উদ্যোগ করিতেই সহসা পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে চমক ভাঙিল ! বাবুয়ার মাকে এতক্ষণে সে চিনিতে পারিল। ত্রস্তে মাটী ফেলিয়া সোল্লাসে ছুটিয়া

গিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। পার্ব্বতী তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল

খন্তর স্মিতমুখে নীরবে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণপরে পার্ব্বতী বলিল "দাঁড়িয়ে কেন? যাও।"

"যাচ্ছি। তোমার মেজাজটা ঠাণ্ডা হয়েছে?"

সাভিমানে পার্ব্বতী বলিল "হোল, হোল! না হোল, না হোল। তোমার তাতে কি? কিন্তু বলে রাখছি, আজ দুপুরে কোথাও বেরিও না। আমার ভয়ানক ভয় করে একা থাক্‌তে। এরা ছিল ক'দিন,—বেশ ছিলাম।"

সকৌতুকে খন্তর বলিল "ভয় করে? বুড়ো বয়সে? হাসালে তুমি! ভয় কি?"

পার্ব্বতী বলিল "হ্যাঁ, আমার মনে হয় কে যেন পেছু পেছু ঘুর্‌ছে। রাতদিন আমার ভয় করে।"

সহাস্যে তর্জ্জন করিয়া খন্তর বলিল "ছাখ, সাবধান—অমন বাঁদরামি কর ত আমিই তোমাকে ভয় দেখিয়ে, ভয় ভাঙাব। "ভয় ভয়" করে কেলেঙ্কারী কোর না বল্‌ছি। তোমার ছেলেগুলাও অম্নি ভয়-তরাসে গো-ভূত হবে, তা জান? বদ্‌ অভ্যাসগুলি ছাড়।"

"কিন্তু বাড়ীতে থেক তুমি।" পার্ব্বতী অনুনয়ভরা দৃষ্টিতে চাহিল।

"আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু ভয়-টয়ের বায়না চল্‌বে না। তোমার এই খোকাবাবু ত ভাল। কি বল খোকাবাবু, তুমি বেশ সাহসী ছেলে নয়? রাত্রে এসে একে আগ্‌লাতে পার্‌বে? এর কাছে থাক্‌বে?"

পার্ব্বতীর হাঁসুলিটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে খোকা পরম নিরুদ্বিগ্ন ভাবে বলিল "এঁহ্‌।"

প্রীত মুখে খন্তর বলিল "হাঁ, একেই বলে ব্যাটাছেলে! রাত্রে আমার

কাষ পড়লে ত মুস্কিল করবে তুমি। একা থাকতে হাউ মাউ করবে। থাকাটাও অবশ্য ঠিক নয়। পাড়ার ছেলেপিলেগুলিও ত অতি সভ্য ভদ্র। হয় সুন্যারের বাড়ী, নয় তোমার বোনের বাড়ীতে গিয়ে থেক। তুমিও নিশ্চিন্ত থাকবে, আমিও নিশ্চিন্ত হব।"

রাগত ভাবে পার্ব্বতী বলিল "নিশ্চিন্ত তুমি হয়েই আছ। আমাকে যেন আপদ বালাই মনে করছ।···কি, থাক এখন সে কথা। তেতে পুড়ে এসেছ—"

বাধা দিয়া খন্তর সহাস্যে বলিল "ভাগ্যে বহিন মনে পড়িয়ে দিয়েছে! তাই সুবিবেচনা! খোকাবাবুরও বুঝি তাই বরাত ফিরে গেছে? বুঝেছি। আচ্ছা বস, নেয়ে আসি।"

"পূজাপাঠ তাড়াতাড়ি সেরে নিও—"

"সহধর্ম্মিণী ঘুরে এসেছ, এবার ধর্ম্মচিন্তাকে ধামা চাপা দিতে হবে বৈ কি! 'দুপুরে নজর বন্দী থাক, সকাল সন্ধ্যায় হুজুরে হাজির থাক,'—আর দায়গুলা ক্রমেই মারাত্মক হয়ে উঠছে যে!—অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়, বুঝলে?"

হাসিমুখে ঘরের বাহির হইতেই দেখিল কানহাইয়ালাল বাড়ী ঢুকিতেছে। প্রৌঢ় পরিহাসের সুরে বলিল "ওঃ, নতুন বিয়ে করে খন্তরার মুখে হাসি যে ধরছে না।"

তাহার পাশ কাটাইয়া বাহিরে যাইতে যাইতে খন্তর মৃদুস্বরে বলিল, "কান্না ঢাকবার জন্য অনেক সময় হাসতে হয় নানা। নইলে সব দিক বাঁচান যায় না। বড্ড রোদ। খোকাবাবুর মাথায় ঢাকা দিয়ে নিয়ে যেও।"

স্নান পূজা সারিয়া আসিয়া খন্তর খাইতে বসিল। অনেক মশলা দিয়া অনেক রকমের তরকারি পার্ব্বতী রাঁধিয়াছে দেখিয়া স্মিত মুখে বলিল

"তুমি বাঙালী রান্না শিখে এসেছ? কিন্তু এত মশলায় আমার শরীর অসুস্থ হয়। খুব সাদাসিধা রান্নায় ঝঞ্ঝাটও কম, শরীরও সুস্থ থাকে। কাশীর বাড়ীতে বুঝি এই রকম রান্না হোত?"

পার্ব্বতী কাশীর বাড়ীর রন্ধন. ভোজনের গল্প আরম্ভ করিল। ক্রমে সে বাড়ীর সকলের আচার ব্যবহারের ভদ্রতা ও শিষ্টতার কথা আসিয়া পড়িল। কর্ত্তাদের উদার কর্ত্তৃত্ব, গৃহিণীদের সতর্ক-নিপুণ গৃহিণীপণা, ছোট ছেলে-মেয়েদের সভ্যতার কথা হইল। বৃহৎ পরিবারের ভিতর, সকলের চোখের আড়ালে,—বাড়ীর নব-বিবাহিত বর-বধূদের দাম্পত্য-লীলার কথা ক্রমে আসিয়া পড়িল। খন্তব এবার বাধা দিয়া বলিল, "যাক, যাক। ওসব কথা যাক। দিদিমণিকে সবাই কেমন যত্ন-শ্রদ্ধা করতেন বল ত।"

পার্ব্বতী সাড়ম্বরে সে কাহিনী বর্ণনা করিল। বিধবা পুত্রবধূকে শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেবরগণ কত স্নেহ যত্ন সম্মান করিয়া চলিতেন, তাহার স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার প্রতি সকলে কত দৃষ্টি রাখিতেন, বধূর ধর্ম্ম-চর্চ্চায় সুবিধা দিবার জন্য, সকলে অর্থে-সামর্থ্যে কত ত্যাগস্বীকার করিয়া চলিতেন, পার্ব্বতী তাহার বিস্তৃত বিবরণ বলিল। খন্তব আনন্দিত হইল। বলিল, "ভদ্রলোকের বাড়ী, মা কমলার কৃপা আছে,—কাযেই সেখানে ওই রকম সম্ভব। কিন্তু আমাদের গরীবের ঘরে,—অভাবে স্বভাব নষ্ট। নিজের স্ত্রীপুত্রকে প্রতিপালন করাই দায়,—বিধবা, নাবালকদের পুষ্‌ব কি করে? এই তোমার যদি আজ ওই রকম অবস্থাপন্ন আত্মীয়-স্বজনরা থাকতেন, তাহলে কি পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করতে দিতেন? না আমার ঘরেই তোমায় আস্‌তে দিতেন?"

পার্ব্বতী বলিল, "অভাবে না দিলেও স্বভাবে দিতেন। কাশীতে ওঁদের বাড়ীর পাশেই একঘর বাঙালী বড়লোক ছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে সতের

বছরের বিধবা মেয়ে সঙ্গে নিয়ে একজন বিধবা রাঁধুনী রয়েছেন। তাঁর দুই ভাই লক্ষপতি। বাপের বিষয় নিয়ে ভাইরা আমোদ প্রমোদ করে ওড়াচ্ছেন! কিন্তু বিধবা বোনকে, ভাগিনেয়ীকে দাঁড়াবার জন্য এতটুকু কুঁড়ে দেন নি, এক মুঠো ভাত দেন নি। সবাই কি অভাবে হীন হয়? স্বভাবে—”

“হাঁ, স্বার্থপরতায় অন্ধ হলেও অনেকে হীন হয়। আচ্ছা, তুমি ফের সাগা করছ শুনে, দিদিমণি কি বল্‌লেন?”

পার্ব্বতী একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, “শুন্‌লেন সাগা না করলে, এরা বস্তির মধ্যে আমাকে থাক্‌তে দেবে না, তোমাকেও সুস্থির হতে দেবে না,—তাতে আর কি বল্‌বেন? শুধু বললেন, ‘ধর্ম্মে মতি রেখ। সে লোক ভাল। তার হাতে পড়্‌ছ, খুব ধর্ম্ম-চর্চ্চা করবার সুবিধা পাবে। দুজনে সাধন-ভজন কোর, সুখী হবে’।”

উৎসাহ-প্রফুল্ল-মুখে খন্তর বলিল, “কাযের কথা। সুখী হতে চাও, ভগবানের চরণে আত্মদান কর। তুমি সেখানে দিদিমণির কাছে থেকে যেমন ভাবে সাধন-ভজন কর্‌তে,—এখানেও ঠিক তেম্নি কোর। রাগ-তাপ, হৈ-চৈ, ভূত-প্রেত এসব নিয়ে মিছে সময় নষ্ট কোর না। বেশ শান্ত-শিষ্ট হয়ে সাধন-ভজনে মন লাগাও। আমার মা-বাপ ওই রকম ছিলেন। তাঁরা খুব সুখে দিন কাটিয়েছেন।”

“তা ত হোল, তুমি যে পাতে রুটি তরকারি ফেলে উঠ্‌ছ?”

“আর খেতে পার্‌ব না—” খন্তর জলের গ্লাস মুখে তুলিতে উদ্যত হইল। পার্ব্বতী তাহার হাত ধরিল। জিদের স্বরে বলিল, “স্পষ্ট বলছি, অত সাধুগিরি আমার কাছে পোষাবে না। খাও।”

“কি মুস্কিল! খেতে পার্‌ব না, এতে সাধুগিরির কি দেখ্‌লে? অনেক খেয়েছি, পেট ভরে গেছে—”

পার্ব্বতী অধিকতর উগ্র জেদের স্বরে বলিল, "কক্ষনো নয়। যা দিয়েছি সব খাও। না খেলে উঠ্‌তে দেব না…।"

অস্বাভাবিক উগ্রতার সহিত সে এমন পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল যে খন্তর বিস্মিত না হইয়া পারিল না। তর্ক-বিতর্ক এড়াইবার জন্য অনিচ্ছা-সত্ত্বে আরও কিছু খাইল।

পার্ব্বতী সহসা উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল! সে এমন অসংযত আবেগে হাসিতে লাগিল যে, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, চোখে জল আসিয়া পড়িল!

অকারণে এই অসাময়িক অসংযত হাসি দেখিয়া খন্তর খানিক অবাক্ হইয়া রহিল। ধীরে বলিল, "কি হোল বল ত?"

অতি কষ্টে হাসি সংযত করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "তোমার জিদ্ ভাঙতে পেরেছি, তাই হাস্‌ছি। খেয়েছ ত? ঠকে গেছ ত?"

আশ্চর্য্য হইয়া খন্তর বলিল, "এর জন্যে এত হাসি? আমি ভাব্‌ছি—আর কিছু দুর্ঘটনা! নাও, খেয়ে এস।"

উঠিয়া, আঁচাইয়া সে ঘরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতী আহারাদি শেষ করিয়া ঘরে গেল। দেখিল খন্তর চোখ বুজিয়া নিজের শয্যায় পড়িয়া আছে। নিকটে আসিয়া বলিল, "ঘুমুলে না কি?"

চোখ বুজিয়াই খন্তর উত্তর দিল, "উহুঁ, ছুটির দিনে আমি দিনে ঘুমুই না। অনেক খেয়েছি, তাই একটু আলস্য ধর্‌ছে। তোমার খাওয়া হয়েছে?"

"হাঁ।"

"একটু শোও গে যাও।"

পার্ব্বতী কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খন্তর তন্দ্রালস চক্ষে চাহিয়া বলিল, “ঘুমুবে না ?”

তীব্র অভিমানভরে পার্ব্বতী বলিল, “তবু বল্‌তে পার্‌লে না যে ‘আমার কাছে একটু বস’।”—

স্মিতমুখে খন্তর বলিল, “বস্‌বে এখানে ? বস, বস।”—সরিয়া শুইয়া সে পার্ব্বতীকে বসিবার স্থান দিল।

পার্ব্বতী বসিল।

পা দু’খানা গুটাইয়া, বাঁ হাতে মাথার ভার রাখিয়া খন্তর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল। তার পর চিন্তা-গম্ভীর মুখে বলিল, “ঘরের কথা,—যা তুমি আর আমি ছাড়া কারুর জানা উচিত নয়,—সে সব কথা বাইরে যায় কেন ?”

বলিয়াই মনে হইল, কথাটা অত্যন্ত মুরুব্বিয়ানা ধরণে—কৈফিয়ৎ চাওয়া মত হইয়াছে। চাহিয়া দেখিল পার্ব্বতীর মুখ চকিতে অপ্রসন্ন হইয়া গিয়াছে! আত্মত্রুটি সংশোধনের জন্য তাড়াতাড়ি বিনীত অনু-রোধের স্বরে বলিল, “ওরকম পাগ্‌লামো ওদের কাছে কোর না। ভৌজির কথাগুলো তখন হেসে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু ভাব দেখি, এই সব তুচ্ছ কথা মেয়ে-মহলে নানান্‌খানি হয়ে রট্‌বে। শেষে হয়ত এমন গুজবে দাঁড়াবে, যা কাণে শোনবার নয়। এখানকার এই অল্পবুদ্ধি মেয়েদের কাছে নিজের ঘরের কোন কথা বোল না। বুঝ্‌লে ?”

ঘোরতর অসন্তুষ্ট ভাবে পার্ব্বতী বলিল, “তুমি নিন্দের কায্ কর্‌বে তাতে দোষ নেই ? আমি সে কথা কারুর কাছে বল্‌লেই দোষ ? সকাল-বেলা আমার হাত থেকে চাদরখানা কেড়ে নিলে—”

“তুমি কোন্ আক্কেলে আমাকে বড় ভাইয়ের কাছে মিথ্যে কথা বল্‌তে বললে ? নিজের দোষটা ভাব—”

প্রবল তাচ্ছিল্যভরে পার্ব্বতী বলিল, “অত ভাবাভাবি আমার দ্বারা

পোষাবে না। স্পষ্ট বলে রাখ্‌ছি,—অমন কোর না। আমি নিজের ইচ্ছামত, খুশীমত চল্‌ব। খিট্‌ খিট্‌ কর কেন ?"

ক্ষোভের সহিত ক্লিষ্টস্বরে খস্তর বলিল, "অবুঝের মত জীবন কাটাতে চাও ? নিজের স্বেচ্ছাচার দমনের জন্য কোন শিষ্টাচার মান্‌তে রাজী নও ? তুমি ভুল করছ। না, না, আমিও ভুল করেছি। দূর থেকে দেখে মনে করেছিলাম, শোক-তাপের ঘা খেয়ে তুমি কিছু শিক্ষা পেয়েছ। মানুষের সকল দুঃখের মূল যে প্রবৃত্তিগুলো,—সেগুলা সংযত কর্‌তে পেরেছ। কিন্তু এত লঘু-চিত্ত তুমি ? যদি এমন করে চল, তোমার ছেলে মেয়েরাও ত তাহলে অবুঝ আহাম্মক হবে! হীনবুদ্ধি মা, নিজের ছেলে-মেয়েদের যত শত্রুতা করে, এত শত্রুতা কেউ কর্‌তে পারে না—"

হঠাৎ খস্তরের বুকের কাছে মাথা রাখিয়া পার্ব্বতী শুইয়া পড়িল। অধীর ঔৎসুক্যে, প্রবল ব্যগ্রতায়, দু'হাতে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, "না পারে, নেই পার্‌বে! বয়ে গেল! তুমি আমায় ভালবাস কি না বল দেখি ?"

অকস্মাৎ এতটা অগ্রসর!—মন ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না! খস্তর আরক্ত মুখে স্তব্ধ নির্ব্বাক!

পার্ব্বতীর কথা শুনিয়া বুঝিল, খস্তরের বকিয়া মরাই সার হইতেছে, পার্ব্বতী সে কথায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিতেছে না। অথবা সে কথার মর্ম্মগ্রহণের ক্ষমতা তাহার আদৌ নাই। কিন্তু সেজন্য ততটা নয়।—পার্ব্বতীর উদ্দাম চাঞ্চল্যপূর্ণ ব্যবহারটা খস্তরের রুচির পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত অস্বস্তিপ্রদ বোধ হইল। হউক বিবাহিতা স্ত্রী,—তা বলিয়া প্রবৃত্তি সংযমের আবশ্যকতা, আচার নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, ভবিষ্যৎ সন্তানদের কল্যাণ-কামনার তপস্যার কথা, ভুলিয়া যাইতে হইবে?…দৈহিক

সংস্রবগত এই অসাময়িক উদ্দাম-মত্ততা,—ইহা নিজেদের দেহ-মনের স্বাস্থ্য-ধ্বংসকারী।—আর সন্তানদের পক্ষে?···পাশব-লালসা-প্রসূ, নিকৃষ্ট-মস্তিষ্ক-সৃষ্টিকারী, দেহ-মনের স্বাস্থ্য-শক্তি-নাশকারী,—ভয়াবহ অকল্যাণ!

২০

পর মুহূর্ত্তে আত্ম-সম্বরণ করিয়া খন্তর উঠিয়া বসিল। পার্ব্বতীর হাত দু'টা ধরিয়া ধীরভাবে বলিল, "আমার হাতুড়ি-পেটা হাত, বুঝলে? গায়ের জোরে যদি টেনে ছাড়াই, তোমার হাত দু'খানি মুট্ মুট্ করে ভেঙে যাবার ভয়। মান রেখে বলছি, নিজে ছাড়। আগে আমার কথা শোন, তার পর তোমার কথার জবাব দেব।"

পার্ব্বতী হাত সরাইয়া লইল। ঝঙ্কার হানিয়া বলিল, "বল, তোমার কথাই শুন্‌ছি।"

মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া খন্তর নীচে নামিল। শান্তভাবে বলিল, "অত রাগভরা মন নিয়ে আমার কথা শুন্‌তে হবে না। তোমার মেজাজ সুস্থ হোক, তার পর বল্‌ব।"

অস্ত্রের বাক্স খুলিয়া হেঁট হইয়া কতকগুলা যন্ত্র বাছিয়া বাহির করিতে করিতে শান্ত নির্ব্বিকার মুখে পুনশ্চ বলিল, "আহাম্মক স্বামী আর আহাম্মক স্ত্রীরাই ভালবাসার ওজন, যাচাই, দর-দাম নিয়ে রাত দিন চেঁচামেচি দাপাদাপি করে। ঘটে এতটুকু বুদ্ধি থাক্‌লে ও-কথা মুখে আন্‌তে মানুষ লজ্জা বোধ করে।—নরনারীর ওই ধরণের ভালবাসা ত খাঁটি আসক্তি! মদের নেশা! সে মাৎলামির ভূত কাঁধে আমার চেপেছিল, সে ত জানই।"

সজল নয়নে উত্তেজিত স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "স্পষ্ট বল, আমায় দু'চক্ষে দেখ্‌তে পার না। একটুও ভালবাস না।"

"স্বার্থের খাতিরে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসতে বাধ্য। আমি ত সৃষ্টিছাড়া কেউ নই। নিজের গরজে—হাঁ—তোমাকে ভালবাসি।—তা বলে তোমার আহাম্মকিগুলোকে? উহুঁ, সে আব্‌দার চল্‌বে না।"

"হাতুড়ি বাটালি বেরুচ্ছে কেন? এর মধ্যে কি গোল?"

খন্তর প্রশান্তমুখে বলিল, "দুয়ারের হুড়্‌কো ঢিলে হয়ে গেছে। এঁটে দিয়ে আসি। ততক্ষণে রাগটি একদম সাম্‌লে নাও। না হলে তোমার সঙ্গে কথা চল্‌বে না।"

কয়েকটা যন্ত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে পুনরায় ঘরে ঢুকিল। অস্ত্রগুলা বাক্সে রাখিয়া পার্ব্বতীর দিকে চাহিল। দেখিল সে পূর্ব্বস্থানে শুইয়া আছে। তাহার চোখের পাতা আরক্ত, স্ফীত।

দু'জনে দু'জনের দিকে চাহিয়া ক্ষণেক স্তব্ধ রহিল।

পার্ব্বতী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "গোল হুড়্‌কো আঁটা?"

মৃদু বিস্ময়ভরা ভৎর্সনার স্বরে খন্তর বলিল, "তুমি সেই ছুতোয় কচি-খুকির মত খানিক কেঁদে নিলে? অদ্ভুত মানুষ তুমি! কেনই যে হাস্‌ছ, কেনই কাঁদ্‌ছ, কিছু বুঝ্‌তে পারছি না। তোমার শরীর কি ভাল নাই? সত্যি কথা বল!"

রাগিয়া উঠিয়া পার্ব্বতী বলিল, "কার ধার করে খেয়েছি? শরীর ভাল থাক্‌বে না কেন? বাজে বক্‌তে হবে না। ঘুমুবে? ঘুমোও না একটু। এস, কথা শোন—"

"না, আজ রাত্রে আমার ছুটি আছে। দিনে ঘুমিয়ে শরীর নষ্ট কর্‌ব না।"

কঠিন পরিশ্রমে খস্তরের সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। ভিজা গামছায় গায়ের ঘাম মুছিতে মুছিতে নিজ মনে বলিল, "ক্রোধ, লোভ, মোহ,—এই সব রিপুগুলো সংযত করতে না পারা দুর্ব্বল মনের চিহ্ন। অসুস্থ চিত্তের লক্ষণ। বেয়াড়া মেজাজটি সংশোধন কর। নইলে নিজেও জ্বালাতন হবে, আমাকেও বিব্রত করবে। ভালবাসা গায়ের জোরে আদায় করা যায় না, গুণের জোরে আদায় হয়, সেটা জান বোধ হয়?"

পার্ব্বতী কোন উত্তর না দিয়া অন্য দিকে পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

খস্তর ঘরের মেঝেয় শতরঞ্জি বিছাইয়া একখানা হিন্দী খবরের কাগজ লইয়া পড়িতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে কাগজ রাখিয়া গীতা পড়িতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ এক সময় দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, পার্ব্বতী আবার এদিকে মুখ ফিরাইয়াছে এবং স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। খস্তর একটু হাসিয়া বলিল, "ঘুমোও নি? বড় গুমোট আজ। এ গরমে ঘুম হবে না। এস, একটু সৎপ্রসঙ্গচর্চ্চা করা যাক। গীতায় ভগবান বল্ছেন "ইন্দ্রিয়গুলা আমাদের পরম শত্রু। অবশ্য অজিত-ইন্দ্রিয়।... যিনি ভগবানকে জান্বার জন্যে, এই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তিনিই যথার্থ ক্ষত্রিয়।..."

গীতার মর্ম্ম ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল। পার্ব্বতী আত্মবিস্মৃত হইয়া, নির্ব্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে খস্তর মুগ্ধ-বিস্ময়ে বলিল, "কি সুন্দর কথা। গীতায় মনের সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। খুব ভাল লাগ্ছে, নয়?"

অনিচ্ছার সহিত অনুযোগ-পীড়িত স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "লাগছে। কিন্তু ধর্ম্মচর্চ্চার কি সময় নেই? এখন...?"

নাঃ, সদুপদেশের অর্থ এই মূঢ়-নির্ব্বোধকে বোঝান তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য !···কিন্তু হাল ছাড়িলে চলিবে না।—স্বামী সে। সহধর্ম্মিণীকে সুশিক্ষা দিয়া, সুস্থ-প্রকৃতির সুগঠিতা-চরিত্রের স্ত্রীরূপে গড়িয়া লইতে হইবে। চেষ্টা, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য চাই-ই চাই।

প্রশান্ত দৃষ্টি তুলিয়া খন্তর বলিল, "ধর্ম্মচর্চ্চার সময় অসময় ? তোমার দোষ নাই। অনেক প্রবীণ—যাঁদের আমরা বিজ্ঞ বলি, তাঁরাও এম্নি মন্তব্য করে থাকেন। আশ্চর্য্য ! শাস্ত্র বলেন "যুবা-বয়সে ধর্ম্মশীল হওয়া উচিত, কেন না জীবন অনিত্য।"—কিন্তু আমরা যা এখন অভিভাবকদের কাছে উপদেশ পাই—তার মানে, "যুবা বয়সে অধর্ম্মশীল না হওয়াই অন্যায় !"—সেদিন—"

বাহির হইতে ব্যগ্রকণ্ঠে কে ডাকিল, "মিস্ত্রি, খন্তর মিস্ত্রিজী—"

সাড়া দিয়া খন্তর গবাক্ষের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। লোকটা সেখানে আসিয়া অতিশয় ব্যস্ততার সহিত কি বলিল। খন্তর সাগ্রহে বলিল, "হাঁ হাঁ, আমি এখনি যাচ্ছি। বলগে।"

আরও দু একটা কথা বলিয়া লোকটিকে বিদায় দিয়া, খন্তর ফিরিল। গীতাখানা মাথায় ঠেকাইয়া যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে বলিল, "আমার জায়গায় যে লোকটি কায করছিল, তার আজ 'হায্‌জা' ধরেছে। ওদিকে টানেলের কাছে মাঝপথে এক ইঞ্জিনের কি ব্যায়রাম ধরেছে। চল্লুম, উপরি কিছু পাব।"

জামা গায়ে দিয়া মাথায় পাগড়ি জড়াইতে জড়াইতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে অর্থসূচক কটাক্ষক্ষেপ করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "ভাগ্যে ঘুমুই নি। কাঁচা ঘুম ভেঙে এখন ছুট্‌তে হলে কষ্টের সীমা থাক্‌ত না। কাযেও মন লাগ্‌ত না।"

তার পর নিজ মনেই গীতার হিন্দী অনুবাদ আবৃত্তি করিতে লাগিল—

কাম ক্রোধ লোভ, তিন নরকের দ্বার।
ইহারা, গাণ্ডীবধারি, আত্মজ্ঞাননাশকারী ;
তাই তুমি এই তিনে কর পরিহার।"

পার্ব্বতী শুইয়া শুইয়া সব দেখিল, শুনিল। এবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "আজ তোমার ছুটি, নয় ?"

খস্তব বলিল, "হাঁ। 'ওভার টাইম' দেবে। জরুরি কায। শোন, আমি কখন ফিরব, তার ঠিক নেই। তুমি রান্না খাওয়া সেরে সন্ধ্যার আগেই তোমার বোনের বাড়ী যেও। কিছু খাবার আমার জন্যে ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে যেও। যদি রাত্রে ফিরি, খাব।"

পার্ব্বতী এবার উঠিয়া বসিল। গভীরতর সন্দেহের সহিত বলিল, "রাত্রে ফিরবে না ? খাবে কি ? থাকবে কোথা, শুনি ?"

প্রশ্নের উচ্চারণভঙ্গীতে খস্তর মনে মনে বিরক্ত হইল। এ কি সন্দিগ্ধ স্বভাব ? দাম্পত্যজীবনে যদি বিশ্বাস-নির্ভরতার নিষ্ঠা না থাকে, পদে পদে যদি প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি হানে—তবে জীবন যে বিষাইয়া উঠিবে। খস্তর যদি সত্যই অসচ্চরিত্র হইত, পার্ব্বতীর সন্দেহ-কশাঘাত মাথা হেঁট করিয়া সহ্য করিত। অনর্থক এ কি পীড়ন ?

বিরক্তি চাপিয়া শান্তভাবে বলিল, "রেলের চাকরি। প্রতি দিন লক্ষ লক্ষ লোককে জেগে রাত কাটাতে হয় লাইনে,—ষ্টেশনে। আমাকেও তাদের সঙ্গে থাকতে হবে, খেতে হবে। এতদিন হয়েও আসছে তাই। তবে যদি ফেরবার সুবিধা পাই ঘরে এসেই খাব, ঘুমুব। কিন্তু তুমি সন্ধ্যায় শনিচরের বাড়ীতে চলে যেও। বেশী রাত পর্য্যন্ত একা এখানে থেক না। আমি যখন আসব, তোমায় ওখান থেকে ডেকে নেব।"

ক্রূর দৃষ্টি হানিয়া পার্ব্বতী বলিল, "ডেকে নেবে কেন ? আমায় তোমার কোন দরকার ত নাই।"

খন্তর হেঁট হইয়া ধুলা ঝাড়িয়া জুতা পরিতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না। মৃদু হাসিল মাত্র।

পার্ব্বতী চঞ্চল দৃষ্টিতে ঘন ঘন খন্তরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহসা ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "চেহারাটা ভাল কি না, তাই অহঙ্কারের শেষ নাই। আর ওই মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসি,—ওটা দেখ্‌লে রাগ ধরে! কার মন ভোলাতে যাচ্ছ, শুনি?"

খন্তর পরিহাস ভরে বলিল, "তোমার!"

পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া পার্ব্বতীর হাতে দিল। বলিল, "রাখ। দোকান থেকে কোন জিনিস আনাতে হয় ত এবাড়ী ওবাড়ীর ছেলেদের কাউকে দিয়ে আনিও। আমি তাহলে?"

অকস্মাৎ ব্যাকুল আগ্রহে খন্তরকে জড়াইয়া ধরিয়া পার্ব্বতী আকুল উৎকণ্ঠায় বলিল, "বল শীগ্রি আস্‌বে?"

খন্তর চম্‌কাইয়া উঠিল! মন ভয়ানক বিচলিত হইল! দৃঢ়শক্তিতে আত্মদমন করিয়া অপ্রসন্ন মুখে ক্ষণেক স্তব্ধ রহিল। তার পর একটু ক্ষোভ-মিশ্রিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "দেখ, এখন আমার কাযের সময়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কায করতে দাও। রাত্রে আস্‌বার জন্যে খুব চেষ্টা করব। কিন্তু পরের চাকরি!—যদি না আস্‌তে পারি, ভেব না।"

বলিতে বলিতে সযত্নে তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে আশ্বাসের স্বরে বলিল, "ছুটি হলেই বাড়ী আস্‌ব, এ তো জান। কেন ছেলেমানুষি করছ? ছাড়।"

অধীর আগ্রহে পার্ব্বতী বলিল, "একটা কথা বল। আর কাউকে ভালবাস না ত?"

ঈষৎ বিরক্তির সহিত খন্তর বলিল, "কি বাজে বকো, লজ্জা করে না

বল্‌তে ?···শোন, একা রইলে,—মন খারাপ কোর না। শনিচরের ছেলেদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওদের নিয়ে গোলমাল করে সময় কাটিও।"

"ছুটি হলেই আসবে ত ?"

"নিশ্চয়।"—বলিয়া পার্ব্বতীর হাত ছাড়াইয়া সরিয়া গেল। তার পর কোন দিকে না চাহিয়া অতিশয় ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি এগারটার সময় খন্তর ফিরিল। শনিচরের বাড়ী গিয়া ডাক দিল, "ভেইয়া—"

গ্রীষ্মের রাত্রি, তখনও কেহ ঘুমায় নাই। কথাবার্ত্তার শব্দে বুঝা গেল অন্তঃপুরের আঙিনায় সকলে জটলা করিতেছে। শনিচর সস্ত্রীক বাহির হইয়া আসিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি রে, আমায় ডাক্‌ছিস কেন ?"

"বাড়ীর চাবিটা চাই।"

"আর কিছু চাই না ত ?"

"সেটা ভৌজির বিবেচনায় যা হয়।"

ভৌজি মাথা নাড়িয়া বলিল, "তার রাগ হয়েছে। আজ যাবে না। কি গো, থাক্‌বে সে ?"

খন্তর বুঝিল কথাটা পরিহাস। স্মিতমুখে বলিল, "স্বচ্ছন্দে। কিন্তু চাবিটা এ গরীবের চাই। খেটে খুটে শ্রান্ত হয়ে এসেছি—"

স্বামীর দিকে চাহিয়া শনিচরের স্ত্রী বলিল, "দেখ্‌লে তোমার ভাইয়ের দেমাক! তুমি যে বিশ্বাস করতে চাও না!"

হাসিতে হাসিতে শনিচর বলিল, "এ সব কি শুন্‌ছি রে খন্তরা ? এরা যে তোর নামে নানা কথাই বল্‌ছে। এত গঞ্জনাই বা সইছিস্ কেন ? মানিয়ে নিয়ে চ' না।"

নিরুত্তরে একটু হাসিয়া খন্তর পকেট হইতে চুণের কৌটা ও দোক্তা পাতা বাহির করিয়া "খৈনি" মর্দ্দনে মনোনিবেশ করিল।

শনিচর তেমনি ভাবে হাসিতে হাসিতে পুনরায় বলিল, "না রে খন্তরা, অবুঝ হোস্ না। ওটা 'বুনো-চিড়িয়া'—"

খন্তর সহাস্যে বলিল, "বুনো বটে, কিন্তু চিড়িয়া মোটেই নয়। দস্তুর মত———"

ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "বল্‌ব ভৌজি? রাগ কর্‌বে না ত?"

ভ্রাতৃজায়া বলিল, "কর্‌ব বৈ কি। আমার বোনকে তুমি যা-তা বল্‌বে, সে আমার ভাল লাগবে কেন? তুমি তার মনে দুঃখ দেবে, তার সঙ্গে ভাল করে কথা কইবে না—হাসি গল্প কর্‌বে না, এই বা কি কথা?"

শান্তহাস্যে খন্তর বলিল, "থাক্। ও বেলা এক দফা বকুনি দিয়েছ, এ বেলা এক দফা। বোন লক্ষ্মী খুব নালিশ চালাচ্ছে, না? লক্ষ্মীটি বেশ!"

"নারায়ণটিও বেশ! এতই বা এক-রোখা জিদ্ কেন? কেবল ধর্ম্ম নিয়ে মেতে থাক্‌বে? স্ত্রীকে ভালবাস্‌বে না? আদর কর্‌বে না—"

"আঃ, কি মুস্কিল! আর বাড়াবাড়ি কোর না, থাম।"

শনিচর সহাস্যে বলিল, "বোকামি ত তোরই! তুই এমন বেকুব, তা জানতাম্ না। আমার কাছে খানিক বুদ্ধি ধার নে। বুঝ্‌লি? শুন্‌বি আমার পরামর্শ?"

ভাল, ভাল! খন্তরের কাছে দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ। সেই দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে গিয়া এ কি হইল? ··· অব্যবস্থ-চিত্ত স্ত্রীর মূঢ়-অসহিষ্ণুতায় সে হইয়া দাঁড়াইল সাধারণের

গঞ্জনার পাত্র? এখন এই সব অসংযমী দম্পতীর কাছে তাহাকে শিখিতে হইবে ইহাদের রুচি-অনুযায়ী দাম্পত্য-লীলা?...নচেৎ সংসারে, সমাজে সে নিজেকে বেমানান্ করিয়া ফেলিবে?

"নারায়ণ, নারায়ণ!" বলিয়া শনিচরের হাতে একটিপ্ খৈনি দিয়া নিজের মুখে একটিপ্ ফেলিল। থুতু ফেলিয়া সহাস্যে বলিল, "গরমে খেটে-খুটে এসে প্রাণ আন্‌চান্ করছে। এখন পরামর্শ শোন্‌বার ধৈর্য্য নেই, মাপ কর।"

ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "ডেকে দাও।"

"নিজে ডাক না—"

"তোমরা সামনে থাক্‌তে? চাচিও ওখানে আছে বোধ হয়?"

ভ্রাতৃজায়া অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিল, "তাঁর কাছে শুয়ে পার্‌বতিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। যাও, উঠিয়ে আন।"

"রাম কহো। ঘুমুক তাহলে। চাবিটা এনে দাও।"

"যতই বল,—কোন আব্‌দার টিক্‌বে না। আজ যদি তার পায়ে ধরে মাপ না চাও, তাকেও পাবে না—চাবিও পাবে না।"

খন্তর হাসিল। বলিল, "গৃহলক্ষ্মী তনও সব,—শ্যাওড়া গাছের—সেই কি যেন? দোষ করি নি, ঘাট করি নি—খামকা পায়ে ধর্‌ব? মাথায় তুল্‌ব? কেন? জাহান্নামে গেছি? এ বান্দা অতটা ভেড়া নয়।... আমার বিবেচনায় তার ভালর জন্যে যা করা উচিত,—করে যাচ্ছি। তাতে উল্টো বুঝে রাগ করে—আমি নাচার! নেহাৎ চাবি দেবে না?"

ভ্রাতৃজায়া কিঞ্চিৎ নরম হইয়া বলিল, "অন্ততঃ এইখানে থেকে মাপ চাও। বল, এবার থেকে তার হুকুম মত চল্‌বে।"

খন্তর মাথা নাড়িয়া ধীরভাবে বলিল, "না। নির্ব্বোধের অন্যায়কে আস্কারা দেবার মত শোচনীয় বুদ্ধি এখনো আমার হয় নি। মাপও চাইব

না,—চাবিও নেব না। আমি পাঁচিল টপকাতেও জানি, কুলুপ খুলতেও জানি। কিন্তু তোমরা যদি রাগ করে বাড়ী ঢুকতে দিতে না চাও, রাগকে খাতির করব।"

পকেট হইতে গোটাকতক কচি আম বাহির করিয়া ভ্রাতৃজায়ার হাতে দিয়া মৃদু হাস্যে বলিল, "পাহাড়ে গাছের আম। তুই বোনে খেয়ে দেখো,—কেমন? বচনের জন্যে ভক্তি উপহার, জান্‌লে?"

শনিচরের দিকে চাহিয়া বলিল, "চল্‌লুম ভেইয়া। বুড়ো ঝব্বু মিস্ত্রীর কলেরা হয়েছে। সেবার লোকের অভাব নেই, ছেলেমেয়েরা কাছেই আছে। আমিও যাই—বুড়োর তদারক করে রাতটা বেশ কাটাব।"

খন্তর যথার্থ-ই প্রস্থানোদ্যত হইল। শনিচর বাধা দিল। মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতায় হুট্‌পাট্‌ শব্দে, তীর-বেগে ছিটকাইয়া পার্ব্বতী বাহির হইল! ছো মারিয়া ভগিনীর হাত হইতে কয়েকটা আম লইয়া চাপা গলায় বলিল, "খেয়ে যেতে বল। খাবার নষ্ট করলে চল্‌বে না।"

চাবি হাতে সে অন্ধকারেই অগ্রসর হইল।

খন্তর দু-হাতে বুক ছাদিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল—সঙ্গে গেল না।

শনিচর বলিল, "যা রে। রাস্তায় ভূতের পাল কিল্‌ বিল্‌ করছে—"

বলা বাহুল্য শেষ সংবাদটা পার্ব্বতীর উদ্দেশেই নিবেদন করা হইল। মুহূর্ত্তে অস্ফুট চীৎকারে আঁৎকাইয়া পার্ব্বতী ফিরিল। খন্তরকে ঠেলা দিয়া শনিচর বলিল, "যা যা—"

"উহুঁঃ"—খন্তর স্মিতমুখে নিশ্চল!

পার্ব্বতী শনিচরের উদ্দেশে সকোপে বলিল, "কেন ভয় দেখালে? দাঁড়াবে এস। তোমাকেই আস্‌তে হবে।"

আলো লইয়া শনিচর হাসিতে হাসিতে পার্ব্বতীর সঙ্গে চলিল। আশা—খন্তর এবার বাধ্য হইয়া তাহার অনুগমন করিবে।

কিন্তু তথাপি খন্তরের নড়িবার লক্ষণ দেখা গেল না। ভ্রাতৃজায়া এবার একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া বলিল, "নাঃ, এবার আমাকেই হার মানালে! চল বাপু, আমিই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। দেরী হলে সে আবার আমাকেই গাল দেবে। যে অস্থির মানুষ। এতক্ষণ তোমার জন্যে হান্‌টান্ করে মরে যাচ্ছিল—সাতবার পথ দেখছে।"

লজ্জিত হইয়া খন্তর বলিল, "কি ব্যস্তবাগীশ মানুষ বল ত! এত অত্রা[illegible] হলে চলে? জানে পয়সার ধান্ধায় বেরিয়েছি, তবু—"

চলিতে চলিতে ভ্রাতৃজায়া বলিল, "কি জান? এতদিনের পর মনের মত স্বামী পেয়েছে। তোমার উপর বড্ড মায়া পড়েছে, একদণ্ড চোখের আড়াল করতে চায় না—"

ভ্রাতৃজায়ার অনুগমন করিতে করিতে খন্তর সহাস্যে বলিল, "নেশা কেটে গেলেই, দেখো! হয়ত দু' চক্ষের শূল হব!"

"বালাই ষাট্!"—নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভ্রাতৃজায়া নিম্নস্বরে বলিল, "তোমার মত লোক তা হতে পারে না। সে বটে, সেই বদমেজাজে লোকটা। ঘর সংসার করেছিল, ছেলে-পিলেও হয়েছিল, খেতে পরতেও দুঃখ পায় নি—সব সত্যি। কিন্তু দু'জনের মনের মিল মোটে হয় নি। কেউ সুখী হয় নি। বলবে নেশা ভাঙ্ করার জন্যে? বদখেয়ালের জন্যে?...সে আমাদের ঘরে কে না করে? এই তোমার ভাইটি কি কম?...কিন্তু সংসারে সবাইকে নিয়ে মানিয়ে চলছে ত?"

অগ্রবর্ত্তী শনিচর পরম আরামে গোঁফে তা দিয়া বলিল, "মায় তোমাকে নিয়েও! খন্তরা, বোকা ঠকাতে হয় চালাকির জোরে! খানিক চালাকি শেখ্! দেখ্‌বি, ওর মন ভুলে যাবে।"

বিব্রত হইয়া খন্তর বলিল, "আঃ, থাম— ভৌজি রয়েছে।"

ভৌজি সক্ষোভে স্বামীর উদ্দেশে বলিল, "তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না, লোকের মন ভোলাতে তোমার ভাই খুব জানে! সে 'বহু' মরে গেছে, স্বর্গে গেছে। তারও খুব মন ভুলিয়েছিল। আবার আমার বোনটা?···দিব্যি ভদ্দর লোকের বাড়ীতে ছিল, ঘরের মেয়ের মত যত্ন করে তারা রেখেছিল। বেশ তীর্থধর্ম্ম কর্‌ছিল। তোমার ভাইটি আড়ালে তার কাণে কি মন্তর দিলে, তোমার কাছে এসে কি কাঁদুনি যে গাইলে,— অম্নি তার মতি বদ্‌লে গেল! এখন তাকে মুঠোয় পূরে হতশ্রদ্ধা!— ও কি? কি হোল?···"

"ওয়াক্! থু থু থু—" মুখের খৈনি ফেলিয়া, খন্তর রুদ্ধশ্বাসে, স্পন্দিত বক্ষে বলিল, "মাথা ঘুরে গেছে। গা পাক্ দিচ্ছে। কথা কইতে কইতে অন্যমনে বেশী খৈনি মুখে দিয়েছি। ওঃ, শুয়ে পড়্‌তে হোল,—"

বাড়ীর দুয়ার খুলিয়া পার্ব্বতী ও শনিচর সেইমাত্র ভিতরে পা দিয়াছে। তাহাদের পাশ কাটাইয়া খন্তর উর্দ্ধশ্বাসে শয়ন কক্ষে গিয়া জামা জুতা সমেত খাটিয়ায় শুইয়া পড়িল।

যথার্থই দোক্তার ঘোর লাগিয়াছিল। তবু ওষ্ঠপ্রান্তে শীর্ণ ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল! নব-প্রণয়ের লজ্জানুরাগকে পিষিয়া মারিয়া, আজ অনুতপ্তের আত্মধিক্কার চিত্ত মাঝে জাগিতেছে! · ভুল করিয়াছে! অস্থায়ী মোহের মত্ত উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া, শুধু নিজের মনের দিকে চাহিয়া কেন ওই নারীকে সংসারসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল? মূর্খতা করিয়াছে! বিবেচনা করা উচিত ছিল—উহারও মন বলিতে একটা কিছু আছে, এবং সে মন হয়ত খন্তরের চিত্তগতির অনুরূপ পথাবলম্বী না-ও হইতে পারে। বরঞ্চ বিপরীত পথাবলম্বী হওয়াই সম্ভব।

হিসাবী বুদ্ধি সচেতন থাকিলে খন্তর পূর্ব্বেই হিসাব করিয়া বুঝিয়া

লইত,—এই নারী একজন অনাচারী, অসংস্বভাব স্বামীর সহধর্ম্মিণীত্ব পালনে অভ্যস্ত ছিল। কু-অভ্যাসের মোহ অতিক্রম করিবার মত সুশিক্ষা বা মনোবল, তাহার মত অবস্থার নারীর পক্ষে থাকা সম্ভব কি না,—শান্ত মস্তিষ্কে বিচার করিলে খন্তর তাহা সহজেই বুঝিতে পারিত। অনাচার-পূর্ণ দাম্পত্য-জীবন যাপনে যে বাধ্য হইয়াছিল,—সে পত্নীত্বের, মাতৃত্বের, সদাচার পালন অভ্যাস করিবার সুযোগ কোথায় পাইবে? কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে তাহার চিত্ত পূর্ণ হওয়াই ত স্বাভাবিক!

ঘরের বাহিরে উহাদের তিনজনের তর্ক-বিতর্কের শব্দ শোনা গেল। কিন্তু কথার অর্থ বোঝা গেল না। পার্ব্বতী চাপা গলায় ক্রুদ্ধ উত্তেজিত ভাবে একটা কিছু বলিতেছে এবং শনিচর ও তাহার স্ত্রী অবিশ্বাস ভবে প্রতিবাদ করিতেছে, এইটুকু মাত্র বোঝা গেল।

শরীর শ্রান্ত, মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত, মন নৈরাশ্য-অবসাদগ্রস্ত,—এ সময় কোন দিকে চোখ কাণ দিতে ইচ্ছা হইল না। খন্তর কোনরূপে জুতা যোড়া খুলিল। মুরেঠা খুলিয়া তাহার দ্বারা নিজের মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

শনিচর ঘরে ঢুকিয়া আলোটা তাহার মুখের কাছে তুলিয়া বলিল, "কি হোল রে? একবার চা' ত আমার দিকে।"

"কেন?" খন্তর চোখ মেলিয়া চাহিল।

শনিচর আলো ধরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার চোখ মুখ পরীক্ষা করিল। তার পর পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "হুঁঃ! বল্‌ছি, ও কখনো মদটদ খায় না, তবু সেই কথা। এই ত চোখ পরিষ্কার! ও কি আমাদের মত ফাজিল? তাহলে বটে বলতে। ও সে পাত্রই নয়। এই দারুণ গরমে, তপ্ত ইঞ্জিনে হয়ত খেটেছে খুব, তার পর খালি-পেটে খৈনি খেয়ে ফেলেছে; তাই হঠাৎ মাথা ঘুরে গেছে। ও কিছু না, এখনি সেরে যাবে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিরক্ত স্বরে খন্তর বলিল "কি রে? আমার মদ খাওয়ার বদ্‌নাম হচ্ছে না কি?···ভাল।"

উঠিয়া ঘর্ম্মসিক্ত জামাটা খুলিয়া খন্তর একটা বালিশ ও শতরঞ্জি লইয়া বাহিরে রোয়াকে আসিল। রোয়াকের প্রান্তে বাল্‌তিভরা জল ছিল। মাথা মুখ ধুইয়া ভিজা গামছায় গা মুছিয়া শতরঞ্জিতে শুইল। শনিচরকে বলিল, "ভয়ানক খেটে এসেছি। এখনও শরীরটা বে-তাক লাগছে। খেতেও পারব না, ঘুমুতেও পারব না। বস্, একটু গল্প কর।"

ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "ওকে বল খেয়ে শুয়ে পড়ুক। আমার খাবার এখন ঢাকা থাক। এর পর শরীর সুস্থ হলে খাব।"

পার্ব্বতী সম্মত হইল না। কিন্তু ভগিনী পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাকে ধরিয়া রান্নাঘরে লইয়া গেল, জোর করিয়া খাইতে বসাইল।

শনিচর খন্তরের কাছে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। খন্তরের তখনও মাথা ঘুরিতেছিল, বেশী কথা কহিতে পারিল না। "হাঁ, না" দুই একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতী ও শনিচরের স্ত্রী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। শনিচরের স্ত্রী সংক্ষেপে দুই একটা কুশল প্রশ্ন খন্তরকে জিজ্ঞাসা করিয়া, স্বামীর সঙ্গে বাড়ী চলিয়া গেল। পার্ব্বতী সদর দুয়ারে খিল বন্ধ করিয়া আসিয়া খন্তরের পায়ের কাছে বসিল।

খন্তর নীরবে চোখ মেলিয়া চাহিল। কিন্তু পার্ব্বতীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই, আকাশে মৃদু বিদ্যুচ্চমক লক্ষ্য করিয়া, চমকিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি তুলিল। দেখিল শুক্লা সপ্তমীর জ্যোৎস্নাকে যেন গ্রাস করিবার জন্য আকাশের উত্তর প্রান্তে নিকষ কৃষ্ণবর্ণ মেঘদল নিঃশব্দে ঘনাইয়া আসিতেছে। একান্ত নিঃশব্দে মেঘের বুকে মৃদু মৃদু বিদ্যুল্লেখা ক্ষণে ক্ষণে হিল্লোলিত হইতেছে।

অনুভব করিল, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অসহ্য গুমট গাম্ভীর্য্যে স্তব্ধ প্রকৃতি, যেন রুদ্ধশ্বাসে উৎকণ্ঠিত। সমগ্র বায়ুমণ্ডলী যেন মূর্চ্ছাহত, আড়ষ্ট নিস্পন্দ।

খন্তর আবার চোখ বুজিল। ধীরে বলিল, "ঘরে গিয়ে ঘুমোও; আমায় একা থাক্‌তে দাও। শরীর মন এখন বড় অসুস্থ।"

২১

পার্ব্বতী উঠিল না। অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

খন্তর নীরব। সর্ব্বেন্দ্রিয় গভীর অবসাদে অবসন্ন। মস্তিষ্ক শ্রান্তিতে ঝিমাইয়া আসিতেছিল। এ সময় পার্ব্বতীর মত অর্ব্বাচীন জেদি মানুষের সহিত অযথা তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিলে পরিশ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাস্থ্যনাশ অনিবার্য্য। ক্রোধ, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, বৃথা চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়া, খন্তর নির্ব্বিকার ভাবে পাশ ফিরিয়া শুইল; দারুণ অবসাদে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তন্দ্রামগ্ন হইল।

সহসা পায়ের উপর একটা গুরুভার চাপ এবং গহনার হউক বা অসতর্ক নখের হউক—একটা তীক্ষ্ণ আঁচড় বাজিল! তন্দ্রা টুটিয়া গেল। দেখিল পার্ব্বতী তাহার পায়ে মাথা রাখিয়া শুইয়াছে। হাত পা ছড়াইয়া—বিনা দ্বিধায় আলস্য ভাঙিতেছে।

অকাল-সুপ্তিভঙ্গে মগজ তাতিয়া উঠিল। পা সরাইয়া লইয়া একটু রুক্ষ স্বরে খন্তর বলিল, "বুনো জানোয়ারের মত আঁচড়-কামড়,—আমার কাছে ভালবাসার চিহ্ন নয়।"

পার্ব্বতী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

পুনশ্চ চক্ষু বুজিয়া তন্দ্রাভার-জড়িত স্বরে খন্তর বলিল, "মনটাকে একটু

ভদ্র, সংযত কর। তার পর আমার সংস্রবে এস। যাও, এখন কথা বল্‌তে পার্‌ছি না। জিরোতে দাও। ঘরে যাও।"

পার্ব্বতী সভয়ে বলিল, "একলা ঘরে থাক্‌তে পারব না। ভয় করে।"

"নিয়ে এস তোমার শতরঞ্জি। শোও ওইখানে।" মাথার দিকে হাত বাড়াইয়া চোখ বুজিয়াই বেশ খানিক দূরে পার্ব্বতীর জন্য খন্তর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

পার্ব্বতী এবার উঠিল। শতরঞ্জি বালিশ আনিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিছাইয়া, ধীরে বলিল, "চেয়ে দেখ। এইখানে থাক্‌ব?"

খন্তর চাহিল না। নিজের মাথায় পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিল, "শোও। ঘুমোও। আমি খানিক ঘুমিয়ে নিই। তার পর উঠে খাব।"

"খাবার সময় আমাকে জাগিয়ো।"

খন্তর উত্তর দিল না। পার্ব্বতী শুইল। একটু পরে তাহার গাঢ় নিদ্রার পরিচায়ক গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস ধ্বনি শোনা গেল।

কিন্তু একবার ঘুম চটিয়া যাওয়ায় খন্তরের আর ঘুম আসিল না। অবসাদ-ক্লান্ত, স্তব্ধ নিঝুম ভাবে অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল, তবু নিদ্রা আসিল না। ষ্টেশনের ওদিকে ঘণ্টাধ্বনি ও গতিশীল গাড়ীর শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। শেষে মেল ট্রেণের তীব্র বংশীধ্বনি কাণে পৌছিল। বুঝিল রাত অনেকটা হইয়াছে। ক্ষুধাও বোধ হইতে লাগিল। উঠিয়া নিঃশব্দে হাত মুখ ধুইয়া, খাইল। পার্ব্বতীকে জাগাইল না।

গভীর রাত্রে খন্তরের ডাক শুনিয়া পার্ব্বতীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিল। বলিল, "খাবে?"

"খেয়েছি। বৃষ্টি আস্‌ছে, ঘরে চল।"—খন্তর নিজের শয্যা গুটাইয়া তুলিতে লাগিল।

উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল হইয়া পার্ব্বতী বলিল, "খেয়েছ? আমায় জাগালে না? কি খেলে, না খেলে দেখ্‌তে পেলুম না?"

কি মমতা আকর্ষণ! খন্তর ম্লান হাসি হাসিল! বলিল, "ভয় নেই। যা রেখেছিলে, সব খেয়েছি। খেটে-খুটে ঘুমিয়েছ, খামকা কি ঘুম ভাঙাতে পারি?"

তড়্‌বড়্‌ করিয়া বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ হইল। তাড়াতাড়ি নিজ নিজ বিছানা গুটাইয়া লইয়া ছু'জনে ঘরে ঢুকিল।

ছুয়ার বন্ধ করিয়া পার্ব্বতী হতভম্বের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; খন্তরের উচ্ছিষ্ট শূন্য পাত্রগুলা সামনে পড়িয়া ছিল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বার বার সেগুলার দিকে এবং খন্তরের দিকে চাহিতে লাগিল। সম্ভবতঃ সে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যে, খন্তর সত্য সত্য আহার করিয়াছে।

খন্তরের চোখে অত্যন্ত নিদ্রাঘোর ছিল। কোন রকমে নিজের মশারিটা ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। পার্ব্বতীর আচরণে মনোযোগ দিল না।

পার্ব্বতী ধীরে ধীরে গিয়া খন্তরের শয্যার পাশে দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এখন কেমন আছ?"

"ভাল।"

"আর মাথা ঘুরছে?"

"উহুঁ।"

"গা পাক দিচ্ছে?"

"উহুঁ। আলো নিবিয়ে দাও। শোও গে।"

"তুমি আমার উপর রাগ করেছ, নয়? দোষ করেছি, মাপ কর। পায়ে ধরছি।"

পাছে সে যথার্থই পায়ে ধরে, সেই ভয়ে খন্তর ত্রস্তে পা গুটাইয়া

রইল। বলিল, "আঃ, রাত দুপুরে হল্লা করে ঘুম চটিও না। কথায় কথায় যারা পায়ে ধরে, তাদের হাতকে বিশ্বাস নেই। থামকা লোকের গলা টিপে ধর্‌তেও তারা মজবুত! এসব লোক ত 'ভয়ানক-লোক'।"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া পার্ব্বতী বলিল, "তোমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব?"

"না না, রাত জাগ্‌তে হবে না। শরীর নষ্ট করা চল্‌বে না। একে ত, যা ঝঞ্ঝাটে-মেজাজে রয়েছ,—পাছে অসুখে পড়, তাই ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছ। আর হাঙ্গামা কোর না। আমার মাথা খোশ-মেজাজে আছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

"বাতাস কর্‌ব একটু?"

"আঃ! ফের দেখছি ঘুম চটাবে। বেশ ত ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আব্‌-হাওয়া ঠাণ্ডা। বাতাসের বায়না কেন? রাত বেশী নেই আর। শোও গে।"

পার্ব্বতী আলো নিবাইয়া দিয়া, নিজের শয্যায় গেল।

গৃহ নিস্তব্ধ। বাহিরে ঝড় কমিয়া গেল। একটানা বৃষ্টি ঝরিতে লাগিল। বৃষ্টির শব্দ শুনিতে শুনিতে খন্তর নিদ্রামগ্ন হইল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। অতৃপ্ত নিদ্রাঘোর পীড়নে, মস্তিষ্কে তীব্র যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল পাশে বসিয়া কেহ সন্তর্পণে মাথার বালিশটা ঠেলিতেছে! সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিল—স্কন্ধে গহনা-পরা নারীর হাত ঠেকিল।

নিদ্রাবেশে তখন মস্তিষ্ক বিকল, বহির্ম্মনের সমস্ত অনুভূতি হত-চেতন। এই আকস্মিক স্পর্শ-চমক তাহার অবচেতন-মনে—দীর্ঘ—দীর্ঘকাল পূর্ব্বের পরিচিত—একটা বিস্মৃতপ্রায়—প্রিয় স্পর্শের অনুভূতি জাগাইয়া দিল। আপাদমস্তকে নিমেষ মধ্যে যেন তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। রক্তস্রোত

চমকিল, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া অপরিচিত হাতখানা মুঠাইয়া ধরিল। চোখ চাহিতে পারিল না, অস্ফুট স্বরে বলিল, "উঁ? কি?"

"দেশলাইটা নিচ্ছি। জল খাব।" .

ওঃ! পার্ব্বতী!·· সনিঃশ্বাসে হাত ছাড়িয়া দিয়া খন্তর মাথা তুলিল। সরিয়া গিয়া পাশ-বালিশে মাথা রাখিল। আর কথা কহিল না।

পার্ব্বতী মাথার বালিশ উল্টাইয়া, হাত্ড়াইয়া দেশলাই হস্তগত করিল। বলিল, "জল খাবে?"

"উহুঁ।"

"খাও না একটু!"

"উহুঁ। জ্বালাতন কোর না। ঘুমের ব্যাঘাতে মাথায় যাতনা হচ্ছে! উঃ, নারায়ণ, নারায়ণ।" গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া খন্তর নীরব হইল। অপক্ক সুপ্তি জড়তার মাঝে পুনরায় আচ্ছন্ন হইতে চেষ্টা করিল।

পার্ব্বতী সরিয়া গেল। সে আলো জ্বালিতেছে, জল গড়াইতেছে, খাইতেছে,—অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে করিতে খন্তর পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া যে যাহার নিত্য কার্য্যে মন দিল। মন্দিরে পূজা অর্চ্চনা শেষ করিয়া প্রসন্নচিত্তে একটা ভজন গাহিতে গাহিতে খন্তর বাড়ী ঢুকিল। গানটার অর্থ—"হে জগদীশ্বর, আমাকে বাহ্য সুখে দুঃখে দিশেহারা করিও না। আমার আত্মা তোমাময় হউক, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকল তোমার ভাবনাময় হউক···" ইত্যাদি।

রান্নার চালায় ঢুকিয়া দেখিল—কুটনা বাটনা প্রস্তুত। রান্না চাপিয়াছে, আটা ভিজানো হইয়াছে। পার্ব্বতী ছায়ার মত নিঃশব্দ-পদে ঘুরিয়া ফিরিয়া, দক্ষতার সহিত গৃহকার্য্য করিতেছে। চারিদিকে

পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। কিন্তু পার্ব্বতীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত, মুখ বিষণ্ণ।

নিমেষে মনের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ হইল। ভজন থামিল। খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া স্তব্ধভাবে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিল। মনে পড়িল—অভাগিনী, সন্তান-শোকার্ত্তা মাতা!

ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া খন্তর বলিল, "জগতে জীবিত বা মৃত জনদের জন্যে জ্ঞানীরা শোক করেন না। আমরা মহা অজ্ঞান জীব, তাই কষ্ট পাই। শোকের স্বভাব এই,—যত বাড়াবে—তত বাড়বে। চল, খাওয়া সেরে দু'জনে দুপুরবেলা বুধগয়ায় বেড়িয়ে আসি। মনটা সুস্থ হবে।"

অপ্রসন্ন দৃষ্টি হানিয়া পার্ব্বতী পিছন ফিরিয়া বসিল। হেঁটমুখে মাজা বাসনগুলা গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "নাঃ, কোন চুলোয় যাব না।"

এ কি! এ তো শোক নয়। ক্রোধ? ক্ষোভ? মৃদু বিস্ময়ের সহিত খন্তর বলিল, "তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?"

"সৌখিন মানুষ তুমি, আমি বুনো জানোয়ার! তোমার মনের মত হতে পারি নি, রাতদিন তাই দূর-ছাই করছ। আমি সভ্য নই, ভদ্র নই, —আমাকে পছন্দ হবে কেন? তাড়িয়ে ত দেবেই। এতে রাগের কি আছে? অপমানই ভাল!"

গত ব্যাপার মনে পড়িল! ও! দাম্পত্যজীবনের অপরাধ ত্রুটি? যাক, শোক ক্রন্দনের চেয়ে এই ক্রোধ-কলহ ঢের ভাল!...হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে!

খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া খন্তর পরিহাসস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এক একটি মানুষের স্বভাব—'তিলকে তাল' করা! যত সব তুচ্ছ বাজে ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করতে তোমার লজ্জা হয় না? কাজের সময়—পথ আগ্‌লাবে,—ঘুমের সময়—ছ্যাখো।"

বাঁ হাঁটুর কাপড় সরাইয়া খন্তর দেখাইল,—তীক্ষ্ণ আঁচড়ে সেখানকার খানিকটা নুনছাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সহাস্যে বলিল, "কি রকম বাঁদ্‌রামি?"

নিজের বাঁ হাত তুলিয়া রূপার খাড়ু, পৈঁছা, চুড়ির মাঝে পাঁচ ছয় গাছা লোহা দেখাইয়া পার্ব্বতী বলিল, "এই লোহার ধারে আঁচড় লেগেছে। ইচ্ছে করে আঁচড়াই নি।"

"অ! সশস্ত্র হাত! খোল, খোল। অতগুলা ধারালো লোহা পর কেন? মানুষ জখম করবার জন্যে?"

"অসভ্য মানুষ আমরা, সভ্যতার কি জানি? তুমি সভ্য মানুষ,— তোমার ঘরে আসাই আমার অন্যায়। কুক্ষণে দেখা হয়েছিল,—এক লহমায় যাদু কর্‌লে আমায়! উঃ, এত স্বার্থপর তুমি!"

আটার থালাটা টানিয়া লইয়া আটা ঠাসিতে ঠাসিতে খন্তর মৃদুহাস্যে বলিল, "বোনের বাড়ীতে খানিক বেড়িয়ে এস। মন ঠাণ্ডা হবে। আমি রুটি তৈরী কর্‌ছি।"

"খবরদার বলছি, আমার কাযে হাত দিও না। বেইমান, শয়তান। থালা ছাড়, ওঠো, জল খাও।" পার্ব্বতী ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

"অনেক রাত্রে খেয়েছি, এখন ক্ষিদে নাই, খাব না।"

"হ্যাঁ খেতে হবে। খাওয়া পছন্দ হচ্ছে না?"

"সে কি? পছন্দের জন্যে কাল দু'বেলাই খুব বেশী খেয়েছি। কেন রাগ কর্‌ছ?"

"তোমার রীতের গুণে! থালা ছাড়, ছাড় বল্‌ছি!"

পার্ব্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া থালা কাড়িয়া লইতে উদ্যত দেখিয়া খন্তর ছাড়িয়া দিল। একটু দুঃখিত হইয়া বলিল "দিনরাত অমন অসন্তুষ্ট উগ্র মেজাজে থেক না। পরের বাড়ীতে বেশ ত শান্ত শিষ্ট হয়ে, ছিলে।"

"সেখানে পয়সার বদলে খাটুনি দেবার সম্পর্ক ছিল। নিঝ্‌ঞ্ঝাটে ছিলাম। ভালবাসার বদলে ভালবাসা পাওয়ার সম্পর্ক যেখানে, সেখানে,—হতশ্রদ্ধা পেলে—" উদ্যত অশ্রু দমনের জন্য পার্ব্বতী দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল। সঙ্গে সঙ্গে আটার ডেলা কাটিতে লাগিল।

ব্যাপারটা শন্তরের নিকট অস্বস্তিদায়ক দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালির মত ঠেকিল। আঃ, এই অতি স্থূলবুদ্ধি, অভিমানিনী নারীর কাছে ভালবাসার আদর্শ কি? শুধু নিষ্কর্ম্মা স্বামীদের মত অষ্ট প্রহর নিকটে থাকিয়া,—উচ্ছৃঙ্খল-চেতা পত্নীর যথেচ্ছ খেয়াল চরিতার্থ করা? জীবনের দায়িত্বজ্ঞান, কর্ত্তব্যবোধ,—উচ্চ লক্ষ্য, সব বিসর্জ্জন দিয়া, পত্নীর চিত্তবিনোদনে আত্ম-নিয়োগ করায়? ইহাই ভালবাসা?

কিন্তু পার্ব্বতীকে তাহার মূঢ় আকাঙ্ক্ষার অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা ধৃষ্টতা! একগুঁয়ে দাম্ভিক নির্ব্বোধ নরনারী জীবনে অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু পার্ব্বতীর মত এতটা কাহাকেও দেখে নাই। অন্ততঃ এতটা ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়া কাহাকেও লক্ষ্য করিবার সুযোগ পায় নাই।

ক্ষণেক গুম হইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তোমায় হতশ্রদ্ধা করি না। তোমার বোকামিগুলোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি না, তা সত্যি।"

হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া পার্ব্বতী বলিল, "স্ত্রীকে পায়ে ঠেল্‌ছ। জানো, এই বলে রাখ্‌ছি,—আমার কথা কখনো মিথ্যে হয় না। তুমি এবার চরিত্রহীন হবে।"

ঘোরতর অসন্তোষের সহিত পিছন ফিরিয়া বসিয়া সবেগে সে রুটি বেলিতে লাগিল।

শন্তরের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল! এই অসংলগ্নভাষিণী নারীর সহিত ইহার পর শিষ্টালাপ মিষ্টালাপ চালাইবার চেষ্টা করিলে নিজের

ধৈর্য্য হারাইবার আশঙ্কা। পার্ব্বতী যতই তর্জ্জন করুক, সে নিরুপায় আশ্রিতা, পত্নী। তাহার দৌর্ব্বল্য ত্রুটি পুরুষোচিত ধৈর্য্যের সহিত ক্ষমা করিতে হইবে।

প্রাণপণ শক্তিতে মনের অসন্তোষ দমন করিয়া ধীর ভাবে বলিল, "স্ত্রী এসে চরিত্র আগলাবে, তবে চরিত্র রক্ষা হবে,—এমন অপদার্থ স্বামী ঢের আছে জানি। কিন্তু আমার চরিত্র রক্ষার দায়িত্ব আমার নিজের!"

উঠিয়া ঘরে যাইতে যাইতে পুনশ্চ বলিল, "ছোট ঘরে জন্মেছি বটে, কিন্তু আমরা ইতর নই। ছোট বেলায় আমার মা বাপ কখনো পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমাদের মিশ্‌তে দেন নি। কাযেই যা-তা কথা শোনার বা বলার অভ্যাস নাই। দুম দাম করে লম্বা চওড়া কথা বল্‌বার আগে, কথার মানেটা কি,—বিবেচনা করে দেখো।"

নিরুদ্ধ ক্রোধোত্তেজনায় মস্তিষ্ক দম্ দম্ করিতে লাগিল। ঘরে গিয়া খস্তর খাটিয়ায় শুইল।

কয়দিনের আলাপ পরিচয়ের স্মৃতি মনে পড়িল। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়, বেশ সহজ ভাবে। তার পর আচম্বিতে তাহা তিক্তরসে ভরিয়া উঠে। তাহারা পরস্পরকে ভালবাসে,—কিন্তু ভালবাসা তাহাদের চরিতার্থতা চায়, পরস্পরের রুচিবিরুদ্ধ কামনায়,—একান্ত বিভিন্ন আদর্শে। কি দুর্ব্বিপাক!

সুখের আদর্শ, শান্তির আদর্শ—এ সংসারে সকলের পক্ষে—এক রকম নয়। উহা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচিগত বিশেষত্বের উপর,—সাময়িক, মানসিক-অবস্থাগত, বিশেষত্বের উপর, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ভর করে। পার্ব্বতীর মানসিক অবস্থা আজ যেরূপ বিশৃঙ্খল দেখিতেছে, হয়ত তাহা কাল থাকিবে না—এই আশায় ধৈর্য্য ধরিয়া তাহার মানসিক সুস্থতার জন্য প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য। সংসারের ভার যখন ঘাড়ে লইয়াছে, তখন

সহ্যগুণ বিসর্জ্জন করিলে সংসারে শান্তি থাকিবে না। পার্ব্বতীর স্বামী সে, ভবিষ্যৎ সন্তানদের পিতা সে, একটা পরিবারের কর্ত্তা সে! তাহার দায়িত্ব অনেক!

মনে পড়িল প্রথমা স্ত্রীর কথা। বালিকাসুলভ দুর্ব্বলতা তাহার যতই থাক,—ধৈর্য্য সংযম বুদ্ধিমত্তা ছিল অনেক। আন্তরিক প্রীতি তাহাদের এতই গভীর ছিল যে, ব্যঙ্গচ্ছলে ভিন্ন, কখনও ভালবাসার সম্বন্ধে প্রশ্নই উঠে নাই। তা বলিয়া নির্ব্বিচারে অন্ধ ভক্তিতে সে যে সব সময়ে খন্তরের বশ্যতা স্বীকার করিত, এমন নয়। স্বামীর বিবেচনা ত্রুটির বিরুদ্ধে সে স্বচ্ছন্দে বিদ্রোহ করিত এবং সে বিদ্রোহে তাহার সবল বিচার-শক্তি ও নৈতিক চেতনার ছাপ এমন সুস্পষ্ট থাকিত, যে, পরাস্ত হইয়াও খন্তর স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইত!

সেও নারী,—আর পার্ব্বতীও নারী! কিন্তু ইহার বিচারবুদ্ধি কত দুর্ব্বল!

দূর হউক ছাই! এ সব চিন্তায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে! মনের স্থৈর্য্য রক্ষা করা চাই।

খন্তর গীতা ও তুলসীদাস পাড়িল।

কিন্তু খানিক পরে পড়িতে পড়িতেই মন অতীত স্মৃতির উদ্দেশে ধাবিত হইল। বহি বন্ধ হইল, খন্তর চোখ বুজিল।

মনে পড়িল দ্বিরাগমনের পর সে বধূ যখন প্রথম আসিয়াছিল, তখনকার কথা। ইহাদের দেশে অল্পবয়স্ক, অবিবেচক দম্পতীদের নিভৃত সাক্ষাৎ, একান্ত নিষিদ্ধ। খন্তরদের পরিবারেও, এ নিয়ম, খুব নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইত। শুধু তাই নয়—পিতামাতার প্রথম দুই সন্তানের অকালমৃত্যুর পর, অনেক ব্রত অর্চ্চনা সংযম নিয়ম পালন করিয়া জয়পাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। শোনা যায়,—পাছে পুত্রের অকল্যাণ

হয়,—সেই আশঙ্কায় ধর্ম্মপ্রাণ পিতামাতা দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কায়িক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। তার পর খন্তর মাতার কোলে আসে।

জয়পালের মতিগতি ও রুচি পিতামাতার আদর্শানুযায়ী ছিল। ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণীও শান্ত সংযত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ইহাদের জীবনে নবীন বসন্তের কৌতুক চাঞ্চল্যের লীলারঙ্গ খন্তর দেখিয়াছে, কিন্তু অসংযমের আবর্ত্তে পড়িয়া দিশেহারা হইতে, কর্ত্তব্যজ্ঞান ভুলিতে—কখনও দেখে নাই। অতএব নিজের নববধূ যখন ঘরে আসিল, তখন নিজের বিবেচনায় সতর্ক হইয়া খন্তরও একটু দূরে রহিল। বালিকা বধূটিও হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাসে কাব্যের ছলনায় কাঁদিবার কৌশল দেখাইল না। দিব্য শাশুড়ী ও যা ঠাকুরাণীর আড়ালে আত্মগোপন করিয়া ছোটখাট গৃহ-কার্য্য লইয়া রহিল। আড়ালে দৈবাৎ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কোন প্রশ্ন করিলে লজ্জাভীরু বধূ তাড়াতাড়ি পলায়ন করিত। উত্তর দিত না।

একদিন অসময়ে কর্ম্মস্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া খন্তর দেখিল ভাই বাড়ীতে নাই। ভ্রাতৃজায়া রন্ধনশালায়। মাতা পাশের ঘরে ঘুমাইতেছেন। শোবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল বধূ ঘোমটা খুলিয়া পরম নিশ্চিন্ত-ভাবে তাহাদের দুই ভায়ের শয্যা রচনা করিতেছে। আর কোন মেয়ে নাই।

আলাপ করিবার সলজ্জ-কৌতূহল মনের ভিতর উঁকিঝুঁকি দিল। কিন্তু অপরিচিত স্বামীর সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র বধূ যখন ত্রস্তে ঘোমটায় মুখ ঢাকিল—তখন হঠাৎ মনে হইল—বিদ্রোহ আবশ্যক।

বিদ্রোহের কোন ভদ্র দস্তুর রীতি তখন জানা ছিল না। স্পর্শ করিবার সাহস ছিল না, অনুনয় বিনয় করিতেও সঙ্কোচ বোধ হইল—পাছে কেহ শুনিতে পায়। অতএব জব্দ করিবার সস্তা উপায় যা হাতের

কাছে পাইল, তাই কাবে লাগাইল। জুতা খুলিয়া লাফাইয়া শয্যার উপর পড়িল। নিঃশব্দে মহোৎসাহে দাপাদাপি করিয়া বধূর সযত্ন রচিত শয্যা লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। বেচারা বধূ হতবুদ্ধি হইয়া, কাঁদ-কাঁদ মুখে এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইল। কথা কহিল না।

নিজের বন্য বর্ব্বরতায় যেন পরম প্রীত হইয়াছে,—এমনি ভাবে ঘরের মট্‌কার দিকে চাহিয়া উপদ্রবশীল তরুণ স্বামীটি মন্তব্য প্রকাশ করিল "যতক্ষণ না কেউ ঘোমটা খুলে আমাকে বলবে—'উঠে যাও',—ততক্ষণ ত আমি উঠ্‌ব না। বিছানাও করতে দেব না।"

বধূ দায়ে পড়িয়া ঘোমটা একটু সরাইল। কিন্তু কথা বলিতে পারিল না। নতমুখে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তরুণ স্বামী সোৎসাহে পুনশ্চ নির্দ্দেশ করিল "বল্‌লেই তখ্‌নি উঠে যাব। বল একবার—"

বধূ সসঙ্কোচে বলিল, "উঠে যাও!"

স্বামী সত্যরক্ষার জন্য তদ্দণ্ডে উঠিল এবং নিরতিশয় ভালমানুষের মত ঘরের বাহিরে গেল।···

সে ছিল বিশ বৎসর বয়সের চাপল্য! আজ চৌত্রিশ বৎসরের শোকদুঃখক্ষত হৃদয়ের কাছে, পার্ব্বতী যদি তেমনি চপল তরল ব্যবহার পাইবার দাবি করে, তবে ত অবস্থা শোচনীয় হয়! অথবা বয়সের কথা বিচার করাই হয়ত ভুল। এমন মানুষও সংসারে দেখিয়াছে, চুয়াল্লিশ চুয়ান্ন কেন,—পাকা চৌষট্টি পার হইয়াও যাহারা কোন—অতি বড় ঘৃণ্য—ধৃষ্টতা প্রকাশেও কুণ্ঠিত নয়। বৈধ অবৈধ সম্পর্ক বিচারেও জ্ঞান নাই।

কিন্তু খন্তরের মনের অবস্থা যে স্বতন্ত্র।

বিবেক তিরস্কার করিয়া বলিল, "তবে বিজ্ঞের মত স্ব-তন্ত্র জীবন যাপন করাই উচিত ছিল। সস্তা সুখের লোভ করিলে কেন?"

মন তিক্ত অবসাদে ভরিয়া উঠিল। দুই আঙুলে গোঁফের প্রান্তে সজোরে পাক দিতে দিতে খোলা গবাক্ষপথে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। ঊর্দ্ধে—রৌদ্র-ঝলসিত নির্ম্মল মুক্ত আকাশ দেখা গেল,—আঃ, কি মহান শান্তিময় দৃশ্য!

২২

বাহির হইতে শনিচর ডাক দিল। খন্তর সাড়া দিয়া রোয়াকে আসিয়া দেখিল শনিচরের সহিত সুমার বাড়ী ঢুকিতেছে। সুমার ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, "বধূ কোথায়?"

খন্তর রান্নাঘরের দিকে ইঙ্গিত করিল।

শনিচর গুরুজনোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "দু'টিতে কেমন আছিস, দেখ্‌তে এলুম।"

"আজ ত তোদের ছুটি। চল, পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি।"

"আবার পাহাড়? কেন, ঘরে মন টিক্‌ছে না?"

খন্তর ম্লান হাসি হাসিল। নীরবে মাথা নাড়িল। —'না'।

শনিচর শাসনের সুরে বলিল, "তুই এবার গালাগালি খাবি।"

"এইখান থেকে খুব খাচ্ছি।"—নিজের বুকে আঙুলের টোকা মারিয়া খন্তর সন্তর্পণে বিষাদের নিঃশ্বাস ছাড়িল।

হয়ত ইহা হারানো প্রিয়জনবর্গের স্মৃতি স্মরণের ব্যর্থ বেদনা,—হয়ত ইহা নিজের শোকাহত মনের সুখান্বেষী লালসার প্রতি ধিক্কার। ঠিক যে কি, স্পষ্ট বোঝা গেল না। কি একটা বিদ্রূপ বাণী উচ্চারণ করিতে গিয়া শনিচর সামলাইয়া লইল। গম্ভীর হইয়া বলিল, "ও, কি কর্‌ছে দেখি।"

সে রান্নার চালায় গেল।

সুমারের সহিত পার্ব্বতী বাক্যালাপ করিবে না। যেহেতু সে বয়স্ক দেবর। খন্তর তাহাকে ঘরে লইয়া গেল।

ধূমপান করিতে করিতে দু'জনে রেল কোম্পানীর ঘরের তুচ্ছ বৃহৎ নানা সংবাদ লইয়া প্রথমে আলোচনা করিল। তার পর সুমার প্রশ্ন করিল, "ভেইয়া, নূতন জীবন কেমন লাগ্‌ছে?"

খাটিয়ার কোণ ঠুকিয়া পোড়া বিঁড়ির ছাই ঝাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে খন্তর নির্লিপ্ত ভাবে বলিল, "সবাইকার যেমন লাগে।"

"তুই ত সবাইকার মত নয়। তুই যে আলাদা মানুষ।"

"এই ত তোদের ক্ষুরে মাথা মুড়ুলাম। দলে এসে পড়েছি।"

একটানে বাকী বিঁড়িটুকু নিঃশেস করিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। বিছানায় শুইয়া সজোরে আলস্য ভাঙিল। হাই তুলিতে তুলিতে বিকৃত স্বরে বলিল, "গিন্নি জুটেছে, গৃহস্বামীর কিছু দেখতে হয় না—শুধু টাকা দিয়ে নিশ্চিন্ত। বেশ ত আছি। তোর মেয়েরা কেমন আছে? ভাল ত? তাদের মার শরীর কেমন? মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হয়েছে?"

"স্বভাব মলেও যায় না। তার কথা ছেড়ে দে ভাই। ভৌজির মেজাজ কেমন?"

খন্তর নিরপেক্ষ বিচারকের মত জানাইল এর মধ্যে সে সম্বন্ধে কোন মতামত ব্যক্ত করা চলে না। আগে দু'চার বছর ঘর-সংসার করুক···ইত্যাদি।

মুচ্‌কি হাসিয়া সুমার বলিল, "আরে এখন নতুন সাগা, চোখ রঙীন্!"

"কাযেই বিকারের ঝোঁকে প্রলাপ বাক্য বলাই সোজা! কিন্তু শুধু রস-সম্ভোগে মশগুল্ থাকা আমার পোষায় না। তার ভিতরে খাঁটি তত্ত্ব

কতটুকু আছে, সে হিসেবের দিকেও আমার মন সজাগ থাকে। ওই জন্যেই ত দশজনের সস্তা বিচারে—বেকুব বলে গণ্য হই।"

"ভৌজির ও? বল্ বল্, তাহলে গিয়ে ঝগড়া করি।"

শনিচর কয়েক খিলি পাণ লইয়া ঘরে ঢুকিল। উভয়কে পাণ দিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে খন্তরের দিকে চাহিল। বলিল, "এর মধ্যে দু'জনে মন কসাকসি সুরু হোল? ও কাঁদ্ছে কেন?"

"ফের কাঁদছে?"—ক্ষণেক স্তব্ধ দৃষ্টিতে শনিচরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া খন্তর শান্তভাবে বলিল, "নিরুপায়!"

"তুই বকাবকি করেছিস্?"

খন্তর অপ্রসন্নমুখে গোঁফে পাক দিতে লাগিল। উত্তর দিল না।

সুমার অবিশ্বাস ভরে বলিল, "হ্যাঃ, খন্তরা সেই মানুষ! তাকে কোনদিন বকে নি, একে বক্‌বে? তাও নতুন বেলায়!"

অসহিষ্ণু হইয়া শনিচর বলিল, "তা হলে ওর সাধুগিরির জ্বালায় কাঁদ্ছে। খন্তবা, ও সব ভড়ং রাখ। আমাদের মত সহজ মানুষ হ্।"

কটু ভাষায় কতকগুলা তিরস্কার করিয়া পুনশ্চ বলিল, "বাড়ীতে দু'টো মাত্র প্রাণী,—তা এ এক মুল্লুকে, ও এক মুল্লুকে। কেন, গিয়ে কাছে বস্‌তে পার না? দু'টো সুখ দুঃখের কথা বল্‌তে পার না?"

তাহার মুরুব্বিয়ানা দেখিয়া খন্তর হাসিল। বলিল, "ভূতের ভয়ে অস্থির যে! আবার পরের সুখ দুঃখের বোঝা? বইতে পারবে না! বেচারির ঘাড় ভেঙে যাবে।"

"না হয় দু'টো ভালবাসার গল্পই বল—"

সবিদ্রূপ হাস্যে খন্তর বলিল, "বাঃ, গয়ালী ঠাকুর যেন সুফলের মন্ত্র শেখাচ্ছে! ভাল ঠাকুর, আমার স্বর্গলাভের ফন্দি বাৎলাও। বল কি বল্‌ব?"

"ওকে বুঝিয়ে দে, তুই ওর বড় আপন-জন। যা হবার হয়ে গেছে, এখন ওকে ছাড়া আর কাউকে চাস্ না।"

"উহুঁ-হুঁ, টাকা চাই।—" খন্তর উঠিয়া বসিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কাউকে চাই না? কি রকম? নোক্‌রি বজায় রাখা চাই, শরীর রাখা চাই, মনের ওজন ঠিক রাখবার জন্যে সাধন-ভজন বাঁচিয়ে রাখা চাই। চাই না বল্‌লেই হোল?"

"ওরে আহাম্মক, ওদের মন ভোলাবার জন্যে মিথ্যে কথা ঢের বল্‌তে হয়—"

"যার গরজ পড়েছে সে বলুক। আমি মিথ্যের কারবারে রাজি নই। তাকে কোন দিন মিথ্যে কথা বলে ঠকাইনি, একে ঠকাব? নাঃ, বলব সত্যি কথা। তাতে মন ভুলুক, চাই না ভুলুক।"

"জংলি চিড়িয়াকে পোষ মানাতে হয় জংলি মন্ত্রে। তার বুদ্ধি ছিল, সে তোর ধাত বুঝেছিল,—এ অবুঝ!"

ঘাড়ের নীচে দু হাত রাখিয়া খন্তর সটান সোজা হইয়া শুইল। সনিঃশ্বাসে মৃদুহাস্যে বলিল, "ভাল। বল্ তোর জংলি-মন্ত্র।"

শনিচর জাঁকিয়া বসিল। গোঁফে তা দিয়া বলিল, "বল্‌বি, তোমাকে বড় ভালবাসি। তোমার সঙ্গে যদি সাগা না হোত,—আমি বিষ খেতাম। গলায় দড়ি দিতাম। ছুরি দিতাম—"

"বাপ্! এত মিথ্যে কথা! পারব না!" বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খন্তর বলিল, "একটা সাগার জন্যে গলায় ছুরি দেব কি রে? কেন, ভগবানের রাজ্যে ত কাযের অভাব নাই। তা ছাড়া যা দিনকাল পড়েছে, এখন সব ছেলেমেয়েরই এমন ভাবে মনকে তৈরী করা উচিত,—যে সাগা-সাদি জীবনে হোল-হোল,—না-হোল না-হোল। ওটা না হলেই যে চল্‌বে না, এমন নয়। কিন্তু জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র জীবন সকলেরই চাই।"

রাগ করিয়া শনিচর বলিল, "নাও, ধান ভান্‌তে শিবের গীত। হচ্ছে, তোর গলায় ছুরি দেবার কথা, গুষ্টিশুদ্ধ সবাইকে টানিস্ কেন?"

মুচকি হাসিয়া সুনার বলিল, "রাগের মাথায়। খন্তরাই সেদিন বলছিলি নয়? "কবুতর" কাগজে লিখেছে,—কোন এক সাহেব ব্যাঙের চাষ করেছেন। তিনি দেখেছেন, ব্যর্থ প্রেমের দুঃখে ব্যাঙেও আত্মহত্যা করে। তুই বা কর্‌বি না কেন?"

উত্তেজিত হইয়া খন্তর বলিল, "আগা ব্যাঙ ছুঁচো, ছ্যাচড়া কীর্ত্তি কর্‌বে না ত কি, সারা-ব্রিজ বানাবে? ডিনামাইট্ ফুটিয়ে টানেল কর্‌বে? ইঞ্জিন গড়বে? আবদার্ গ্যাখো! ছ্যাঁচড়া বাসনার পায়ে যে দাসখৎ লিখবে, বিকারের ঝোঁকে সেই মর্‌বে। ব্যাঙের ব্যর্থ-প্রেম, ফড়িং'এর সার্থক প্রেম,—ও সবের ওস্তাদির দৌড় ওই আত্মহত্যা পর্য্যন্ত; এ ত জানা কথা!"

একটু থামিয়া হাসি-হাসি মুখে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আমি অবশ্য ওটা সত্যি প্রেম বলি না। তোরা বল্‌ছিস্,—তাই ঝগড়ার ভয়ে খাতিরে পড়ে, স্বীকার হচ্ছি। প্রেমের টান, প্রাণের টান,—যা বলে সনাক্ত কর্‌বি কর, সাড়া দেব না। মনে মনে বেশ জানি,—যতই রং চং লেপে দাও, যতই গয়না পোষাক পরাও,—ওগুলো হচ্ছে সাফ জানোয়ারি-দুষ্প্রবৃত্তি! হোক!—তা বলে ব্যাঙের দেখাদেখি আমি মর্‌তে রাজি নই। কেন? মর্‌বার ভাল পথ ত ঢের আছে। অসহায় মেয়েদের উপর যারা পৈশাচিক অত্যাচার কর্‌ছে,—সেই গুণ্ডাগুলোকে খুন করে মর্ দেখি! বুঝব হাঁ, কাযের মত কায কিছু হোল। পুরুষের মত, মানুষের মত—ক্ষাত্রশক্তির খেলা দেখিয়ে মরেছিস্! সে মরণে জাতকে জাতটা ধন্য হবে।"

বলিতে বলিতে ঈষৎ উষ্ণ উত্তেজিত হইয়া পুনশ্চ বলিল, "বাস্তবিক

চারিদিকে বীভৎস অত্যাচারের কথা কাগজে পড়তে পড়তে আমার এমন মাথা গরম হয়ে ওঠে, মনে হয় গভর্ণমেণ্টের পুলিশ এর পর ধীরে সুস্থে গদাই-লস্করী চালে যা কর্‌তে হয় কর্‌বে,—আগে ত আমি গিয়ে গোটাকতক জানোয়ারের মাথা গুঁড়ো করি। তাতে আমার মাথা থাক, চাই না থাক।”

“কি মুস্কিল! হচ্ছে ঘরের কথা। তোর স্ত্রীর মন ভোলাবার সলা পরামর্শ—”

সুমার মুচকি হাসিয়া বলিল, “একটা নাচনেওয়ালীর মন ভোলাবার জন্যে সেদিন দারোগাবাবু কি কর্‌লেন?”

শনিচর উৎসাহের সহিত তুড়ি দিয়া বলিল, “হঃ! রামশীলা পাহাড়ে চড়ে আত্মহত্যা! বল্‌বার যো নেই,—অনুষ্ঠানে ত্রুটি রইল! হাজার লোক তাক্‌ মেরে গেল! ভাব দেখি, প্রাণের কতখানি গভীরতম রহস্যময় টান্—”

“আসক্তির নেশায় মন যখন অন্ধ উদ্‌ভ্রান্ত হয়, তখন অতখানি গভীরতম রহস্যময় টান ধরে।—প্রাণ ছাড় ছাড় করে।—দ্যাখ না, লোকটি একটা নাচনেওয়ালীর বিরহ আশঙ্কায় আত্মহত্যা কর্‌লেন! কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের জন্যে কর্ত্তব্য দায়িত্ব মনেই পড়ল না!”—নিঃশ্বাস ফেলিয়া খস্তর বলিল, “উঃ ভগবান, মনের কতটা অধঃপতন হলে তবে এতটা শোচনীয় অবস্থা হয়!”

গদগদ কণ্ঠে শনিচর বলিল, “আহা, তোর কবে এমন অবস্থা হবে?”

“ক্রমশঃ। ভৌজির অনুগ্রহ দৃষ্টির অপেক্ষা।” মুচকি হাসিয়া সুমার মহা আড়ম্বরে আলস্য ভাঙিতে লাগিল।

খস্তর হাসিল। বলিল, “বাঃ, আসক্তির নেশায় কোথায় ব্যাঙ মর্‌বে, কোথায় বাঁদর মর্‌বে,—দেখে দেখে আমাকেও ধড়ফড়িয়ে—”

"অনুরাগে তনুত্যাগ ওরা হাতে-হেতেরে করেছে, তুই মুখের কথায় কর্। স্ত্রীর সখ মেটাবার জন্যে ভগবান রামচন্দ্র সোনার হরিণের পিছু ছুটেছিলেন—"

খন্তর সহাস্যে বলিল, "কিন্তু অকল্যাণ তাতে ঘটেছিল কম নয়। আমি যদি তখন সামনে হাজির থাক্‌তাম, তা হলে বলতাম,—ঠাকুর, স্ত্রীকে যত খুসী ভালবাসুন, আপত্তি নাই। কিন্তু স্ত্রীর অবিবেচনাকে আস্কারা দেবেন না। ফ্যাসাদে পড়বেন।"

সুমার মন্তব্য করিল, "প্যারিজীর মন জয় করবার জন্যে কিষণজীকেও অনেক দুঃখ পেতে হয়েছিল। মায় কাঁধে চড়ানো পর্য্যন্ত।"

খন্তর বলিল, "সেটা দর্পচূর্ণ কর্‌তে। জানাস্ নি। তোদের এই ধরণের দালালি দেখলে বিতৃষ্ণায় মন ভরে ওঠে। ঠকামি করে স্ত্রীর মন জয় কর্‌তে হবে? কেন? জোচ্চুরির সম্পর্ক ?"

শনিচর গম্ভীর হইয়া বলিল, "জয় তুই করেছিস। কতখানি—তা জানিস্ না। আমার স্ত্রী যদি অতখানি অন্ধ অনুরাগে ভালবাসে,—হাতে চাঁদ পাই।"

"তোদের চাঁদ ত বড় সস্তা!"—অসহিষ্ণু হইয়া খন্তর বলিল, "এই অন্ধ ভালবাসাগুলোর মানে—নির্জ্জলা মোহ, আসক্তি। ভালবাস্‌বি—বাস। অন্ধ-অনুরাগে কেন? চক্ষু চেয়ে সকল দিক বিচার করে, ভালবাস। নৈতিক বুদ্ধি, কর্ত্তব্য জ্ঞানের ওজন ঠিক রাখ। বিষাক্ত বাসনা বিসর্জ্জন দিয়ে, পবিত্র চিত্তে ভালবাস। সে ভালবাসা আমি ভক্তিভরে মাথায় নেব।···সহ্য হয় না ওই উদ্দাম আসক্তি তৃষ্ণার ঝঞ্ঝাট! আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুনের হল্কা ছিটিয়ে দেয়।···ওগুলো হচ্ছে বিপজ্জনক নেশা, ক্ষ্যাপামি, মরণ-বাড়!"

শনিচর নরম স্বরে বলিল, "চটিস্ কেন দাদা ? এই নেশাতেই দুনিয়া রঙীন্ !"

রাগ করিয়া খস্তর বলিল, "তোদের দুনিয়া ! আমার নয় ! আমি শাদা চোখে স্পষ্ট দেখ্ছি, কর্ম্মফলের হাতে প্রত্যেকে নগদ বিদায় পাচ্ছে। সকল দিক ভেবে-চিন্তে, কাণ্ডজ্ঞান বজায় রেখে চল্তে পার,—চল। নইলে কর্ম্মদোষে মর। সোজা সর্ত্ত ! সাগা করেছি বলে চোর দায়ে ধরা পড়েছি ? স্ত্রীর মন যোগাতে হবে বলে নিজের মনটাকে গলাধাক্কা দিয়ে অধঃপাতের রাস্তায় পাঠাতে হবে ?"

বিদ্রূপ ভরে শনিচর বলিল, "হবে, হবে খস্তরা। দেখ্ব জিদ্ ক'দিন বজায় থাকে। মনে পড়ে পুরানো কথা ? সে বৌ যখন প্রথম এসেছিল ? তখন আমি হয়েছিলুম তোর গুরুদেব···"

"আজ সেজন্যে তোকে খুন কর্তে ইচ্ছা হয়। তোর সঙ্গে মিশ্ছি দেখলে ভেইয়া জ্বলে যেত। কেন, তখন বুঝিনি,—পরে বুঝেছিলাম। দূর হ হতভাগা, উচ্ছন্ন গেছিস্ তোরা। চল্ খানিক বেড়িয়ে—" খস্তর উঠিয়া জামা গায়ে দিবার উদ্যোগ করিল।

দু'জনে বাধা দিল। ধরিয়া আনিয়া বসাইল। শনিচর ব্যঙ্গভরে মুচকি হাসিয়া বলিল, "শাস্ত্র সাক্ষী। এই উচ্ছন্নের নেশার টানে লোকে রাক্ষস-বিবাহ, অসুর-বিবাহ, পিশাচ-বিবাহ কর্ছে। তুই—"

সবেগে মাথা নাড়িয়া খস্তর বলিল, "রাক্ষস, পিশাচ, অসুর নই। তাদের রুচির ফরমাস মত জীবন কাটাতে নারাজ। সাগা করেছি,—অন্য উদ্দেশ্যে। সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, নিরুপায় ! পৃথিবীতে কত রাজা রাজ্য রসাতলে যাচ্ছে। আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হলে, কি এমন এসে যাবে ? বুঝব, এই ভগবানের ইচ্ছা। তিনি মঙ্গলময়, যা করেন মঙ্গলের জন্য।"

ফশ্‌ করিয়া তুলসীদাসের দোঁহাবলী খুলিয়া কয় ছত্র পাঠ করিয়া সহসা হাসিয়া বলিল, "বেঁচে থাক আমার তুলসীদাস!"

কয়েকটা কটূক্তি করিয়া শনিচর বলিল, "ধর্ম্ম নিয়ে মাতুনি করিস্, কর। স্ত্রীর মনে দুঃখ দিস্ নি। মহা অধর্ম্ম হবে।"

সহাস্যে খস্তর বলিল, "তুইও দালালি করিস্, কর। কিন্তু যুক্তিহীন বিচার করিস্ নি। ধর্ম্মহানি হবে।...তুই ত ওর 'বহিনাই'।—জিগেস্ কর ত খামকা কান্নাকাটি কর্‌ছে কেন? কি দুর্ব্যবহারটা করেছি আমি?"

ক্রুদ্ধ হইয়া শনিচর বলিল "তোর মগজ হয়ত আছে, কিন্তু হৃদয় নেই।"

অবলীলাক্রমে খস্তরের দাম্পত্য জীবনের আদর্শ, যাহা তাহাদের মতে একান্ত গর্হিত ব্যাপার,—সে সম্বন্ধে, এমন কতকগুলা বিষয় অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণনা করিল, যাহা পার্ব্বতী ছাড়া কাহারও জানা সম্ভব নয়। বোঝা শক্ত নয়, পার্ব্বতীই ইহাদের জানাইয়াছে—অভিযোগ।

খস্তরের মন উষ্ণ হইয়া বলিল, 'লঘুচিত্ত, বিশ্বাসহন্ত্রী!'

বুদ্ধি বলিল, 'যাহার মন একান্তভাবে দৈহিক স্তরের চেতনায় আবদ্ধ, তাহার কাছে অতীন্দ্রিয় স্তরের কোন মহৎ আদর্শ দাবি কর কেন? মূর্খ! ...গত জীবনের সংস্কার তাহার যে অভ্যাস গঠন করিয়াছে, গায়ের জোরে তাহার গতি ফিরাইবে?' তোমার বাঞ্ছিত আদর্শ পথে সে যখন সহচরী হইতে ইচ্ছুক নয়, তখন তাহার অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করিলে সে ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছিদ্র খুঁজিবেই।'

এখন উপায়?—ইতরভাবে অপমান করিয়া স্ত্রীকে বিদায় দেওয়া,—নয় নির্ব্বিবাদে সহিয়া লওয়া।

মনে ঝড় বহিতেছিল। দোঁহাবলী চোখের খুব কাছে তুলিয়া খস্তর প্রাণপণে সেটায় মনোনিবেশের চেষ্টা করিল।

শনিচর বক্তৃতা করিতে লাগিল। নর নারীর প্রকৃতিগত আদিম দুর্ব্বলতা, বর্ব্বরতার জয়গান গাহিয়া বিস্তর দুর্ব্বোধ্য মন্তব্য প্রকাশ করিল।

ঘৃণায় খন্তরের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, কিন্তু প্রতিবাদ করিল না। রাক্ষসী বুভুক্ষার ক্রীতদাস, এই বর্ব্বরগুলাকে আজ অত্যন্ত ঘৃণ্য কুৎসিত বোধ হইল।···মরুক উহারা, কলুষিত মনোবৃত্তি লইয়া! উহাদের ভ্রম সংশোধনের চেষ্টায় কোন হিতকর সত্য বাণী উচ্চারণ করা বৃথা!

সুমার খুব আগ্রহ সহকারে শনিচরের বক্তৃতারাশি গলাধঃকরণ করিতেছিল। পিতা বাড়ী হইতে ডাক দিলেন, সে উঠিল। শনিচরও উঠিল। প্রিয়ার চিত্তবিনোদনে প্রেমিকের চাতুর্য্য কৌশল সম্বন্ধে কতকগুলা উপদেশ দিয়া উভয়ে এক যোগে বলিল, "যা, মাপ চেয়ে মিটমাট্‌ করে নে।"

খন্তর নিরীহভাবে বলিল, "তাই নেব।"

২৩

উভয়ে বিদায় লইল।

মনের বিরক্তি বিতৃষ্ণা সবলে দমন করিয়া, খন্তর শান্তচিত্তে খানিক ভাবিল। সূর্য্যালোকের উপকারিতাতত্ত্ব যেখানে অসহ্য,—মত্ত মোহের রঙীন্‌ ফানুসের রহস্য লীলায় রসোপভোগের জন্য যেখানে লুব্ধ ব্যগ্রতায় মারামারি, কাটাকাটি,—সেখানে চাতুরীই ভাল। মনকে নিম্নস্তরে নামাইয়া, ফানুসের রঙের খেলায় ভিড়াইয়া—বিপ্লব ঠেকানো যাক। অন্তরে যা আছে,—অন্তরেই থাক।

রান্নার চালায় আসিল। পার্ব্বতী জল, পীঁড়া, খাবার সাজাইয়া রাখিয়া নিকটে শুইয়া ছিল। একটা ঢিল লইয়া অন্যমনে মাটীতে আঁক জোঁক কাটিতেছিল। কাঁদে নাই।

বক্ষঃবদ্ধ করে, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে খন্তর বলিল, "বহিন, বহিনাই'এর কাছে নালিশ হয়েছে। গালাগালির চোটে গোলামকে তাড়িয়ে-ভুড়িয়ে দিয়েছ। এবার মহারাণী কি লড়াইয়ের ধাক্কায় নিজেও ভূমিসাৎ ?"

চকিতে পার্ব্বতীর মুখে প্রীতির হাসি ফুটিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নয়ন কোণে অভিমানের বিদ্যুৎ ঝলসিল। মুখ ভার করিয়া বলিল, "চাকরাণী মানুষ,—মহারাণী নই। গোলাম কোথা পাব ?"

"সামনে।" -- খন্তর খাইতে বসিল।

"হুঁঃ!" বলিয়া পার্ব্বতী উঠিল। ঘরে গিয়া তৈসেল গুছাইতে লাগিল।

খন্তর বলিল, "তোমার খাবার আন। বসে পড়।"

পার্ব্বতী কথা কহিল না। খন্তর আরও দুই চারিবার অনুরোধ করিল। পার্ব্বতী সাড়া দিল না।

মনে হইল বানাইয়া বানাইয়া খুব কতকগুলা মিথ্যা উচ্ছ্বাস-চাঞ্চল্য প্রকাশ করে,—পার্ব্বতীকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। কিন্তু শনিচর যতই শিক্ষা দিক, প্রত্যেক কথাই গলায় বাধিল। চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু বলা হইল না। হায় কিষণজি! কেন বৃন্দাবনলীলা দেখাইয়াছিলে ? সুমারের মত অপদার্থটাও উহার দৃষ্টান্ত জীবনের অতি স্থূল প্রয়োজনে লাগাইতে চায়! উহার আধ্যাত্মিক তথ্য—ইহাদের না ঢোকে মাথায়, না পৌঁছে হৃদয়ে!··· অতিশয় হতভাগা সব!—খন্তর নানা কথা ভাবিল।

অন্যমনে খাওয়া শেষ করিল। উঠিতে উদ্যত হইয়াছে, পার্ব্বতী সহসা যন্ত্রণা কাতর কণ্ঠে বলিল, "এখনি বেড়াতে যাবে ?"

চাহিয়া দেখিল, সে খাবারের থালা লইয়া ঘরে বসিয়াছে, খায় নাই। দু-হাতে রগ চাপিয়া, যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছে।

অকৃত্রিম উদ্বেগে খস্তর বলিল, "তোমার অসুখ করেছে ? মাথা ধরেছে বোধ হয়। নয় ?"

"হুঁ। বেরুবে এখন ?"

"নাঃ, ঘরেই থাক্‌ব। পৌণে ছ'টায় একেবারে ডিউটিতে যাব। তাই ত, মাথা ধর্‌ল তোমার।"—জলের গ্লাশে ডুবাইয়া আঙুলের ডগাগুলা ধুইতে ধুইতে ক্ষুণ্ণস্বরে খস্তর বলিল, "রাগ তাপ কান্নাকাটি করে শরীর নষ্ট কর্‌ছ ? এমন মন্দ-ক্রোধী তুমি ! কি এমন অপরাধ করেছি, বুঝতে পার্‌ছি না। তবু বল্‌ছি, যা কিছু কসুর করেছি মাপ কর। কান্নাকাটি কোর না, আমার ভয়ানক দিল্‌ খারাপ হয়।"

এবার পার্ব্বতী মুখ তুলিয়া চাহিল। শ্লেষের সহিত অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "আমার দুঃখের জীবন। নিজের দুঃখে কাঁদ্‌ছি। তোমার—"

"আমারও আমীরের জীবন নন। আমীরি-স্বপ্ন নিয়ে অলস আরামে শুয়ে নেই। আমিও বড় দুঃখী, বড় গরীব। তোমার বুকেও শোকের ঘা দগ্‌দগ্‌ কর্‌ছে, আমার বুকেও তাই। ভগবানের মার ত আছেই। তার উপর নিজেরাও যদি বুদ্ধির দোষে—"

উষ্ণ হইয়া পার্ব্বতী বলিল, "বুদ্ধির দোষ আমার ? কই কে বল্‌বে বলুক ত !"

খস্তরের মন সন্ত্রস্ত হইল,—ওরে বাবা ! আবার যে যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্যম ! কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "আরে না না। ততখানি স্পর্দ্ধার সাহস আমার নাই। আমি ঘরে এনেছি তোমাকে। এখন গোলমাল কিছু হলে বুঝতে হবে—আমারি দোষে হচ্ছে। হাঁ, দোষ ত আমারি। স্বীকার কর্‌ছি। তোমাকে সুখী করা, আনন্দ দেওয়া, সে আমার কর্ত্তব্য —জানি। কিন্তু—"

করুণমুখে বলিল, "দেখছ ত, আমার খাটুনি কত বেশী। সময় কত কম? তোমার সঙ্গে গল্প গুজব করি কখন?"

বক্র কটাক্ষে চাহিয়া অভিমান ভরে পার্ব্বতী বলিল, "কিন্তু ধর্ম্ম করবার সময় আছে ত।"

মুচকি হাসিয়া খন্তর উত্তর দিল, "মানে? অধর্ম্ম করবার সময়টার উপর বাটপাড়ি করছি? জীবনটা হেলায় খোয়াচ্ছি? বড় বেকুব আমি, না?"

সুস্পষ্ট বিদ্রূপটা বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না! রাগিয়া পার্ব্বতী বলিল, "যাও।"

পিছন ফিরিয়া বসিয়া সে আহারে মন দিল। খন্তর উঠিয়া যাইতে যাইতে নিজ মনে আবৃত্তি করিল—"যো রোগী,—সো যোগী। যো যোগী —সো ভোগী।"

ইহা পশ্চিমাঞ্চলের একটা প্রসিদ্ধ প্রবাদ। অর্থ—'যে ব্যক্তি রোগীর মত সংযত সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মে জীবন যাপন করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মে যুক্ত পবিত্র জীবন লাভের যোগ্য, এবং এইরূপ সংযমী সুধীর ব্যক্তিই সকল ভোগের পূর্ণ আনন্দে—যথার্থ তৃপ্তিলাভের অধিকারী।' নিষিদ্ধ ভোগের বিরুদ্ধে এমন অনেক ছড়া ইহাদের মুখে শোনা যায়।

আধুনিক সভ্যতার উচ্ছৃঙ্খল হুজুগে পড়িয়া, বাংলার সমাজদেহ ও মন যতখানি অস্বাস্থ্যকর আলোড়নে ত্রস্ত,—ক্ষতিগ্রস্ত,—পশ্চিমভারতের নিরক্ষর ও অল্পশিক্ষিত সমাজ এখনও ধ্বংসপথে ততটা অগ্রসর নয়। দেহ-মনের স্বাস্থ্য ও শক্তিরক্ষার জন্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়া,—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অনেক আদর্শ আজিও সেখানে সুপ্রচলিত। অসংযত উপভোগ-তৃষ্ণা দমন রাখিবার জন্য, দাম্পত্য জীবনে নানাবিধ নিষেধ প্রতিপালনের ব্যবস্থা ইহাদের শুধু নিম্নশ্রেণীতে নয়,—অভিজাত সম্প্রদায়ে

আজও দেখা যায়। তাই স্বাস্থ্য ও শক্তির দিক দিয়া তাহাদের সমাজ এখনও ততটা অধোগতি লাভ করে নাই। কিন্তু এবার,—আধুনিক সভ্যতার আব্‌হাওয়া ক্রমশঃ পৌঁছিতেছে।

পার্ব্বতী খাইতেছিল, খন্তর একটু পরে জামা জুতা পরিয়া ব্যস্ত-চরণে আসিয়া উঁকি দিল। দ্রুতস্বরে বলিল, "খাও তুমি, আমি এখনি দোকান থেকে আস্‌ছি।"

কিছুক্ষণ পরে সে এক বোতল গোলাপজল ও দুইটা নূতন কুলুপ হাতে হাসিমুখে বাড়ী ঢুকিল। পার্ব্বতী তখন পাণ চিবাইতে চিবাইতে ঘোমটা টানিয়া গুটি গুটি চরণে বহির্গমনের উদ্যোগ করিতেছে। খন্তর দুয়ার বন্ধ করিতে ভুলিয়া বলিল, "কোথা যাচ্ছ?"

অতিশয় গম্ভীর হইয়া পার্ব্বতী বলিল, "চুলোয়।"

"চল্‌বে না। তোমার জন্যে ডবল চাবিওলা কুলুপ আনলুম। বাড়ী-ঘরের চাবি একটা তোমার কাছে থাক্‌বে, একটা আমার কাছে। রাতে এসে নিজেই কুলুপ খুলে ঢুক্‌ব। আর এই গোলাপজল তোমার। মাথায় খানিক থাব্‌ড়ে,—ঘুমোও গিয়ে। মাথাধরা ছেড়ে যাবে।" বোতলটা খন্তর আগাইয়া ধরিল।

নিস্পৃহ ভাবে পার্ব্বতী বলিল, "চাই না। নিজের মাথায় ঢাল। যাকে ভালবাস, তার মাথায় ঢাল।"

সোৎসাহে খন্তর বলিল, "ঢাল্‌ব? হুকুম দিচ্ছ? রাগ কর্‌বে না ত?"

"দরকার কি?"—একান্ত নিরুৎসুক ভাবে কথাটা বলিতে বলিতে পার্ব্বতী পাশ কাটাইবার জন্য পাঁচীল ঘেঁষিয়া দুয়ারের দিকে চলিল।

মুচ্‌কি হাসিয়া কুলুপ দু'টা পকেটে পূরিতে পূরিতে খন্তর মন্তব্য প্রকাশ করিল, "স্ত্রীলোকের কাছে শৌর্য্য দেখাতে নেই,—শাস্ত্রের নিষেধ। কিন্তু এমন অবস্থায়—"

হঠাৎ আড়ভাবে ঘুরিয়া, পার্ব্বতীকে পাঁচীলে ঠাসিয়া ধরিল। হাসি মুখে বেশ ধীরে সুস্থে বোতলের ছিপি খুলিতে লাগিল। পূর্ব্বেই গালা ভাঙা হইয়াছিল। পথে পাড়ার এক পরিচিত বৃদ্ধকে চোখে দিবার জন্য কিঞ্চিৎ গোলাপজল দান করিয়া আসিয়াছিল।

পার্ব্বতীর সর্ব্বাঙ্গে পুলক-চাঞ্চল্যের ঢেউ খেলিয়া গেল। উচ্ছলিত কৌতুকের উত্তেজনায় মুখ রাঙিয়া উঠিল। প্রকাশ্যে মহা রাগ জানাইয়া প্রাণপণ বলে ঠেলাঠেলি করিয়া সরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্দীদশা ঘুচিল না। খন্তর অবলীলাক্রমে তাহাকে আটকাইয়া রাখিল এবং বেশ ধীরতার সঙ্গে মাথার ঘোমটা সরাইয়া, কয়েক গণ্ডূষ গোলাপজল ব্রহ্ম-তালুতে থাব্‌ড়াইয়া দিল।

পার্ব্বতী সবেগে মাথা ঝাঁকাইয়া, মুক্তিলাভের ব্যর্থ চেষ্টায় ঠেলাঠেলি করিতে করিতে ভয়ানক রাগ জানাইয়া বলিল "ছাড় ছাড়। উঃ, গায়ে জোর ত কম নয়—"

অবহেলা ভরে আর একটু চাপ দিয়া খন্তর নিরুদ্বেগ গম্ভীর মুখে বলিল. "ছ্যাঃ! তোমার গায়ে কিচ্ছু জোর নেই। আমার দু-হাত যোড়া,—তবু ছাড়াতে পার্‌লে না? ছাড়াও—"

বোতলের মুখে সে ছিপি আঁটিতে লাগিল।

শক্তিমত্তা এদেশে শ্লাঘার ব্যাপার। ধিক্কারে পার্ব্বতী যথার্থই উত্তেজিত হইল, সবলে ঠেলিয়া ফাঁক কাটাইয়া সরিবার চেষ্টা করিল, সাধ্য হইল না। রাগ করিয়া রুদ্ধ উত্তেজনায় বলিল, "সর বল্‌ছি। নইলে গায়ে পাণের পিক্—"

সতর্কীকরণের সঙ্গে সঙ্গেই অধীর হইয়া সত্যই থু থু করিয়া খন্তরের জামায় পিচসমেত চিবানো পাণ ছিটাইয়া দিল!

অক্ষমের প্রতিশোধ চেষ্টার দশা এই রকম দুর্ব্বল ভাবাপন্নই হইয়া

থাকে। অন্য কেহ হইলে কি করিত, বলা শক্ত,—শ্বশুর অনুকম্পাভরে হাসিল। বোতলটা মাটীতে রাখিল। ভ্রূভঙ্গী করিয়া কৃত্রিম কোপে বলিল, "আচ্ছা 'বে-আদব বহু' ত। 'চাষার গিদ্দে, কান্তের ঠোক্কর' লোকে বলে ত ঠিক! দেখবে? শোধ নেব?"

উত্তেজনার মাথায় পাণ ছিটাইয়া দিয়াই পার্ব্বতীর চৈতন্য ফিরিয়াছিল। ভয়ে মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় আশঙ্কা করিয়াছিল জামাটা নষ্ট করিয়া দেওয়ায় শ্বশুর ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া এমন কিছু অশোভন কাণ্ড করিবে, - যাহা একান্ত অবাঞ্ছনীয়।

কিন্তু তার পরিবর্ত্তে শ্বশুরের চক্ষে কৌতুকের দীপ্তি, মুখে বিদ্রূপের হাসি! পার্ব্বতী অবাক্ হইয়া গেল! এতখানি ক্ষমাধর্ম্ম সে বোধ হয় জীবনে দেখে নাই। মনে সম্ভ্রম বোধ হইল,—নিজের বর্ব্বরতায় হয় ত বা একটু লজ্জা বোধ হইল। দেয়ালের গায়ে মুখ লুকাইল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

তাহার এই সলজ্জ পরাজয়স্বীকারসূচক ভঙ্গীটি নিমেষে শ্বশুরের মনে এক অভিনব আনন্দ ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি করিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে কথা মনে করিতে তাহার চিত্ত বিতৃষ্ণা বিরক্তিতে ভরিয়া গিয়াছিল,—চক্ষের নিমেষে সেই যৌবন-চাপল্যলীলার উত্তেজনা চিত্ত অধিকার করিল। ক্ষণেকের জন্য শ্বশুর ভুলিয়া গেল—সে পুত্র-শোকার্ত্ত পিতা! পত্নী-শোক-ক্লিষ্ট স্বামী!

মনে হইল পলক মধ্যে সমস্ত অতীত তাহার জীবনের অঙ্ক হইতে ঝরিয়া গিয়াছে। সে শুধু—এখন নব-বিবাহিতা পত্নীর পাশে, সনাতন-অনুগ্রহ-প্রার্থী, নব-প্রণয়ী।

সাদরে পার্ব্বতীর কোমল মুখের পাশে নিজের ক্ষৌর-মসৃণ কঠিন গণ্ডদেশ চাপিয়া ধরিল।—পূর্ব্ব প্রশ্ন ভুলিয়া সানুরাগে বলিল, "রাগ করে কোথা যাওয়া হচ্ছিল শুনি? বোনের কাছে?"

"হুঁ।"

"কাল যেও। আজ মাথা ধরেছে, কপালে গোলাপের পটি দিয়ে ঘুমুবে চল।"

"নাঃ, তোমার ঘরে আর নয়।"

"আহা, চল চল।"

গভীর অভিমানে ঝঙ্কার হানিয়া পার্ব্বতী বলিল, "কক্ষণো না। না—আমি যাব না। দিল্লাগী আমি বুঝি। ওরা শিখিয়ে দিয়ে গেল, তাই তামাসা করে যত্ন দেখাতে এসেছ। ওসব লোক-দেখানো ভালবাসা আমার দরকার নেই।"

"লোক এখানে কেউ নেই, দেখাব কাকে? আর ভালবাসা, মন্দবাসা? সে দুর্ম্মতি থেকে ভগবান তোমাকেও রক্ষা করুন, আমাকেও। না না, ঠেলাঠেলি কোর না, লাগ্‌বে তোমার। আমায় নড়াতে পারবে না।···অসুস্থ শরীরে রোদে ছুটোছুটি কর্‌তে যাবে,—তাই আটকাচ্ছি। নইলে যাও না বেড়াতে। শরীর ভাল থাক্‌লে মানা কর্‌তুম না। আজ ঘুমবে চল।"

"ঘুমুবও না, যাবও না। আমায় এখান থেকে নড়ায় কার সাধ্যি?"

"মানে? সে ক্ষমতা আমার নাই?"

অবজ্ঞার আবরণে কৌতুক-কৌতূহল চাঞ্চল্য ঢাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে পার্ব্বতী—প্রবল উপেক্ষার সুরে বলিল, "যাও যাও। বড় মরদ্!"

খস্তর চকিত-কটাক্ষে পার্ব্বতীর মুখভাব লক্ষ্য করিল। সে যতই রাগ দেখাইবার চেষ্টা করুক, প্রমোদ রঙ্গের উত্তেজনায় তাহার মুখ চোখ উল্লাসে ঝল্‌মল্ করিতেছে। বুঝিল—এই সব লঘু চাপল্যের হুড়াহুড়ি পাইলেই পার্ব্বতীর তরল-চিত্ত খুশী!

উচিত কি না ভাবিতে ত্বর্ সহিল না। চট্ করিয়া কোমরে কাপড়ের ফাঁশটা দৃঢ়তর করিয়া আঁটিল। মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "ত্যাখ তবে কেমন মায়ের দুধ খেয়েছি। আমাব ছেলের জন্যে—এগ্নি শক্ত মা চাই। মনে থাকে যেন।"

বুক চিতাইয়া দমভোর একটা দীর্ঘশ্বাস টানিল। পরমুহূর্ত্তে সামনে ঝুঁকিয়া, বাঁ হাতে পার্ব্বতীর হাঁটু দু'টা জড়াইয়া কটিদেশে নিজের কাঁধ বাধাইল। চক্ষের পলকে পার্ব্বতীর হৃষ্ট-পুষ্ট নধর দেহটা এমন অবহেলায় ঘাড়ে তুলিল—যেন একটা সোলার পুতুল!

অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "দিই এবার আছাড়?"

লজ্জাত্রস্ত পার্ব্বতী সভয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "নামাও নামাও। ভয় কর্‌ছে আমার। পায়ে ধরি গো—"

"ঘাড়ের ওপর থেকে নাগাল পাবে? বাড়াও হাত।"

ভয়ানক অধীরতা প্রকাশ করিয়া পার্ব্বতী অর্থহীন ভাষায় হঠাৎ তীব্র চীৎকার করিল! খন্তর চম্‌কাইল! না, সে ত ঠিক কায়দার সহিত ধরিয়া আছে। পার্ব্বতীর দেহের কোনখানে গুরুতর বেদনা লাগিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ত নাই। তবে এত তীব্র চীৎকারের অর্থ? উগ্র অধৈর্য্য-প্রবণ স্বভাবের পরিচয়?

ঘাড় হেঁট করিয়া সন্তর্পণে তাহাকে মাটীতে নামাইয়া, খন্তর বিস্মিত ভাবে বলিল, "না, তোমার লাগে নি ত। অত চ্যাচালে কেন? ভয়ে?"

তিরবির্ করিয়া লাফাইয়া কয়েক পা সরিয়া গিয়া পার্ব্বতী পুনশ্চ পাঁচীল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত বলিল, "ভয়ানক শয়তান তুমি!"

পরমুহূর্ত্তে অসহনীয় আবেগভরে হঠাৎ খিল্ খিল্ শব্দে হাসিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল।

চকিতে খন্তরের মনে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন ঘৃণার ভাব উদয় হইল—কি অসংযত, অধীর স্বভাব নারী! ইহার মান-অভিমানের উগ্রতা,—আদর-সোহাগ-বিহ্বলতা, সকলের মূলে রহিয়াছে,—উহার অসংযত প্রবৃত্তির উত্তেজনা এবং দেহজ্ঞান-সর্ব্বস্বতা! এই শ্রেণীর নর-নারীরা দেহগত সুখ-দুঃখের তুচ্ছতম অবস্থা পরিবর্ত্তনে, চারিপাশের নিরীহ মানুষদের কি বিব্রত সন্ত্রস্ত করিয়াই তোলে!

উঃ, পার্ব্বতীর ভবিষ্যৎ সন্তানরা যদি মাতৃ-প্রকৃতির অনুসরণ করে? যদি এমনি দেহজ্ঞান-সর্ব্বস্ব, চিন্তাশক্তিহীন, অমানুষ, বর্ব্বর হয়?

আতঙ্ক বোধ হইল। খন্তরের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। মনে চাকতে যে বাসনার রঙ ধরিয়াছিল, চকিতে তাহা অন্তর্হিত হইল!

হাসিতে হাসিতে পার্ব্বতী রাগ জানাইয়া বলিল, "দাঁড়িয়েছিলুম, তাই বেকায়দায় পেয়ে বড় সহজে ভুলেছিলে। এবার এস ত, তোম দেখি।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দুয়ারের বাহির হইতে সুমারের জননী উঁচু গলায় বলিলেন, "দুয়ার খোলাই রয়েছে ত। খন্তরের বাড়ীতে এসেছে কি? লছমি, ও লছমি—"

খন্তরের চমক্ ভাঙিল। তাই ত! সদর দুয়ারটা খোলা রাখিয়া এতক্ষণ অশিষ্টতা করিতেছিল! ভাগ্যে কেহ এতক্ষণ আসে নাই!

পাণের-পিচ-রঞ্জিত জামাটা গুরুজনের চোখের আড়ালে লুকাইয়া ফেলিবার প্রয়োজন বোধ করিল। তাড়াতাড়ি সেটা খুলিয়া গুটাইয়া কাঁধে ফেলিল। দুয়ারের কাছে গিয়া বলিল, "কে চাচি? এস এস—"

"না বাবা, যাব না এখন। সুমারের বড় বেটীকে খুঁজে পাচ্ছি না! এখানে আসে নি?"

"না। তার সঙ্গী সাথীদের ওখানে খেলা—"

"ও পাড়া পর্য্যন্ত খুঁজে এলুম বাবা। শনিচরের বাড়ীতেও যায় নি। তোর চাচা বাড়ীতে নেই, সুমার রাত জেগে এসে ঘুমুচ্ছে। বুড়ো মানুষ আমি, কত ছুটোছুটি করি বল ত ?"

"আচ্ছা, আমি এধারটা দেখ্‌ছি। তুমি দাঁড়াও।"—খন্তর সেই অবস্থায় বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে মেয়েটাকে লইয়া সে ফিরিল। পার্ব্বতী তখন বাহিরে আসিয়া সুমারের মার সহিত স্বচ্ছন্দ প্রসন্নমুখে কথা কহিতেছিল। খন্তরকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া ধীর কদমে শনিচরের বাড়ীর দিকে চলিল। সে গমন এত ধীর যে, রীতিমত অনিচ্ছুক-মন্থর গতি বলা চলে।

খন্তর তাহার স্বচ্ছন্দ-সুস্থ মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল—পার্ব্বতী নিজের অসহিষ্ণু-উত্তেজনাশীল কল্পনাবশে শিরঃপীড়াটা যত গুরুতর মনে করিতেছিল, বাস্তবিক তত গুরুতর ব্যাপার নয়। স্বার্থপর, আত্মশ্লাঘা-পরায়ণ, দেহেন্দ্রিয়-জ্ঞান-সর্ব্বস্ব, মানুষেরা নিজের অল্পমাত্র দৈহিক ক্লেশকে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক মনে করে। ইহাদের মানসিক দুর্ব্বলতাগুলা বাস্তব ব্যাপার ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হওয়া ভুল।

নিরাসক্ত মন ক্ষণমধ্যে নিশ্চিন্ত হইল। পার্ব্বতীর প্রস্থানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া খন্তর মেয়েটিকে বুক হইতে নামাইল। সহাস্যে বলিল, "এই নাও চাচি। ডোবার ধারে বসে ছিল। কতকগুলো ঘাসের ফুল আর খোলামকুচি নিয়ে ছট্ পরব করছিল।"

ক্রুদ্ধ হইয়া চাচি বলিলেন, "এই ঠিক দুপুরে ছট্ পরব ? গলায় পা দিয়ে, মেরে ফেল্।"

"আহা, ভগবানের জীব ! বলতে নেই ওসব কথা। নিয়ে যাও ঘরে।"—অনুনয়ের সহিত খন্তর বলিল, "এর মাকে বোল বাপু যেন মার-ধোর না করে। না বলে গেছে, এইটুকু যা দোষ। নইলে গেছে ত

পূজা-অর্চ্চনা কর্‌তে—সে ত ভালই। যা বেটি, আর অমন করে না-বলে যাস্ নি।”

মেয়েটির মাথা চাপ্‌ড়াইয়া একটু আদর করিয়া খন্তর নিজের বাড়ী ঢুকিতে উদ্যত হইল। চাচি শোকার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, “আহা খন্তরা, ছেলেপিলের উপর তোর কি মায়া রে? আহা নিজের দু'টো থাক্‌লে কত বড়ই হোত এতদিনে! কোথায় যে গেল সব!”

ব্যথিত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া খন্তর ভিতরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিতে করিতে বলিল, “তাদেরও কর্ম্ম, আমারও কর্ম্ম। যাক চাচি, যেখানে গেছে, ভগবান যেন তাদের শান্তিতে রাখেন।”

পরক্ষণে চকিত-কটাক্ষে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া বলিল, “তোমার এ ‘বহু’ বেড়াতে চল্‌ল বুঝি। বলে দাও ভো যেন সাড়ে পাঁচটার সময় বাড়ী আসে। আমি এখন ঘুমতে চল্‌লুম। প্রথম রাতে আমার ডিউটি।”

সে হুড়্‌কা বন্ধ করিল।

পার্ব্বতী চলিতে চলিতে বার বার থমকিয়া দাঁড়াইতেছিল। কখনও তাহার পায়ে ঢিল বাধিতেছিল, ঢিলটা দূরে ছুঁড়িয়া দিতেছিল। কখনও বা থামিয়া পথের পাশে কাঁটা ঝোপ ও ঘাসের ফুলগুলা গভীর মনোযোগে নিরীক্ষণ করিতেছিল। ইহাদের কথাবার্ত্তায় সে কাণ দিতেছে, এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

খন্তর হুড়্‌কা বন্ধ করিতেই খুড়-শাশুড়ী চেঁচাইয়া বলিলেন, “ছেলে আমার ঘুমতে গেল গো। পহেলা রাতে তার কায। সাড়ে পাঁচটায় ফিরিস্ গো বহু।”

পার্ব্বতীর মুখখানা প্রথমে বিবর্ণ,—পর মুহূর্ত্তে কঠিন হইয়া উঠিল। এত অবহেলা! খন্তর কি কোন ছলে তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইতে পারিত না? গুরুজনের সামনে এতই যদি চক্ষুলজ্জা, কোন ছুতায় পার্ব্বতীর পিছু

পিছু আসিতে ত পারিত। নির্জ্জন পথের মোড় হইতে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে ত পারিত। কিছুই করিল না সে!...উঃ, কি স্বার্থপর, নিদ্রাসুখপ্রিয়, অকর্ম্মণ্য!

ক্রুদ্ধ হইয়া খরচরণে ভগিনীর বাড়ী চলিল। তাহার সে সময়ের চিত্তগতির অর্থ বিশ্লেষণ করিলে সহজ ভাষায় এই দাঁড়ায়,—তাহার স্বামীটি নিষ্কর্ম্মা প্রমোদ-রঙ্গ-বিলাসী অপদার্থ স্ত্রৈণের মত অহরহ তাহার আঁচল ছুঁইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া মরুক। তাহার কঠিন পরিশ্রমে অন্নচেষ্টা এবং ক্লান্তিহারী বিশ্রাম রসাতলে যাক। কিসের জন্য সে সকল? পার্ব্বতীকে খুশী করিবার জন্যই ত? পার্ব্বতী খুশী হইতে চায় শুধু তাহাকে বিবিধ উপাদেয় ভোজ্য খাওয়াইয়া এবং বিবিধ উপায়ে খেলাইয়া! এই সুখই যদি পার্ব্বতীর না হইল, তবে জীবনে সার্থকতা কি?

পার্ব্বতীর দোষ নাই। দৈহিক ভোগ-সর্ব্বস্ব, ক্ষুদ্রচিত্ত স্বামী এবং স্ত্রী সংসারে অনেক আছে, তাহারা এমনই ভাবিয়া থাকে। বিবাহিত জীবনের কোন উচ্চতর দায়িত্বের কথা তাহারা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু দু'জনের মধ্যে একজন যদি সে দায়িত্বের মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে চায়, তবে বাধে বিপ্লব, আসে অশান্তি।

বৈকালে সাড়ে পাঁচটার পূর্ব্বেই দুয়ারে দমাদম্ শব্দে অসহিষ্ণু করাঘাত বাজিল। ঘুম ভাঙিয়া খস্তর ত্রস্তে গিয়া দুয়ার খুলিল। পার্ব্বতী ও বিশুয়ার মা বাড়ী ঢুকিল।

কোন দিকে না চাহিয়া পার্ব্বতী দ্রুতচরণে শোবার ঘরে গেল। বিশুয়ার মা রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে মৃদু কুণ্ঠার সহিত বলিল, "দুয়ারে খিল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে বাবা, বউ বাড়ী ঢুকতে পায় নি। রাগ করছিল।"

"সদর খুলে রেখে ত ঘুমুতে পারি না।—" বলিয়া খস্তর মুখে চোখে

জল দিল। ঘরে গিয়া দেখিল পার্ব্বতী নিজের বিছানায় অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখে শুইয়া আছে। কপালে দারুচিনি-বাটা লেপন করিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া মুখ বিকৃত করিতেছে।

পার্ব্বতীর রাগের সংবাদ পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে, অতএব বিপদ আসন্ন। খন্তর জামা জুতা গুছাইতে গুছাইতে প্রশ্ন করিল, "ঘুমিয়েছিলে? —না, ঘুমোও নি বোধ হয়। মাথা ছাড়ে নি?"

গর্জ্জন করিয়া শ্লেষ-তিক্ত স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "খুব স্বার্থপর লোক যা-হোক! পাছে বাড়ীতে এসে একটু ঘুমুই, সেজন্যে বাড়ী ঢুকতে পর্য্যন্ত দিলে না। নিজে ত বেশ আরাম করে গোটা দুপুরটা ঘুমুলে। আমি ঘুমুব কোথা?"

খন্তর অবাক! ক্ষণপরে শান্ত ভাবে বলিল, "তুমি চলে গেলে, কাযেই কপাট বন্ধ করে ঘুমালাম। আসবে বল নি ত।"

"আমিই না-হয় চলে গেলুম। তুমি কোন্ ফেরাবার জন্যে ডাকলে? কোন্ একটা খোঁজ নিতে গেলে? ভালবাসা যে কেমন আন্তরিক, তা আচার আচরণ দেখলেই বোঝা যায়।" পার্ব্বতী অবজ্ঞা প্রকাশের চেষ্টায় ঠোঁট বাঁকাইল।

খন্তর হতবুদ্ধির মত ক্ষণেক নির্ব্বাক থাকিয়া বলিল, "তুমি সোজাসুজি বেড়াতে গেলে, আমি সোজাসুজি দুয়ার বন্ধ করে ঘুমুলাম। ডাকতে গেলে পাছে রাগারাগি করে লোক হাসাও, তাই ডাকি নি। আগেই ত বলেছিলাম, বাড়ীতে ঘুমোও। এখন আমার আন্তরিকতায় সন্দেহ কর ত, আমি নাচার!"

"খুব আরামে ঘুমিয়েছিলে ত?"

"রাত জাগতে হবে, কাযেই ঘুমিয়েছিলাম। আরামে কি দুঃখে, তা টের পাই নি। শোন, শরীর ভাল নেই তোমার, আজ আর রান্না

বাড়া কোর না। আমি ওইখান থেকে ছাতু খেয়ে আস্‌ব। তুমি খেয়ে সকাল সকাল ও-বাড়ী যেও।”

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, “না—যাব না।”

“কেন? ওখানে চাচি রয়েছে, ভোজি রয়েছে—”

“থাক। আমি বিশুয়ার মাকে নিয়ে এখানে থাক্‌ব। তিন পহর রাতে এসে তুমি আর কোথাও আড্ডা দিতে যাও কি না দেখ্‌তে চাই। —আছে কেউ মেয়েমানুষ?”

বিরক্তির সহিত খন্তর বলিল, “রাম রাম! তোমার মাথায় কেবল ওই সব কুচিন্তা? নাঃ, তোমার সঙ্গে কথা বলা দায়।”

পিছন ফিরিয়া সে জামা জুতা পরিতে লাগিল।

পার্ব্বতী ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, “এর মধ্যে কাসে যাবার সময় হোল? কার জন্যে যাচ্ছ শুনি?”

এ সব অর্থহীন প্রলাপের উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। খন্তর নীরব রহিল।

পার্ব্বতী পুনশ্চ বলিল, “কার জন্যে টাকা আন্‌তে যাচ্ছ?”

বলিলে ভাল হইত ‘তোমার জন্য।’ পার্ব্বতী হয়ত ইহাতে খুশী হইত। কিন্তু কথাটা ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের গরজ আছে, ভবিষ্যৎ সংস্থানের চিন্তা আছে, ভ্রাতৃ-পরিবারের কথাও ভাবিতে হয়। তাছাড়া আরও পাঁচটি অভাবগ্রস্তের দায়ে দৈবাৎ সাহায্য করিতে হয়। সুতরাং আংশিক মিথ্যা কথায়, বৃথা গর্ব্বে ফুলাইয়া পার্ব্বতীর মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। খন্তর নিরুত্তর রহিল।

পার্ব্বতী অত্যন্ত অস্বস্তির সহিত এপাশ ওপাশ করিতে করিতে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল, “কি হিংসুটে, খল এই মানুষগুলো! কেবল নিজের আরামটুকুই চিনেছে। আমার মুখ চাইতে সংসারে কেউ নেই।”

অর্থাৎ সে নিজে অত্যন্ত সরল। হিংসা কুটিলতার দিক দিয়া চলে

না। নিজের স্বার্থ আদৌ ভাবে না। কেবল পরার্থপরতাবশে পরের মুখ চাহিয়া, পরদুঃখ মোচনে তৎপর থাকে। কিন্তু খন্তর নামক স্বার্থপর ব্যক্তিটি মোটে তাহার দুঃখে দৃকপাত করে না।

কপালের দারুচিনির প্রলেপগুলা ছাড়াইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে অধিকতর অসহিষ্ণু ভাবে পুনরায় বলিল, "উঃ! কি জ্বালাই কর্‌ছে। দাও তো একটা গোলাপ জলের পটি।"

পার্ব্বতীর আক্ষেপগুলা প্রকারান্তরে খন্তরের উদ্দেশে গঞ্জনা মাত্র, খন্তর তাহা বুঝিল। মনে মনে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইল। গোলাপ জলের পটি আনিয়া পার্ব্বতীর কপালে দিয়া ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে বলিল, "তখন অত বল্‌লুম। তখন ঘুমুলে এতক্ষণে সুস্থ হতে। কথা ত শোন না, জিদের বশে নিজের কষ্ট বাড়াও। এখন তোমাকে দেখি, না নিজের চাকরি বাঁচাই?"

"কার জন্যে চাকরি? মরুক চাক্‌রি। আজ যেতে হবে না, বস।" খন্তরের হাত ধরিয়া পার্ব্বতী পাশে বসাইল।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া খন্তর পরমুহূর্ত্তে উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল, "পৌনে ছ'টা বেজে গেছে। চল, তোমাকে শনিচরের বাড়ীতে রেখে আসি। আমাকে যেতেই হবে, নইলে ওরা ভারি অসুবিধায় পড়্‌বে।"

"থাক্‌বে না তুমি? না—যাব না। বিশুয়ার মাকে নিয়ে আজ বাড়ীতে থাকব।"

"সে কি? ও গরীব লোক। ওর ঘর দোর দেখ্‌বে কে?"

"বোন এসেছে। তারা আগলাবে।"

"থাক তবে। আমার আর বস্‌বার সময় নেই। মাপ কর।" হাত ছাড়াইয়া উঠিয়া খন্তর দ্রুতপদে বাহিরে গেল। বিশুয়ার মার সঙ্গে দু একটা কথা কহিল। হাঁ—তাহার ভগিনী আসিয়াছে, সে থাকিবে।

খন্তর ঊর্দ্ধশ্বাসে কর্ম্মস্থানে ছুটিল।

২৪

কিন্তু বিশুয়ার মাকে রাত্রে বাড়ীতে রাখিয়া পার্ব্বতী ফাঁপরে পড়িল। দেখিল এই স্বজাতীয়া বৃদ্ধাকে—শুধু মাত্র বার্দ্ধক্যের অজুহাতে শ্বশুর সন্তান-জনোচিত সমীহ করিতেছে। ইহার সামনে ত নয়ই—আড়ালেও পার্ব্বতীর কোনরূপ নির্লজ্জ বাচালতার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নয়।

প্রশ্রয়ের অভাবে নিরুদ্যম হইবার পাত্রী পার্ব্বতী নয়। তাহার জিদ বাড়িল—লোকটার অবাধ্যতা দূর করিবেই। স্বামীর হৃদয় অধিকার করিয়া উহাকে মুঠায় পূরিবে। এমন বশীভূত করিবে যে পার্ব্বতীর অনুজ্ঞা ব্যতীত সে যেন উঠিতে বসিতে ভুলিয়া যায়।

পার্ব্বতীর মতে—ইহাতেই তাহার নারীত্ব সার্থক। ইহাতেই নারী-জন্মের পরম চরিতার্থতা। চাই—নিরবচ্ছিন্ন আধিপত্য। সে আধিপত্যের পীড়নে—শ্বশুরের হউক সর্ব্বনাশ, হউক মৃত্যু,—ক্ষতি নাই। কিন্তু পাঁচজনের সহিত পার্ব্বতীও যেন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারে, হাঁ, লোকটা মনে প্রাণে তাহার অধিকারভুক্ত,—আজ্ঞানুবর্ত্তী জীব বটে।

কিন্ত এ-হেন আধিপত্য বিস্তারের যে দু'টা সহজ পথ তাহার জানা আছে, সে দু'টার কোন পথেই শ্বশুরের নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য। লোকটা না ভোজন-বিলাসী ঔদরিক, যে রন্ধন-পারিপাট্যে মোহিত হয়। —না দৈহিক-সুখ-ব্যাকুল দুর্ব্বল-চেতা জীব, যে পার্ব্বতীর প্রবল আড়ম্বর-পূর্ণ সেবা আয়োজনে আত্মহারা হয়। পার্ব্বতীর গহনা কাপড়ের ফরমাস, খুটি-নাটি আদর আব্‌দার সে হাসিমুখে মানিয়া লয়। তিক্ত কথা মিষ্ট কথা সমান ধৈর্য্যে সয়। বড় জোর—কিছুক্ষণের জন্য একটু অপ্রসন্ন গম্ভীর হয়, নয়ত চোখে মুখে প্রসন্নতার উজ্জ্বল কিরণ দেখা যায়। হয়ত

বা কোন সময় একটু চঞ্চলচেতা বলিয়া মনে হয়, আশা হয় লোকটার মনে এবার দুর্দ্দাম আবেগ-মত্ততার নেশা ঘনাইয়া আসিতেছে। পার্ব্বতী উৎসুক আগ্রহে অধীর হইয়া উঠে। পর মুহূর্ত্তে হতাশ হইয়া দেখে, মানুষটা ভয়ানক গম্ভীর হইয়া অন্য কাযে মন দিয়াছে। উহার চঞ্চলতা যেন ক্ষণিকের খেলা। আসলে—উহার ভগবচ্চিন্তাভিমুখী মনকে কোনরূপে প্রলুব্ধ করিয়া আয়ত্তে আনিতে পারে না।

প্রচ্ছন্ন পরাজয় বুকে বাজে। খন্তরের নির্ব্বিকারত্ব ভাঙিবার জন্য পার্ব্বতীর সমস্ত অন্তর বুভুক্ষিত উন্মাদনায় ব্যাকুল হইয়া উঠে।

কয়দিন পরের কথা।

সেদিন রাত্রি আড়াইটার সময় বাড়ী ফিরিয়া খন্তর দেখিল পার্ব্বতী আতঙ্ক উত্তেজিত অবস্থায় জাগিয়া আছে। বিশুয়ার মাকেও ঘুমাইতে দেয় নাই। যে-হেতু ও-পাড়ায় এক বৃদ্ধ মারা গিয়াছে, অতএব পাছে তাহার প্রেতাত্মা আসিয়া আবির্ভূত হয়, এই আশঙ্কা! নিজের বার্দ্ধক্য দৌর্ব্বল্য, শ্রম-ক্লান্তির কথা বলিয়া বৃদ্ধা অনুনয় করিয়াছে। ঠাকুর-দেবতার নামের দোহাই দিয়া কত বুঝাইয়াছে, পার্ব্বতী শোনে নাই। নিষ্ঠুর চিত্তে বার বার বৃদ্ধার তন্দ্রা ভাঙাইয়া জাগাইতেছে। বৃদ্ধা মহা অসুস্থতা বোধ করিতেছে।

সংবাদ শুনিয়া খন্তর মনে মনে বিরক্ত হইল। পার্ব্বতীর প্রকৃতিতে নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য ও অবিবেচনার প্রাচুর্য্য যথেষ্ট বাড়িয়াছে, তাহা বুঝিয়াছে। কিন্তু একটা তুচ্ছ কুসংস্কারের তাড়নায় দরিদ্র বৃদ্ধাকে এতটা ক্লেশ দেওয়ায়, বাস্তবিক কষ্টবোধ করিল। মনে দুঃখ হইল নিজের দাসী-জীবনের দুঃখের কথা পার্ব্বতী এর মধ্যে ভুলিল! সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল পার্ব্বতীর মত হৃদয়হীনা প্রভু পার্ব্বতী পায় নাই, অতএব সে অভিজ্ঞতা উহার নাই।

প্রকাশ্যে কিছু বলিতে সাহস হইল না। বলিলে সংবাদটা গ্রামশুদ্ধ জানাজানি হইবে। সেদিন মাথায় গোলাপজল দেওয়ার তুচ্ছ সংবাদটা পার্ব্বতী এমন অতিরঞ্জিত ভাবে জাঁক করিয়া সকলকে শুনাইয়া বেড়াইয়াছে, যে, পথে ঘাটে ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। পার্ব্বতীর জন্য লজ্জা বোধ হয়।

সংক্ষেপে বলিল, "এতই যখন ভয়, গয়নাগুলো নিয়ে চাচির কাছে গিয়ে থাক্‌লেই ত হয়। বুড়া মানুষকে কষ্ট দেওয়া কেন?"

বিশুয়ার মা সকাতরে বলিল, "বহু বড় ভীরু। সারা রাত ডরে কাঁটা হয়ে আছে। তুমি বেটা আজ ঘরে যাও, বুঝিয়ে পড়িয়ে ওকে একটু সাহস দাও। আমি বাইরে হাওয়ায় খানিক ঘুমুই এবার।"

এ কয়দিন গভীর রাত্রে ফিরিয়া গ্রীষ্মের জন্য খন্তর আঙিনায় খাটিয়া পাতিয়া ঘুমাইত। রাত্রি-জাগরণ-শ্রান্ত, তপ্ত মস্তিষ্কে খোলা হাওয়া চাই। নচেৎ সুনিদ্রা হয় না। ঘরে পার্ব্বতীর কাছে বৃদ্ধা থাকিত। ব্যবস্থাটা অবশ্য পার্ব্বতীর মনঃপূত নয়। কিন্তু একে ভূতের ভয়, তায় বৃদ্ধার উপস্থিতি,—সকলের উপর কঠিন বাধা খন্তরের চিত্তসংযম-দৃঢ়তা। কোন ছুতায় গল্প করিতে যাইলে, খন্তর প্রশান্ত ধৈর্য্যে কোন একটা উচ্চ প্রসঙ্গের আলোচনা জুড়িত, পার্ব্বতীর নীচাভিলাষী চিন্তাগতি রুদ্ধ করিয়া দিত। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার উপস্থিতির প্রতি এমন ভাবে ইঙ্গিত করিত যে পার্ব্বতী দায়ে পড়িয়া উঠিয়া আসিত।

আজ বৃদ্ধার প্রস্তাব শুনিয়া খন্তর বিনা দ্বিধায় বলিল, "আচ্ছা, তুমি বাইরে ঘুমোও। একা থাকতে ভয় করবে না ত মায়ি?"

"না বেটা, কিছু না।"—বলিয়া বৃদ্ধা শয্যা আনিয়া রোয়াকে বিছাইয়া শুইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িল।

নির্ব্বাক গম্ভীর মুখে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া খন্তর ঘরে ঢুকিল। গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া বিঁড়ি ফুঁকিতে লাগিল।

অতিশয় কঠোর পরিশ্রমী মানুষেরা যখন নিষ্কর্ম্মা হইবার অবকাশ পায়, তখনও তাহাদের মস্তিষ্কে কর্ম্মস্মৃতির ঘানি ঘোরে। খন্তর অন্যমনস্ক হইয়া কোন ইঞ্জিনের একটা সূক্ষ্ম জটিল অংশের যন্ত্ররহস্যের গঠন-প্রণালীর কথা ভাবিতেছিল। পার্ব্বতী শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিল। উল্লাসমত্ত মুখে কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া উৎসাহের ঝোঁকে অনাবশ্যক জোর দিয়া সশব্দে দুয়ার বন্ধ করিল। উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কাল তোমার ডবল ছুটি ত? সারাদিন কাছে পাব ত?"

একে মন তিক্ত হইয়া ছিল,—তায় রাত্রি জাগরণ-ক্লান্তি, কর্ম্ম-শ্রান্তি, তার উপর এই প্রগল্‌ভতা! ভ্রূভঙ্গী করিয়া নিম্নকণ্ঠে খন্তর উত্তর দিল, "আস্তে। মার বয়সী বুড়ো মানুষ একজন বাইরে রয়েছে। একটু হুঁস্ রেখ।"

পার্ব্বতী একটু কুণ্ঠিত হইল। নিকটে আসিয়া আবদারভরা অনুনয়ের সুরে চুপি চুপি বলিল, "বড় ভয় করছে। মন খারাপ হয়ে রয়েছে। আজ একটু কাছে থাক, একটা ভাল গল্প বল।"

চকিতে উষ্ণ-চিত্তের উপর দিয়া সদয় করুণাবহ এক স্নিগ্ধ-স্পর্শ প্রীতি-হিল্লোল বহিয়া গেল। পার্ব্বতীর মুখপানে চাহিয়া খন্তরের মমতা বোধ হইল। মুখে যতই আস্ফালন করুক—বেচারা অন্তরে অন্তরে যত দুর্ব্বল, তত নির্ব্বোধ!·হোক নিজের শ্রান্তি, উহাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া আবশ্যক।

বলিল, "শোও তোমার বিছানায়। আস্‌ছি।"

নিজের খাটিয়া উঠাইয়া আনিয়া পার্ব্বতীর তক্তপোষের পাশে লাগাইল। বসিয়া একটু ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "বুড়ো মানুষকে সারা রাত

ঘুমুতে দাও নি, কি বে-আক্কেল তুমি! তোমার যত রাগ, তত ভয়, তত দুঃখ, তত কান্না, তত হাসি! নেহাৎ অপদার্থ যেন! আত্ম-সংযমী হতে চেষ্টা কর।"

মনকে সুস্থ শান্ত নির্ভীক করিবার উপায় বলিতে বলিতে শন্তর বলিল, "শোও। গল্প বল্‌ছি, শান্ত হয়ে শুনে, ঘুমোও। বড় ক্লান্ত হয়েছি, ত্যক্ত কোর না। তাহলে মাথার ঠিক রাখতে পারব না।"

পার্ব্বতী জড়সড় হইয়া যথাসাধ্য নিকটে শুইল। সভয়ে সান্ত্বনয়ে বলিল, "যতক্ষণ না ঘুমুই, ততক্ষণ জেগে থেক।"

"জেগে রইলুম। তুমি ঘুমোও, তা'পর শোব। চোখ বোজ।"

পলকের জন্য চোখ বুজিয়া পার্ব্বতী পুনরায় চোখ খুলিল। সাগ্রহে বলিল, "তোমায় বাতাস করব?"

"না, আমার হাতে পাখা আছে।"

"একটু পা টিপে দিই—"

বাধা দিয়া শন্তর বলিল, "তাহলে কথা বন্ধ করে উঠে যাব।"

সন্ত্রস্ত হইয়া পার্ব্বতী বলিল, "না না, থাক। বল গল্প।"

শন্তর বলিতে লাগিল, "পুরাকালে যযাতি নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর পাঁচটি সুস্থ সবল রূপবান গুণবান যুবা ছেলে ছিল। বহুদিন সুখে কাটল। ক্রমে রাজা জরাগ্রস্ত হলেন। রাজকার্য্য ছেলেদের বুঝিয়ে দিলেন। অস্ত্র শস্ত্র ছাড়লেন, মারামারি কাটাকাটি বন্ধ করলেন। শান্ত শিষ্ট হয়ে অবসর জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু গোল বাধল তাতেই। বেকার নিষ্কর্ম্মাদের কাঁধে ভর দেবার জন্য শয়তান ওৎ পেতে থাকে। আমোদের লোভে মানুষ কাঁধ বাড়িয়ে মরে। পাঁচ-পাঁচটি যোয়ান ছেলে সামনে থাকতে, বুড়ো বয়সে রাজা মশাইটি ক্রমে ক্রমে কলুষিত লালসার উত্তেজনায় ক্ষেপে উঠ্‌লেন! সে সময় মনকে

শাসন করা উচিত ছিল। করলেন না। কপালে দুর্ভোগ থাকলে মানুষ তা করেও না। ইন্দ্রিয়-সুখের লোভে তখন দিশেহারা হয়।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে নীরব হইল। ক্ষণেক কি ভাবিল। আত্ম বিস্মৃতের মত আক্ষেপের সুরে বলিল, "উঃ, কি মতিভ্রম! যত বড় কর্পূরের ডেলা হোক,—এতটুকু আগুনের ছোঁয়া পেলে তখুনি হু-হু করে জ্বলে উড়ে যায়। সাধকের প্রাণপণ আরাধনায় পাওয়া, ধর্ম্মানুভূতির পবিত্র সুন্দর জমাট ভাব,—এতটুকু ইন্দ্রিয়-লালসার আগুন ছুঁয়েছে কি,—পুড়ে ছাই। ওই জন্যেই অপবিত্র ভাবের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাচাবার জন্য সাধকেরা অত আচারনিষ্ঠার কড়াকড়ি করেন। হাঁ, অসংযত মনের স্বেচ্ছাচার দমন করতে, সদাচার শুদ্ধাচার পালন করা, খুব দরকার। অবশ্য লোক দেখাবার জন্য শুধু বাইরে নয়, অন্তরে অন্তরেও জেগে থাকা চাই।"

"থাক, তার পর? গল্পটা বল।"

"রাজা মশাই আত্মসংযমের দিকে গেলেন না। তাঁর মনে কেমন একটা কৌতূহল হয়ত হয়েছিল,—'দেখা যাক উপভোগ সুখের চরম সীমাটা কোথা?' মানুষ যখন নিজেকে ঠকাতে বসে, তখন মগজে চড়ে এম্নি কুবুদ্ধির ভূত।"

"ভূত!"—তড়াক্ করিয়া শয্যাসীমার ব্যবধান ডিঙাইয়া পার্ব্বতী সভয়ে শ্বশুরের কোলে মুখ গুঁজিল। যেন সদ্যঃ তাহাকে ভূতে আক্রমণ করিয়াছে, এখানে আসিয়া রক্ষা পাইল!

অপ্রসন্ন হইয়া শ্বশুর বলিল, "আঃ, কি ছেলেমানুষি কর? অমন কর তো গল্প বল্‌ব না।"

"ভয় দেখাচ্ছ কেন?"

"এর নাম চক্‌চকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি!—সরো।" পার্ব্বতীর মাথাটা সন্তর্পণে সরাইয়া বালিশে রাখিয়া শ্বশুর একটু সরিয়া বসিল।

কিন্তু সুবিধা হইল না। দড়ির খাটিয়ার চতুঃসীমা উঁচু, মাঝখানটা ঝোলা। পার্ব্বতীর অস্বস্তি বোধ হইল। মাথাটা তুলিয়া সভয়ে পিছন দিকে চাহিল,—না ভূত প্রেত কেউ সেখানে নাই। সাহসে ভর দিয়া নিজের বিছানায় সরিয়া গেল। চুপি চুপি অনুরোধ করিল, "একটু সরে এস। আমি শুধু তোমার পা'টা ছুঁয়ে থাকব।"

খগুরের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা কথা ভাবিতেছিল, পার্ব্বতীর অনুরোধ শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ত্যাখো, বদ্ অভ্যাসগুলি ছাড়। প্রথম জীবনে সে,—আমার সে স্ত্রীর কথা বলছি—ভয়ানক লাজুক ছিল। সেই অবস্থায় তার প্রথম ছেলে হয়। ছেলেও কি ঠিক তেমি মুখচোরা লাজুক! যখন দু'বছরের ছেলে, কি দুষ্টুমি করার জন্যে একদিন একটা চড় মেরেছিলাম। খুব লেগেছিল তার, কিন্তু আমার সামনে কাঁদলে না। ঘাড় হেঁট করে গুম্ হয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে উঠে গেল। তার মা রান্নাঘরে কাজ করছিল, সেখানে গিয়ে তার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেল্লে! পরে আদর করে ভুলিয়ে ভালিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম "আমার সামনে কাঁদলি না কেন?"—বল্লে "লজ্জা করে।"—মানে, তার মাতৃ-প্রকৃতিগত বিশেষত্ব তাতে বর্ত্তেছিল। ছেলে-মারার জন্যে আমার মা বকলে আমায়।—আর আমি আড়ালে বকলুম তার মাকে। বললুম, "তোমার দোষে আমার ছেলে এত লাজুক মুখচোরা স্বভাবের হয়েছে। ব্যাটা ছেলে, জীবনে লড়তে হবে। অত লাজুক অপদার্থ হলে ত চলবে না। ছেলের স্বভাব শোধরাও।"

"সে কি বল্লে?"

"হাসলে।

"বকুনি খেলে সে রাগ করত না?"

"তোমার মত তিরিক্ষে-মেজাজী সে ছিল না।···বাস্তবিক বলছি, তোমার বিশ্রী মেজাজের জন্য আমার আতঙ্ক হয়। যতদিন না তোমার মেজাজ বদলায়, ঈশ্বর করুন যেন"—বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া অপ্রসন্ন চিন্তাকুল মুখে খন্তর নিজের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

তাহার অসমাপ্ত কথার অর্থ পার্ব্বতী বুঝিল। বোধ হয় একটু কুণ্ঠিত হইল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে হাত বাড়াইয়া খন্তরের পা ছুঁইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "গল্পটা বল।"

"উল্লুককে গল্প বলে কি হবে? আক্কেল ত হবে না। উহুঁ, পা নয়। আমার হাতটা ছুঁয়ে থাক। নেহাৎ অপদার্থ!"—নিজের ডান হাতটা পার্ব্বতীর হাতে রাখিয়া খন্তর বলিল, "কিন্তু ফের বাঁদরামো করেছ কি, আমি চম্পট দিয়েছি।··রাজার তখন বুড়া বয়স। উপভোগের সামর্থ্য নাই,—কিন্তু লালসার মদে মন মাতাল। উপায়? একালে আমরা যেমন টাকাকড়ি ধার নিই, সেকালে তেম্নি না-কি রূপ-যৌবন ধার নেওয়া চল্‌ত। কিন্তু ধার দেয় কে? সামনেই পাঁচ যোয়ান ছেলে। রাজা তখন সত্যিই ক্ষেপেছিলেন, নইলে ছেলেদের কাছে লজ্জা হোত—ঘৃণা হোত। তা নয়, ছেলেদের ধরলেন,—দাও ধার যৌবন। চার ছেলে বাপ্‌কা বেটা। সোজা হাঁকিয়ে দিলে—নেহি দেঙ্গা! ছোট ছেলে পুরু অতি ধার্ম্মিক। রূপ, যৌবন, ভোগ, উপভোগ কিছুতেই তার আসক্তি ছিল না। স্বচ্ছন্দে নিলে বাপের জরাভার—দিলে তাঁকে নিজের যৌবন।

খুশী হয়ে রাজা চল্‌লেন চৈত্ররথ বনে। সঙ্গে চল্‌ল বিশ্বাচী নামে এক আহাম্মক অপ্সরা। উদ্দেশ্য, দেখবেন—উপভোগ লালসার চরম সীমাটা কতদূর? হাঁ, একে ত আমাদের মত ক্ষীণপ্রাণ কলির জীব নন। তায় না আছে অন্নচিন্তা,—না আছে পরের চাকরি।"

হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া পার্ব্বতী খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিল। বলিল, "তুমি যদি সেই রাজা হতে?"

"তাহলে অপ্সরাটার মাথায় এক চাঁটি মেরে সদ্য স্বর্গে পাঠিয়ে দিতাম। তা'র পর ছেলেকে যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে রাজাগিরিতে ইস্তফা দান। এসে এই ইঞ্জিনের মিস্ত্রী হয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খাট্‌তাম। আর একটু ভগবানকে ভাবতাম। ব্যস্‌, বখামির নেশা আপনি উড়ে যেত।"

"আচ্ছা, আমি যদি সেই অপ্সরাটা হতুম?"

"তাহলে সেই রাজাটির সঙ্গে রাজযোটক মিল হোত।"

"যাঃ, অসভ্য কোথাকার! মিস্ত্রীটার সঙ্গে বলছি।"

"বনত না। অপ্সরার ঝক্কি পোয়াতে মিস্ত্রীটাও রাজি হোত না।"

"যদি রাজি হোত? কি কর্‌তুম বল্‌ দেখি?"

মাথা চুলকাইয়া ভাবিতে ভাবিতে খন্তর বলিল, "ঘুমের সময় জ্বালাতন কর্‌তে, কাযের সময় পথ আগ্‌লাতে। অন্য সময় ঝগড়া কর্‌তে, গায়ে পানের পিচ্‌ দিতে। আর যতগুলো বাদরামো জানো,—সময়-অসময়ে লীলাখেলা দেখাতে! মিস্ত্রীটা হতভম্ব হয়ে ভাবত,—এ কি জন্তু রে বাবা!"

পার্ব্বতী বালিশে মুখ গুঁজিয়া সকোপে বলিল, "যাও। বল তার পর?"

"পুরাণে বলে পাক্কা হাজার বছর রাজা বিস্তর বিস্তর বখামি কর্‌লেন। শেষে দেখলেন—অতৃপ্তি। ওই উল্লুকপণা নেশার চরম সীমা, চরম তৃপ্তি কিছুতে নাই। হতাশ হয়ে ফির্‌লেন। ছেলেকে যৌবন ফেরত দিলেন। নিজের জরা নিলেন, তা'পর বনে চললেন, আত্ম-সংশোধনের তপস্যা করতে। যাবার সময় বে-হুঁসিয়ার লোক-সমাজকে হুঁসিয়ারীর উপদেশ দিয়ে এক গান গেয়ে গেলেন। হাজার বছরের ঠেকে-শেখা অভিজ্ঞতা, তার দাম অনেক! গীতায়ও দেখি পুরাণের সেই শ্লোক।"

"তার মানে ?"

প্রশান্ত নির্ব্বিকার মুখে খন্তর বলিতে লাগিল, "রাজা গান করে গেলেন যে—'কাম্য বিষয়ের উপভোগ দ্বারা কামনা কখনো উপশম হয় না। ঘিয়ের আহুতি পেলে আগুন যেমন বাড়ে,—যত উপভোগ করা যায়, লালসার নেশাও তত বাড়ে। পৃথিবীতে যত ঐশ্বর্য্য আর যত স্ত্রীলোক আছে, সে সব—একজন লালসা-পরায়ণ মানুষের নেশা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।' বুঝলে ? লালসাটা এত বড় প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস !"

পার্ব্বতী নিস্পন্দ স্থির। খন্তর বলিতে লাগিল, "তাই ভুক্তভোগী রাজা শেষে গাইলেন 'এই অতি ঘৃণিত কলুষিত, ভয়ানক উন্মাদনাকর লালসায় মোহিত হওয়া মানুষের উচিত নয়। মানুষের প্রাণান্তকারী রোগস্বরূপ যে তৃষ্ণা,—সেই তৃষ্ণা যিনি ত্যাগ করেছেন, তিনিই মানসিক সুস্থতা পেয়েছেন। তাঁর অন্তরেই শান্তি প্রসন্নতা এসেছে। অতএব তৃষ্ণাক্ষয়রূপ সুখের কাছে সমস্ত স্বর্গীয় সুখও—তুচ্ছ।' বুঝলে ?"

বেদান্তের পাণ্ডিত্যলীলার আস্ফালন পল্লবগ্রাহী সমাজে। ভারতের অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সমাজে যথার্থই উহার সংক্ষিপ্তসার হৃদয়ঙ্গম করে এমন অনেক তথাকথিত মূর্খ আছে। বিবেকানন্দ স্বয়ং সাক্ষী। অন্যের সাক্ষ্য—বাহুল্য মাত্র।

আলস্যজড়িত স্বরে পার্ব্বতী বলিল, হুঁ, তার পর ?"

বাহু-অন্তরালে মুখ লুকাইয়া খন্তর পাশ ফিরিয়া শুইল। শ্রান্ত অবসন্ন কণ্ঠে বলিল, "ভাব তার পর, গল্পের মানেটা কি ? শিখ্‌লে কি ? ডাক ভগবানকে, প্রার্থনা কর আত্মার কল্যাণ। আমি ভয়ানক ক্লান্ত, এবার ঘুমুই। কাছে রইলাম, ভয় নাই।"

কয়েক মুহূর্ত্ত সমস্ত নিস্তব্ধ। গভীর অবসাদে খন্তরের দেহ ঝিমাইয়া আসিতেছিল। তন্দ্রাভারে চক্ষু জুড়িয়া আসিল।

সহসা তীক্ষ্ণকণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "আমার নারীজন্মের সাধ-আহ্লাদ কিছুই মিট্‌ল না। কিছু মিট্‌বেও না, নয় ?"

খন্তরের তন্দ্রা ভাঙিল। চাহিল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "জানি তোমার লক্ষ্য কোথা। কিন্তু আমার লক্ষ্য তার অনেক উপরে। সাধ মেটার কথা বলছ ? মলিন বাসনার গরল মনের মধ্যে যতই ফেণিয়ে তুল্‌বে, জ্বালা ততই বাড়্‌বে। শুন্‌লে ত রাজা যযাতির কথা। ইন্দ্রিয়ের শক্তি লোপ গেল, তবু ইন্দ্রিয়াসক্তির নেশা ছুট্‌ল না। অসংযত মন নিয়ে, ধারের কারবারে—হাজার বছরের অফুরন্ত উপভোগ চল্‌ল,—তবু না, তবু না। শেষে কবুল দিলেন সুখ শুধু, তৃষ্ণা ক্ষয়ে। উঃ, ক্লান্তিতে আমার মাথা ঘুর্‌ছে। ঘুমতে দাও, গোল কোর না এখন।"

ঝঙ্কার করিয়া পার্ব্বতী বলিল, "নাঃ, গোল করবে না। দেবে ঘুমতে ! তোমার মাথা ঘুরছে, তা আমার কি ? সাগা করেছিলে কেন বল ত ?"

পার্ব্বতী ঝাঁপাইয়া আসিয়া খন্তরের শয্যায় আশ্রয় লইল।

দপ্‌ করিয়া খন্তরের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল : মনে পড়িল সংযমনিষ্ঠাশীলা জননীর পুণ্যস্মৃতি !···মনে পড়িল সুবিবেচনাশীলা পত্নীর প্রেমের স্মৃতি !··· এই জঘন্য স্বার্থপরতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি অসংযত-প্রবৃত্তি নারী তাহাদের একজন ?—না, না, এ স্বতন্ত্র জাতীয় ঘৃণ্য জীব !—ইহাদের ধারণায় প্রেমের অর্থ···ধিক্ !

মুহূর্ত্তে খন্তর বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। সম্ভবতঃ উদ্গত ক্রোধ দমনের জন্য, নীরবে মেঝেয় পায়চারি করিতে লাগিল। পার্ব্বতীর দিকে চাহিল না।

এই নির্ব্বাক তিরস্কারে পার্ব্বতী থতমত খাইল। বিনাবাক্যে বিমর্ষ-মুখে আবার নিজের শয্যায় গিয়া, চোখ বুজিল। চাহিয়া থাকিতে সাহস হইল না। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিল।

চাপাগলায় ঘৃণার স্বরে খন্তর বলিল, "দেহমনের অসুস্থ অবস্থায় কতকগুলা ক্রূরকর্ম্মা চণ্ডাল সৃষ্টি করব, কিম্বা অসংযমের তাড়ায় চিররুগ্ন যক্ষ্মার আসামী সৃষ্টি করব,—এমন পাপানুষ্ঠানের সখ্ মেটাবার জন্যে সাগা করি নি। এই আমার কৈফিয়ৎ! বাপমার অত্যাচারের দণ্ড পড়ে,—নিরপরাধ সন্তানের শিরে। সাধ আহ্লাদের লোভে কাদের অকল্যাণ চাইছ ··উঃ!"

অব্যক্ত আর্ত্তধ্বনি করিয়া সে থামিল। ঘাড় হেঁট করিয়া আবার পায়চারি করিতে লাগিল। পার্ব্বতী নিঝুম স্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে খাটিয়া তুলিয়া খন্তর ঘরের অন্য পাশে রাখিল। মশারি ফেলিয়া শুইল। কথা কহিল না।

পার্ব্বতী জ্বালা-ভরা দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া আবার চোখ বুজিল। ভূতের ভয়ের অজুহাতে আর কোন উপদ্রব করিল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া বাধ্য হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

খন্তর আর ঘুমাইতে পারিল না। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মনে মনে বার বার নিজের সংসার-বাসনাকে ধিক্কার দিল, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল। মনে হইল পার্ব্বতী বেশ জীবন কাটাইতেছিল। খন্তরের সংস্রবে আসিয়াই উহার মন উচ্ছৃঙ্খল বাসনা-তৃষ্ণার উন্মাদনায় এমন অসুস্থ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। উহার মনের এই উদ্ধত একগুঁয়ে কলুষিত অবস্থা যদি না সারে, তবে সে পৃথিবীতে আনিবে কাহাদের? কুৎসিত লালসা-পীড়িত গোটা কতক ক্ষিপ্ত পশু মাত্র? হে নারায়ণ, তাই যদি হয়, তবে যেন ভূমিষ্ঠ হইবার আগেই তাহারা মরিয়া যায়। অসৎ সন্তানের জনক হইতে সে চায় না।

মাথা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ভোরের ম্লান আলো ফুটিতেই নিঃশব্দে বাহিরে আসিল। স্নান করিয়া আসিয়া পাশের ঘরে পূজাহ্নিক করিতে বসিল।

অনেকক্ষণ পরে পার্ব্বতী ও বিশুয়ার মার সাড়া পাওয়া গেল। বুঝিল তাহারা জাগিয়াছে। কায আরম্ভ করিয়াছে।

পূজা শেষ করিয়া আসনটা গুটাইয়া মাথায় দিয়া খন্তর সেইখানে শুইল। গভীর অবসাদে শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

২৫

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙিল। অনুভব করিল নিকটে বসিয়া কেহ বাতাস করিতেছে, কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতেছে।

চোখ মেলিয়া জড়তা আবেশে একবারে চাহিল হাঁ, পার্ব্বতী। আবার চোখ বুজিল।

নিদ্রাবেশে মনের উষ্ণ জ্বালা তখন শান্ত। মগজের সতর্ক বিচার-বোধ অচেতন। অন্তরের এই পরম দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে পার্ব্বতীকে এত কাছে আসিয়া সযত্ন শুশ্রূষারত দেখিয়া, খন্তরের মন নিমেষে কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল-অভিভূত হইয়া পড়িল। মনে হইল—যতই হউক, তাহার শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্বন্ধে এতখানি আন্তরিক দরদ আর কাহারও নাই। হউক অল্পবুদ্ধি, হউক ধৃষ্ট-প্রগল্ভ, তবু উহার অন্তরটা নিঃস্বার্থ প্রীতিতে ভরা! স্বার্থবুদ্ধির এতটুকু বালাই উহার কোনখানে নাই। মান অভিমানের ছলনা পর্য্যন্ত এই নির্ব্বোধ বেচারী জানে না। বড় ভাল, বড় সাদাসিধা মানুষ!

হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে মাতিয়া মানুষ যখন কাহাকেও বিচার করিতে বসে, তখন ভুলিয়া যায় মত্ততার আবেশে তাহার চোখ রঙীন, মন প্রমত্ত। সে বিচারের অঙ্কে, প্রশান্ত সত্যানুভূতির স্থান নাই।

পার্ব্বতীর শক্ত কাযে খাটা, কঠিন করতল নিজের কপালে চাপিয়া

ধরিয়া খন্তর চোখ বুজিয়া তৃপ্তির সহিত বলিল, "আঃ, কি ঠাণ্ডা! ক'টা বেজেছে?"

অস্পষ্ট স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "এগারটা।"

খন্তর বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিল। তাই ত, বাহিরে উৎকট রৌদ্রালোক ঝলসিতেছে! এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়াছে!

চট্ করিয়া উঠিয়া বসিল, অতৃপ্ত নিদ্রাঘোরে মাথা ঘুরিয়া উঠিল। দু'হাতে কপাল চাপিয়া, চক্ষু বুজিয়া ক্ষণকাল নীরব রহিল। একটু সামলাইয়া বলিল, "মাথা ঘুরছে। আরও ঘুম দরকার।—বিশুয়ার মা হাট বাজার করে দিয়ে গেছে?"

জলখাবারের পাত্র সামনে ধরিয়া দিয়া, পার্ব্বতী বিষাদ ম্লানমুখে বলিল, "গেছে। কিন্তু আটা আনানো হয় নি। জল খেয়ে আটার দাম দিও।"

চোখ বুজিয়া খন্তর বলিল, "দাম? পকেটে টাকা ছিল, নাও নি কেন?"

মৃদু স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "সাহস হয় নি।"

একটু হাসিয়া খন্তর বলিল, "কিন্তু অন্য দিকে দুঃসাহস ত খুব।"

বলিতে বলিতে পার্ব্বতীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িল, সহসা স্তব্ধ হইল। বড় বিষাদক্লিষ্ট, বড় সকরুণ সে মুখ!

মন ব্যথিত হইল। ইচ্ছা হইল যা হয় হইবে, নির্ব্বিচারে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা চায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা হইল গত ব্যাপারের আলোচনায় পার্ব্বতী যদি ধৈর্য্য হারায়! যদি কান্নাকাটি আরম্ভ করে!

নিজের উপর রাগ হইল,—অত্যন্ত রূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছে! কাযটা ভাল হয় নাই।

পার্ব্বতী বলিল, "জল খাও।"

"তুমি খেয়েছ?"

"হুঁ।"

অধোবদনে খন্তর বলিতে লাগিল, "তোমার মুখ শুকিয়ে রয়েছে। রাত্রে ভাল ঘুমোও নি, সকাল সকাল খেয়ে খানিক ঘুমিও। বাড়ীতে গিন্নি-বান্নি কেউ নেই। নিজের যত্নটুকু নিজে কোর। স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে চল।"

পার্ব্বতী নিরুত্তরে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল।

সরবৎ খাইয়া গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া খন্তর ক্ষুব্ধ ভাবে বলিল, "আমার বড় খাটুনি পড়েছে। তায়—ভাল ঘুম হচ্ছে না, অল্পেই মাথা তেতে উঠছে। তুচ্ছ কারণে মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। তোমায় কি বল্‌তে কি বলে বসি, ঠিক করতে পারি না। কিছু মনে কোর না তুমি। এক কায কর, শোন।"

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

খাইতে খাইতে ম্লান হাস্যে খন্তর বলিল, "ঠাট্টা নয়। দিন কতক কথাবার্ত্তা বন্ধ কর। নেহাৎ জরুরি, যা না বল্‌লে নয় শুধু তাই বল। দু'জনের কারুর মেজাজ ভাল নাই। কেবল খিটিমিটি, এ তো ভাল নয়। ইচ্ছে হচ্ছে, তোমাকে ভৌজির কাছে পাঠিয়ে দিই, কিম্বা দিন কতকের জন্যে নিজে কোন দিকে ভেগে পড়ি। দু'জনের মনের গোলমাল থিতিয়ে ঠাণ্ডা হোক, তার পর দেখা শোনা হওয়াই ভাল।"

পার্ব্বতী নির্ব্বাক! শুধু আর্ত্ত করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে অনুযোগ হয়ত ছিল, হয়ত ছিল না। কিন্তু স্পষ্টভাবে ছিল অসহায় আশ্রয়-ভিক্ষার্থীর ব্যাকুল মিনতি! নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নতমুখে বলিল, "আটা এনে দাও, উনুন খাঁ খাঁ করে জ্বল্‌ছে।"

"দিচ্ছি দিচ্ছি—" অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া খন্তর শোবার ঘরে গেল। জামা পরিতে পরিতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে আটার ঠোঙা লইয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বাড়ী ফিরিল। দেখিল শনিচরের মা আসিয়াছেন, রান্নার চালায় বসিয়া পার্ব্বতীর সহিত কথা কহিতেছেন। খন্তর ব্যগ্রভাবে বলিল—"চাচি তুমি এসেছ? ভাল হয়েছে। একে খাইয়ে তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাও। আমাকে ডাক্‌তে এসেছে। কাযে চল্লুম, কখন ফিরব ঠিক নেই।"

ছুটিয়া ঘরে গিয়া জুতা ও পাগড়ি লইয়া সে আবার বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল।

পার্ব্বতী ফিস্ ফিস্ করিয়া বৃদ্ধাকে কি বলিল। বৃদ্ধা উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাচ্ছিস রে? টিশন?"

খন্তর ফিরিয়া দাঁড়াইল। মাথায় পাগড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে উৎসাহ প্রদীপ্ত মুখে বলিল, "হুঁ। জরুরী কায—ওভার টাইম দেবে।"

পার্ব্বতী ঘোমটার আড়াল হইতে ক্রুর-বিদ্বেষ-জ্বালাভরা দৃষ্টিতে খন্তরের উদ্যম-প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিল।—খন্তর যেন তাহার ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া নিজে কোন লোভনীয় আরাম উপভোগ করিতে চলিয়াছে, এমনি তাহার ভাবখানা!

চকিত কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া খন্তর ত্রস্তে বলিল, "যত দেরীই হোক, সন্ধ্যার আগে ফিরব। দুপুরে বড়বাবুর বাড়ীতে একবার বেড়াতে যেও।"

সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

পার্ব্বতী অসন্তোষ ভরে অস্ফুট স্বরে বৃদ্ধার উদ্দেশে কি বলিল। বৃদ্ধা সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ রে, তোর ত চব্বিশ ঘণ্টাই বাইরে কায। জিনিষ-পত্র কখন কি রইল না রইল, বহুকে

যে অসুবিধেয় পড়তে হয়। ওর হাতে কিছু করে খরচ দিস্ না কেন?”

“নিক না সব। বুঝে চালাতে পারলে ত বাঁচি।” পকেটে হাত পুরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া পয়সা টাকা যা ছিল শ্বশুর সমস্ত মুঠা ভর্ত্তি করিয়া বাহির করিল। খুচরা সিকি দুয়ানিগুলা বাছিয়া পুনশ্চ পকেটে ফেলিল। টাকা চারিটা বৃদ্ধার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, “দাও তোমার বহুকে। আস্‌ছে হপ্তা পর্য্যন্ত চালাতে বোল। তার আগে মাইনে পাব না।”

পার্ব্বতী অদ্ভুত জ্বালাভরা দৃষ্টিতে একবার শ্বশুরের দিকে চাহিল। সে তখন দীর্ঘ দ্রুত চরণে আঙিনা অতিক্রম করিয়া দুয়ারের দিকে চলিয়াছে। তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অপ্রসন্ন মুখে শ্লেষের সুরে বলিল, “চারটে টাকায় আট দশ দিন! আমি চালাতে পারব না। যে পারে চালাক।”

শ্বশুর প্রতিবাদ করিল না, করিলেন বৃদ্ধা। একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “বলিস্ কি বহু? আমাদের গরীবের ঘরে, দু’টো মানুষের খাওয়া,—আর কত চাই? অত দরাজ হাত করিস নি। দেখছিস ত বাছা, কত দুঃখের পয়সা! ওই দ্যাখ, না-খাওয়া না-দাওয়া খাট্‌তে চল্‌ল। কেন? পয়সার জন্যে ত।”

“খাটুনি নয়,—আমোদ! যাচ্ছে নিজে আমোদ করতে।—এখুনি বল্‌লে শরীর ভাল নেই, ঘুমুবে। এর মধ্যে সব ভাল হয়ে গেল! স্বচ্ছন্দে খাট্‌তে ছুট্‌ল!” বলিতে বলিতে পার্ব্বতী দেখিল শ্বশুর বাহিরে অদৃশ্য হইয়াছে। অগত্যা অপ্রসন্ন মুখে থামিল।

বৃদ্ধা সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, “খাটিয়ে মানুষরা তুচ্ছ অসুখকে গ্রাহ্য করে না। মনের জোরে উড়িয়ে দেয়। কুঁড়ে লোক হলে দেখতিস্—

এতটুকুকে এতখানি মনে করে বিছানায় পড়ে থাক্‌ত। যেমন আমার ছেলে। খন্তরা তো তেমন আয়েসী কুঁড়ে নয়। না নেশা ভাং, না বদ্‌খেয়াল,—অমন সোনার চাঁদ ছেলে পাড়ায় আর একটা নাই। খাবার কর তুই, আমি রঘুনাথকে তোর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি!”

রঘুনাথ—শনিচরের বড় ছেলে।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন।

টাকা কয়টার দিকে চাহিয়া চাহিয়া পার্ব্বতী কি ভাবিল। মুখ ভাব ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিল।···খন্তর স্বার্থপর, মহা স্বার্থপর! পার্ব্বতীর জন্য তাহার কিছু আগ্রহ নাই। ঔৎসুক্য নাই।. পার্ব্বতী তাহার কাছে পাইয়াছে কি? শুধু অনাদর, উপেক্ষা, প্রত্যাখ্যান!···

নিজের অসংযত মূঢ় কল্পনাকে ফেণাইয়া ফেণাইয়া পার্ব্বতী উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনায় খন্তরের সমস্ত তুচ্ছ ত্রুটিকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিতে লাগিল। যাহাদের ভাবিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা যখন ভাবিতে বসে, তখন ভাবনাটা অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়: পার্ব্বতীও অনেক ভাবনা ভাবিল। খন্তরের ধর্ম্মনিষ্ঠার দৃঢ়তা, কর্ম্মোৎসাহ তৎপরতার উপর নির্ম্মম আক্রোশ বোধ করিল।···ইহার উপর খন্তর তাহাকে আরও দূরে সরাইয়া দিতে চায়, উঃ কি নিষ্ঠুর, কি স্বার্থপর!

নিষ্ফল ক্ষোভে প্রতিহিংসার উত্তেজনা জাগিল। পার্ব্বতীর চোখে এক অদ্ভুত নৃশংস উত্তেজনার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল।

২৬

বেলা আড়াইটার সময় হইতে আকাশে গাঢ় মেঘ জমিয়া কাল-বৈশাখী ঝড় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। আকাশ বাতাস চমকাইয়া বজ্র বিদ্যুতের ভয়ানক খেলা চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। তবু ঝড় বৃষ্টি থামিল না, মেঘ কাটিল না। মাঝে মাঝে বৃষ্টি একটু কমে, আবার নবোদ্যমে চাপিয়া আসে। আঁধার গাঢ় হইতে লাগিল, দুর্য্যোগ আরও বাড়িল।

সন্ধ্যার পরে, খন্তর আসিয়া ডাক দিল। পার্ব্বতী ছুটিয়া গিয়া দুয়ার খুলিল। আপাদমস্তক বৃষ্টিস্নাত অবস্থায় খন্তর ভিতরে ঢুকিল। দুয়ারে হুড়্কা আঁটিয়া দু'জনে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া দাওয়ায় উঠিল। চালার নীচে দাঁড়াইয়া ভিজা জামা কাপড় নিঙ্ড়াইয়া গায়ের জল মুছিতে মুছিতে খন্তর বলিল, "বড়বাবুর বাড়ী, শনিচরের বাড়ী, সব যায়গায় তোমার খোঁজ করে এলুম। আজ কোথাও যাও নি কেন বল ত? একাটি বসে বসে কেন মন খারাপ কর? জল ঝড়ের সময় ওদের কাছে গিয়ে থাকলেই ত হোত।"

পার্ব্বতী জবাব দিল না। অস্বাভাবিক উগ্র দৃষ্টিতে একবার চাহিল। দ্রুত ঘরে ঢুকিল।

বোঝা গেল নিতান্ত ক্রুদ্ধ অবস্থা। কারণানুসন্ধান-চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। নিজেরও মন মস্তিষ্ক খুব শীতল অবস্থায় নাই। বেলা তিনটার সময় ছুটি হইয়াছিল। দুর্য্যোগ মাথায় করিয়াই ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী আসিতেছিল। মাঝপথে কাণে গেল—এক বিভ্রাটের সংবাদ। নিকটস্থ কুলি বস্তির জনকতক মেয়ে ঝড়ের সময় একটা বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল।

আচম্বিতে কয়জন দুর্ব্বৃত্ত আসিয়া, তাহাদের মধ্যে একটা পনের ষোল বছরের মেয়েকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে !···রহিল পার্ব্বতীর চিন্তা, রহিল নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তির কথা !···উত্তেজিত খন্তর একটা লাঠি চাহিয়া লইয়া, কুলির দলের সঙ্গে অপহৃতার উদ্ধার সাধনে ছুটিল।

অসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিশ কর্ম্মচারী সর্ব্বত্র সুলভ নয়। দেশের সাধারণ পুলিশের দায়িত্বজ্ঞান ও তদন্ততৎপরতা এ সব ক্ষেত্রে কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা দেশবাসী ভালই জানে। বিশেষতঃ যাহাদের ধন নাই, তাহাদের মান প্রাণের মূল্য পুলিশের কাছে নিতান্ত তাচ্ছীল্যের বিষয়। অতএব অবস্থার দায়ে পড়িয়া কঠিন পরিশ্রমে আত্মরক্ষার চর্চ্চা ইহাদের রাখিতে হয়। থিয়েটার, বায়স্কোপ, কেশ, বেশ, কাব্যবিলাসী অলস অপটু বাঙালীর সন্তান, কাব্যিকছন্দের শোভা বজায় রাখিবার জন্য যেখানে চোখের সামনে নারীহরণ দেখিয়া নিরীহ নির্ব্বিকার থাকে, ইহারা সেখানে ক্ষাত্রবিক্রমে অত্যাচারীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। সুতরাং একান্ত নির্ব্বিঘ্নে অত্যাচার চালানো ইহাদের দেশে তত সুবিধার বিষয় নয়, অত্যাচারীরা জানে। শাস্তির ভয়ে অনেকে সংযত থাকে। তবু যদি কেহ একান্ত অসংযত হইয়া উঠে, মাতৃজাতির সম্মাননাশে উদ্যত হয়, তবে অন্ততঃ একশোখানা লাঠি তাহার মাথার উপর ভাঙিবার জন্য অনেকে প্রস্তুত আছে,—এ কাণ্ডজ্ঞানটা স্মরণ রাখিতে হয়। পুলিশের নিশ্চিন্ত গুম্ফ মর্দ্দন, বিচারালয়ের দুর্ব্বল শাসননীতি, জেলখানায় জীবন যাপন,—যাহারা মোটে গ্রাহ্য করে না, সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির লগুড়াঘাতকে তাহারা ভয় করে।

অতএব বালিকাটির উপর নির্ব্বিঘ্নে অত্যাচার করিবার সুযোগ তাহারা পায় নাই। বেশীদূর পলাইতেও পারে নাই। অবিলম্বে সকলে ধরা পড়িল। রাগের মাথায় কুলির দলের সঙ্গে খন্তর তাহাদের উত্তমরূপে

প্রহার দান করে। তার পর আসামী ও ফরিয়াদীপক্ষকে থানায় পাঠাইয়া এই মাত্র ফিরিতেছে। নিজেও সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত থাকিয়া আসামীদের কড়া সাজার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুলিশের হাই তুলিতে, গা ভাঙিতে, গদাই লস্করী চালে এজাহার লইতে হয়ত আজ সারারাত কাটিবে। গরীবের ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ত তাহারা মানে না। কাযেই আর অগ্রসর হয় নাই।

সুতরাং আকস্মিক ক্রোধোত্তেজনার আলোড়নে মস্তিষ্ক বিপর্য্যস্ত ছিল। তার উপর পার্ব্বতীর এই অবস্থা। খন্তরের ভয় হইল—এবার ধৈর্য্য রাখিতে পারিলে হয়।

কাপড় বদলাইয়া ঘরে ঢুকিল। দেখিল পার্ব্বতী নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে।

পকেটের বিঁড়ি দেশলাই ভিজিয়া গিয়াছিল। লণ্ঠনের মাথায় সেগুলা সেঁকিতে দিল। কি একটু ভাবিল। পার্ব্বতী অসময়ে কেন শুইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া সোজাসুজি বলিল, "ওঠো। খেতে দাও।"

নীরস কঠিন সুরে পার্ব্বতী বলিল, "ওই ত খাবার ঢাকা রয়েছে—খাও।"—হাত বাড়াইয়া খাবার দেখাইল। ঘরেই আনিয়া রাখিয়াছিল।

"তুমিও এস। এক সঙ্গে বসা যাক।"

"ক্ষিদে নেই এখন। আমি অবেলায় খেয়েছিলাম।"

"তাহলে হোক একটু। এক সঙ্গে খাওয়া যাবে।"

খন্তর উঠিয়া গিয়া তাহার পাশে বসিল। পার্ব্বতীর হাত ধরিয়া সহাস্যে বলিল, "সারাদিন বাড়ীতে বসে কি করছিলে বল? আমার উপর রাগ? তাই রাগের চোটে সময়ে খাও নি?"

প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনা দমনের জন্য পার্ব্বতী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া

ধরিল। হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্য দিকে ঘুরিয়া শুইল। কঠিন সংযত স্বরে বলিল, "জ্বালাতন কোর না। শরীর খারাপ। আগে খাও।"

"বসে খাওয়াবে চল।"

"বুকটা ধড়্ফড়্ করছে। জিরোতে দাও।"

"কেন বল ত? ভয় পেয়েছ? বড্ড মন খারাপ হয়ে আছে? কান্না কাটি করেছ?"—খন্তরের স্বর অত্যন্ত স্নেহ-কোমল।

"না—" সংক্ষিপ্ত কঠিন উত্তর। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রুষ্ট স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "না খাও, খাবারগুলা ফেলে দাও। শোও গে। সারাদিন খাবার আগ্‌লে বসে আছি, আর পারি না।"

অর্থাৎ রাগটা আপাততঃ, না খাওয়ার জন্য! থাক! আর ত্যক্ত করা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি আসিয়া খন্তর খাইতে বসিল। পার্ব্বতী সন্তুষ্ট হউক।

কুলি বস্তির উত্তেজনাকর ব্যাপারটা স্মৃতিপটে জাগিতেছিল। লাঠালাঠি, মারপিট,—সেগুলা চিত্তকে তত আলোড়িত করে নাই। কিন্তু হৃদয় অভিভূত হইয়াছিল মেয়েটির ভয়-কাতর অবস্থা দেখিয়া! আহা বেচারা ক্ষুদ্র দুর্ব্বল প্রাণী!···যখন উদ্ধার করিয়া নিজেদের মধ্যে তাহাকে আনিল, তখন দেখিয়াছিল আতঙ্কের উত্তেজনায় সে কি ভয়ানক কাঁপিতেছে! মুখে কথা বাহির হইতেছে না! এ-হেন দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার! রাগের উত্তেজনায় মগজ যেন ফাটিয়া গেল! ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় দুর্ব্বৃত্তগুলাকে যা নির্দ্দয় প্রহার দিয়াছে, এমন নির্দ্দয় প্রহার বোধ হয় জীবনে কখন কাহাকে দেয় নাই।···সেরূপ সাংঘাতিক উত্তেজনাকর ঘটনাক্ষেত্রে মাথার ঠিক রাখা যায় না। নৃশংস অত্যাচারীদের নৃশংসভাবে হত্যা করিতেই ইচ্ছা হয়!

কিন্তু পার্ব্বতীকে এ সব জানিতে দেওয়া হইবে না। বেচারী একা বাড়ীতে থাকে। তাতে যে ভীরু!

খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার বুক ধড়ফড়ানি থাম্‌ল ?"

পার্ব্বতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কঠিন দৃষ্টিতে মট্‌কার দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার ভিতরে একটা উগ্র চিন্তার আলোড়ন চলিতেছে, বেশ বোঝা গেল। প্রশ্নের উত্তর দিল না।

একটু কুণ্ঠিত হইয়া খন্তর সংশয় ভরে বলিল, "হঠাৎ ওখানে গিয়ে বসেছিলাম। আচম্‌কা তুমি ভয় পেয়েছিলে কি ? তাই বুক ধড়ফড় কর্‌ছিল কি ?"

নিরতিশয় অন্যমনস্কতার সহিত পার্ব্বতী উত্তর দিল, "হ্যাঁ—নাঃ। ও, কিছু না।"

"থেমেছে এখন ?"

"হুঁ।—" পার্ব্বতী আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

তাহাকে একটা কিছু কথার খেই ধরাইয়া দিবার জন্য খন্তর প্রসন্ন স্মিতমুখে বলিল, "মুখে যতই আস্ফালন কর, যতই বকাবকি কর,—মনে মনে আমাকে ভয় কর এখনো, নয় ? সত্যি কথা বল, আমার মাথাব দিব্যি রইল। ভয় কর, নয় ?"

পার্ব্বতী নিরুত্তর।

পরিহাসভরে খন্তর বলিল, "আর সাড়া দেবে না, তা জানি। নিজের দুর্ব্বলতা কেউ স্বীকার করে না, সবাই খুঁজ্‌তে চায় পরের দোষ। কাল ফোরম্যান্ করলে ভুল। বললুম 'ভুল হচ্ছে।' নেশায় তখন চোখ লাল। তেড়ে উঠ্‌ল, 'আমার চেয়ে তুমি বেশী জান ?' আচ্ছা বাবা, হাম্ বড়াই হও। আজ কায আঁটক্! তাই ডাক পড়েছিল। ভুলটা দেখিয়ে দিলুম, ঠিক করে দিলুম। খুশী হয়ে পিঠ চাপ্‌ড়ে বললে "মিস্ত্রি, হাত পা ক'খানা বাঁচিয়ে, টিকে থাক। আমরা তোমাকে অনেক উঁচুতে

উঠিয়ে দেব।” হাসলুম! মনে মনে বল্‌লুম, “কারুর অনুগ্রহ ঘুস চাই না। আশীর্ব্বাদ কর, যদি উঠ্‌তে পারি,—যেন নিজের ক্ষমতার জোরেই উঠি।”

পার্ব্বতী তাচ্ছীল্যভরে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। মনে হইল খন্তরের কর্ম্ম-জীবনের সাফল্য গৌরব সংবাদ তাহার কাছে একান্ত তুচ্ছ—অগ্রাহের ব্যাপার।

খন্তর মনে মনে একটু আহত হইল। মনে পড়িল পুরাতন প্রিয়জনদের কথা। হায় রে আজ যদি তাহারা থাকিত! কত ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে কত সংগ্রাম করিয়া, আজ সে এখানে পৌঁছিয়াছে, সে কথা দরদের সহিত স্মরণ করিত তাহারা! কি বুঝিবে এই নূতন মানুষটি তাহার দুঃখ? উহার কাছে সহানুভূতি আশা করাই ভুল!

সংবাদ পাইয়াছে, শীঘ্র বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। হাঁ, জয়পালকে আজই একখানা পত্র লিখিয়া সংবাদটা জানাইবে। সে আন্তরিক আনন্দিত হইবে।

তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া পার্ব্বতী বলিল, “রাতে কি আবার বেরুবে?”

“না। এবার ঘুমুব।”

চাপা গলায় পার্ব্বতী বলিল, “আর আমি যদি আজ মরে যাই?”

হাসিয়া খন্তর বলিল, “মাথায় কি ছিট্‌ আছে?”

অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া ক্রূর কণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, “হ্যাঁ আছে। আচ্ছা টের পাবে এর পর।”

হাসিয়া খন্তর বলিল, “মানে,—এবার ধর্‌লে নিজমূর্ত্তি! কর তর্জ্জন, আর সাড়া দিচ্ছি না।”

উঠিয়া আঁচাইয়া আসিল। বিঁড়ি ধরাইয়া, ঘরের মেঝেয় শতরঞ্জি

বিছাইয়া বসিল। ভাইকে পত্র লিখিতে লিখিতে হাই তুলিয়া বলিল, "ঘুম পাচ্ছে। ওঠো, খেয়ে শোও।"

পার্ব্বতী উঠিল। খাইল না। এ-বাক্স সে-বাক্স খুলিয়া কি সব খুট-খাট শব্দে রাখিল, ঢাকিল। খন্তর নিজমনে পত্র লিখিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিল না, সে কি করিতেছে।

পত্র শেষ করিয়া পার্ব্বতীর দিকে চাহিল। বলিল, "খেলে না?"

"না—" সাড়ে তিনটা টাকা ও বাক্সর চাবি শতরঞ্জির উপর ফেলিয়া দিয়া পার্ব্বতী অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে, এবার আমি নিশ্চিন্ত। নাও তোমার টাকা। আট আনা পয়সা আমি নিজের জন্যে খরচ করেছি। হ্যাঁ, তোমার আট আনা পয়সা আমি নিয়েছি,—মনে রেখ। সাগার সময় তোমরা যা গয়না দিয়েছিলে, এই বাক্সয় রইল। আমার নিজের গয়না ওই বাক্সে আছে। মিলিয়ে নিও সব।"

খন্তর দেখিল পার্ব্বতী সমস্ত গহনা খুলিয়াছে। হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "কেন? কি হোল তোমার?"

খাটের তলা হইতে একটা জীর্ণ পুরাতন লণ্ঠন বাহির করিয়া পার্ব্বতী জ্বালিতে বসিল। আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না।

খন্তর বলিল, "কোথাও যাচ্ছ না কি?"

উত্তর নাই।

পার্ব্বতীর অনুরাগ, বিরাগ, মান, অভিমানের আকস্মিক উচ্ছ্বাসের হেতু নির্ণয় করা দুষ্কর। এমন কিছু নিষ্ঠুর শাসনও করে নাই, যার জন্য এত রাগ হইতে পারে। ভাবিয়া পাইল না, পার্ব্বতী কিসের জন্য এরূপ করিতেছে।

খোলা গবাক্ষ-পথে দেখা গেল বৃষ্টি তখন বন্ধ। আকাশ ঘন-মেঘ-ব্যাপ্ত, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ হানিতেছে।

মাথা চুল্‌কাইয়া খন্তর পুনশ্চ বলিল, "কোথায় যাচ্ছ? বোনের বাড়ী?"

নতমুখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "না, পাশের ঘরে।"

"তা আলো জ্বাল্‌ছ কেন?"

"ওইখানে থাকব।"

"রাত্রে? একা? আজ ত বিশুয়ার মা আস্‌বে না।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত পার্ব্বতী বলিল, "শাসাচ্ছ কাকে? যে মর্‌তে চলেছে, সে কাউকে ভয় করে না!"

অর্থাৎ পার্ব্বতী মরিবার জন্য স্থির সঙ্কল্প!

খন্তরের মুখ গম্ভীর হইল। অচঞ্চল দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া রহিল।...এত অসংযত উত্তেজনা-প্রবণ প্রকৃতি!.. নিষ্ফল আক্রোশে আত্মহত্যার ভয় দেখাইয়া শাসায়! উচ্ছৃঙ্খল বাসনার ক্রীতদাস ইহারা,—দেহজ্ঞান-সর্ব্বস্ব জীব!—দেহের মমতা ইহারা অতিক্রম করিতে পারে না। মৃত্যু-চিন্তা ত ইহাদের পক্ষে আতঙ্ক-জনক ব্যাপার! বোঝা যাইতেছে পার্ব্বতীকেও সে আতঙ্কের উত্তেজনা যথেষ্ট অধিকার করিয়াছে, নচেৎ কথাটা ওভাবে বলিত না!

কিন্তু ক্রোধ ক্ষিপ্ততার মাত্রা যখন এতই চড়িয়াছে, তখন অসুস্থ-চিত্ত মানুষটিকে আগে সদয় ব্যবহারে সংযত করিবার চেষ্টাই উচিত।

পার্ব্বতী প্রস্থানোদ্যত হইল। খন্তর পলকমধ্যে উঠিয়া বিনাবাক্যে তাহার হাত ধরিল। লণ্ঠনটা কাড়িয়া লইয়া মাটীতে রাখিল। অনুভব করিল পার্ব্বতীর মাথার কাপড় রীতিমত ভিজা। মনে পড়িল সে ভিজিতে ভিজিতে গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিল।

যেন কিছুই হয় নাই, শুধু ভিজা কাপড়টা তখন একমাত্র সমস্যার বস্তু,

—এমনি ধীরভাবে বলিল, "ভিজে কাপড়ে রয়েছ? কাপড়টা আগে বদ্‌লাও, এস দেখি।"

সস্নেহে পার্ব্বতীকে ধরিয়া ফিরাইল।

"না—না"—পার্ব্বতী সহসা আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল! বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "ও-তো আমার গায়ে শুকুনো অভ্যাস আছে। ওতে কিছু হবে না, হবে না। ছাড়, - যাই। আমার মরাই ভাল, মরতে দাও। এতেও যখন তোমার মন পেলুম না, তখন—"

আর বলিতে পারিল না। অধীর বিহ্বল হইয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া, ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল।

"কর কি, কর কি—" বলিতে বলিতে ব্যস্ত-বিব্রত খস্তর বসিল। তাহার মাথা কোলে তুলিয়া লইল। চোখের জল মুছাইয়া বার বার তাহাকে থামাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে, বিপন্ন ভাবে কেবল বলিতে লাগিল, "থাম, থাম। আমায় বুঝ্‌তে দাও, কেন এসব কথা তোমার মনে ওঠে? কি অপরাধ করেছি?···স্ত্রী তুমি, ঘরের লক্ষ্মী। ভগবানের নামে শপথ করে তোমায় হাতে ধরে এনেছি। মন পাবে না কি? ·"

বেদনায় অন্তর টন্ টন্ করিতে লাগিল,—সমস্ত অনুভূতি একটা অসহ্য ব্যথায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। পার্ব্বতীর নির্ব্বুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি, হীন-বুদ্ধির দৌরাত্ম্য মনে রহিল না। শুধু তীব্র ক্লেশের সহিত মনে হইল—তাহার আচরণে পার্ব্বতী এত দুঃখ পাইয়াছে যে, আত্মঘাতিনী হইতে চায়! কি ভয়ানক কথা!

চট্ করিয়া মনে পড়িল কয় দিন পূর্ব্বে আর একটা ঘৃণ্য-প্রকৃতি নারী, অবৈধ সম্পর্কের দাবি করিতে আসিয়া হৃদয়াবেগের উত্তেজনায় মরিতে চাহিয়াছিল। নেশার অবসাদে তখন মাথার ঠিক ছিল না, কিন্তু মনের ঠিক ছিল। রুষ্ট হইয়া খস্তর তাহাকে মরিতে উপদেশ দিয়াছিল, এমন

কি স্বহস্তে হত্যা করিতেও আপত্তি নাই,—ঘটনাক্রমে তাও বুঝাইয়া দিয়াছিল।

কিন্তু পার্ব্বতী? এ যে তাহার পুত্র-শোকার্ত্তা পত্নীর প্রতিচ্ছবি! ইহার জন্য হৃদয় কি উদ্‌ভ্রান্তই না সেদিন হইয়াছিল! কি উন্মাদ আগ্রহেই না ইহাকে চাহিয়াছিল! ইহার শোক-ব্যথা মুছাইয়া দিবার জন্য, ইহাকে সুখী করিবার জন্য—সদুদ্দেশ্যে সসম্মানে গৃহে আনিয়াছিল! দুঃখ দিবার দুরভিসন্ধি ত ছিল না। এ কি হইল?

অভিভূত চিত্তে ক্ষণেক নির্ব্বাক থাকিয়া, সনিঃশ্বাসে বলিল, "ওঠো, কাপড় বদ্‌লাও। খাও আগে। তার পর কথা হবে।"

পার্ব্বতীকে তুলিয়া বসাইল। তাহার উচ্ছ্বাস আকুলতা তখন থামিয়াছে, আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল।

কিন্তু এ কি? আফিং'এর কটু গন্ধ আসে কোথা হইতে? হজমের গোলযোগের জন্য পার্ব্বতী মাঝে মাঝে আফিং ব্যবহার করে, শুনিয়াছে। এ গন্ধ,···আজ তবে কি···?

খন্তর শঙ্কিত হইয়া বলিল, "তুমি,—আচ্ছা কিছু খাও নি ত? আফিং টাফিং—"

চোখ মুছিতে মুছিতে পার্ব্বতী নীরবে মাথা নাড়িল,—'না।' সঙ্গে সঙ্গে আঁচলের খুঁটে গিঁট বাঁধা কি একটা পদার্থ, সন্তর্পণে মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

দৃশ্যটা খন্তরের দৃষ্টি এড়াইল না। নিমেষে পার্ব্বতীর মুঠা খুলিয়া ঝটাপটি করিয়া জিনিসটা উদ্ধার করিল!···শালপাতার টুকরা মোড়া একদলা আফিং! একটা মানুষ মরিবার পক্ষে যথেষ্ট!

ব্যস্ত উত্তেজিত হইয়া পার্ব্বতী বলিল, "দাও দাও। ও আমার ওষুদ। আজই আনিয়েছি।—তোমারি পয়সায়।"

ততোঽধিক উত্তেজিত হইয়া খস্তর বলিল, "তাই আট আনা সন্ধ্যায়! উঃ, তোমার মতলব এত .ভয়ানক! কাকে দিয়ে আনিয়েছ? আর কোথায় কি লুকিয়ে রেখেছ?"

পার্ব্বতী নীরবে চোখ মুছিতে লাগিল। প্রথমে কিছুই স্বীকার করিল না। অনেক পীড়াপীড়ির পর শেষে স্বীকার করিল অসুস্থতার অজুহাত জানাইয়া রঘুনাথকে দিয়া আট আনায় এই আফিং আনাইয়াছে। যেহেতু খস্তরের উপেক্ষা, ঘৃণা, অনাদরে তাহার মন ভাঙিয়া গিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিতেছে না। আজ দুপুর বেলাই মরিত, কিন্তু খস্তরের মুখখানা একবার না দেখিয়া মরিতে পারিবে না মনে হইল।···না খাইয়া কাযে গিয়াছে, বড় মন কেমন করিতেছিল। খস্তরের অবিবেচনার প্রতিশোধ লইবার জন্য যখন মরিতেছে, তখন সুবিবেচনা দেখাইয়া মরাই ভাল। খস্তরকে খাওয়াইয়া, নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে দিয়া, এবার পাশের ঘরে যাইত। নিঃশব্দে আফিং খাইয়া, নির্ব্বিঘ্নে মরিত!

বলিতে বলিতে পার্ব্বতী বিহ্বল বেদনায় আবার খুব কাঁদিল।

খস্তর স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। হৃদয় প্রবল আবেগে উদ্বেলিত হইতে লাগিল। উঃ, পার্ব্বতী যদি সত্যই আজ মরিয়া যাইত!···এমন শোচনীয় মৃত্যু! অসহ্য!

বিচারবুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া আসিল। পার্ব্বতীর প্রকৃতিটা বড় গোলমেলে ঠেকিতে লাগিল। এতখানি গভীর মমতাভরা হৃদয়, কিন্তু এ কি দুঃসহ জটিল দুর্ব্বুদ্ধি!—কেন উহার মস্তিষ্ক এমন অসহনীয় জ্বালাময়—কোপন প্রভাবে পূর্ণ!

দুঃখ হইল, ইঁহার মাঝে সে হারানো প্রেয়সীকে পাইতে চাহিয়াছিল? ভুল করিয়াছিল! পার্ব্বতী যা, তাই বলিয়াই তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে। সে যদি খস্তরের বাসনার অনুবর্ত্তনকারিণী না-ও হয়, তবু সহ্য

করিতে হইবে। নিজের ধৈর্য্যের মূল্যে তাহাকে জীবনের সুখ-শান্তি কিনিতে হইবে। পার্ব্বতীর প্রতি বিন্দুমাত্র অবহেলা ত্রুটি দেখাইলে আর রক্ষা নাই!

পার্ব্বতীকে বুকে টানিয়া লইয়া, সযত্নে চক্ষু মুছাইয়া দিল। রুদ্ধস্বরে বলিল, "আমার যা বলবার আছে, পরে বল্‌ছি। তুমি আগে কাপড় বদলাও, খাও।"

পার্ব্বতী জানাইল তাহার অন্য শাড়ীখানা শুকায় নাই। বাহিরে আর শাড়ী নাই, সব বাক্সে আছে।

খন্তর চাবি চাহিয়া লইল। বাক্স খুলিয়া, বাছিয়া বাছিয়া একখানা বাসন্তী রঙের শাড়ী বাহির করিল। খুঁজিয়া পাতিয়া পার্ব্বতীর গহনাগুলা আনিল। বলিল, "পর সবগুলো।"

"কি হবে পোরে? তুমি ত চেয়ে দেখ না।" পার্ব্বতী আবার অশ্রু-দমনের জন্য দু' হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

খন্তর তাহাকে থামাইল। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল, "মেয়েদের গয়না কাপড়ের বাহার, বা বাইরের রূপ, সহজেই মানুষের চোখে ধাঁধা লাগায়। কিন্তু সে ধাঁধার ঘোর আমার কাছে বেশীক্ষণ টেকে না। আমি দেখতে চাই মানুষের অন্তরের শক্তি, সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা। পার্ব্বতী, আমাকে ভুল বুঝো না।"

বাহিরে গিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিতে দিতে ধরা গলায় বলিল, "কাপড় বদলে খেতে বস। আমি ও-ঘরে কুলুপ বন্ধ করে আস্‌ছি।"

একটু পরে খন্তর ঘরে ঢুকিল। দেখিল রঙীন কাপড়খানা পরিয়া পার্ব্বতী মেঝেয় শতরঞ্জির উপর মুড়ি-সুড়ি দিয়া শুইয়াছে। গহনা পরে নাই, খাওয়া ত নয়-ই। বলিল, "গয়নাগুলো পরলে না? কই সেগুলো?"

পার্ব্বতী হাত বাড়াইয়া শঙ্করের শয্যা দেখাইল। দেখা গেল বিছানার উপর সেগুলা বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্রুদ্ধ হস্তে ছোঁড়া হইয়াছে, সন্দেহ নাই!

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ওরা কি আমার বিছানায় ঘুমুতে গেল?"

"সখ্ হয়েছে, নিজে পরো।"—গম্ভীর আদেশ!

গহনাগুলা তুলিয়া আনিয়া শঙ্কর পার্ব্বতীকে পরাইতে বসিল। পার্ব্বতী প্রথমে মৃদুমন্দ আপত্তি করিল, একটু ঠেলাঠেলি করিল। তার পর নীরব গম্ভীর হইয়া অনভ্যস্ত শঙ্করের ত্রুটি সংশোধন করিয়া, নিজেই ঠিকঠাক করিয়া পরিল। তার পর আবার মুড়ি দিয়া শুইল।

শঙ্কর বুঝিল মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের উত্তেজনায় সে এবার অবসাদ-শ্রান্তি বোধ করিতেছে। এখন উহাকে নীরবে বিশ্রাম করিতে দেওয়াই ভাল।

কথা বলাইবার জন্য বা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। নীরবে খানিকক্ষণ মাথায় হাত বুলাইয়া দিল।

পার্ব্বতী বোধ হয় কিঞ্চিৎ সদয় হইল। ডান হাতটা বাড়াইয়া দিয়া, গম্ভীর ভাবে বলিল, "এই হাতটা বড় কন্‌কন্ করছে, একটু জল দাও ত।"

কৌতুকস্মিত মুখে নীরবে শঙ্কর আদেশ পালন করিল। তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্ব্বতীর পায়ের কাছে গিয়া বসিল। নীরবে মৃদু মৃদু হাসিয়া পদসেবা আরম্ভ করিল।

পার্ব্বতী বাধা দিল না, আপত্তি করিল না। তন্দ্রাবিষ্ট ভাবে কিছুক্ষণ গভীর আরামে সেবাসুখ উপভোগ করিয়া, আবেশজড়িত স্বরে বলিল "যাও না, শোও গে।"

"তুমিও চল। খেয়ে নাও।"

"আজ আমার খাবার দরকার নাই।"

"কিন্তু আমার দরকার আছে। খাবে চল।"

"আফিংটা কোথা লুকুলে? দাও না।"

"কাল পাঁচজনের সামনে—পুলিশের হাতে দেব।"

খন্তরের মত ধৈর্য্যশীল, ক্ষমাশীল, সংযত-স্বভাব স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর মূঢ়তার কাহিনী পাঁচজনের দরবারে দাখিল করা অসম্ভব। সেটা এই কয় দিনে পার্ব্বতী স্পষ্ট বুঝিয়াছিল। বিশেষতঃ প্রথম স্বামীর সংস্রবে পুলিশ কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে, একটা অবজ্ঞাজনক কটু অভিজ্ঞতা মনোমধ্যে ছিল। সদর্পে বলিল, "বয়ে গেল! পুলিশ আমার কি করবে?"

নিরীহভাবে খন্তর বলিল, "ওদের বাতিক, কেউ নিজেকে খুন করতে চাইলে ধরে সাজা দেয়। খাবে চল এখন।"

সস্নেহ অনুরাগ ভরে পার্ব্বতীকে ধরিয়া তুলিল।

সে স্পর্শ পার্ব্বতীর আপাদমস্তকে অনির্ব্বচনীয় পুলকের চমক হানিল। হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া, সকোপে তর্জ্জন করিয়া বলিল, "নাঃ, খাবে না ত কি উপোস করে থাকবার জন্যে তোমার ঘরে এসেছি? এত বোকা আমায় পাও নি। তোমার মত অমন ক্ষিদে সহ্য করে থাকা আমার পোষায় না।"

খন্তর মনে মনে বলিল, 'তোমার মত দেহজ্ঞানসর্ব্বস্ব মানুষ, ক্ষুধা তৃষ্ণা তন্দ্রা নিদ্রার উপর আধিপত্য করিতে পারে না। পারিলে, অসংযত মনের উপরও তোমার কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব লাভ ঘটিত।'—মুখে কিছু বলিল না, মৃদু হাসিল মাত্র।

হাত বাড়াইয়া খন্তরের পা দু'টা ঠুক্‌রাইয়া, চক্ষের নিমেষে একটা সংক্ষিপ্ত প্রণাম সারিয়া, পার্ব্বতী শাসনভরা অভিমানের সুরে বলি

"কিন্তু পায়ে না ধর্‌লে আজ খেতুম না। তা মনে রেখ। আমাকে এমন পাও নি।"

কি বিরাট মহিমা! খন্তর মৃদু হাসিয়া বিঁড়ি ধরাইতে মনোনিবেশ করিল। পার্ব্বতী খাইতে বসিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ও বেলা যখন না খেয়ে গেলে, এমন রাগ ধরেছিল! ইচ্ছে হোল, মাথা খুঁড়ে মরি।"

"কি মুস্কিল। পরের চাকরি আমার—"

"সারাদিন উপোস করে?"

"পুরুষ মানুষ আমরা, বাইরে খেটে বেড়াই। পকেটে পয়সা থাকলে খাওয়ার ভাবনা? দু গ্লাস ঘোলের সরবৎ খেলুম। টাট্‌কা খাবার দোকানে ছিল, ইচ্ছে কর্‌লে খেতে পারতুম। কিন্তু অনেক বেলায় জল খেয়েছিলাম, আর ক্ষিদে ছিল না। খাও তুমি, পরে কথা হবে।"

পার্ব্বতী রন্ধনের গুণাগুণ বিচারের সম্বন্ধে দু-একটা কথা পাড়িল। খন্তর ধূমপান করিতে করিতে সব কথায় সায় দিল।

খাওয়া শেষ হইল। মুখ হাত ধুইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া পার্ব্বতী দেখিল খন্তর তাহার তক্তপোষে গিয়া শুইয়াছে। চোখ বুজিয়া গম্ভীর মুখে কি ভাবিতেছে।

বলিল, "মুখ গোম্‌ড়া করে এখানে কেন?"

"মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে, একটু ভগবানের নাম স্মরণ করছি। বসো"—পার্ব্বতীকে টানিয়া খন্তর নিকটে বসাইল। নম্র স্মিত মুখে বলিল, "আচ্ছা তুমি আমাকে সত্যি ভালবাস?"

পার্ব্বতী গর্জ্জিয়া উঠিল, "ন্না—একটুও না! বেইমান কোথাকার!"

সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া খন্তরের বুকে লুটাইয়া পড়িল। আত্মবিস্মৃত হইয়া বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "এক বছর ধরে আমার মন ক্ষ্যাপা

কুকুরের মত তোমার পায়ের চিহ্ন খুঁজে খুঁজে ফির্ছে। তোমাকে ভুলে যাবার জন্যে কত ঠাকুরের দুয়ারে মাথা ঠুকেছি, তবু ভুল্‌তে পারি নি। আবার মনের ভুলে বলে ফেলেছি 'হে ঠাকুর দু'দিনের জন্যেও যেন সে আমার স্বামী হয়। আমি যেন তার স্ত্রী হয়ে দু'দিনের জন্যে আশা মিটিয়ে তার সেবা যত্ন কর্‌তে পাই, ভোগ কর্‌তে পাই।"

শঙ্কর অন্তরে অন্তরে চমকিত হইল! নারায়ণ নারায়ণ! পার্ব্বতীর এই প্রাণাকুল প্রার্থনাই কি তাহাকে আছড়াইয়া নীচে ফেলিয়াছিল? তাই কি তাহার নিষ্কাম সাধন বাঞ্ছা, অলক্ষিতে গ্লানি-পঙ্কিল হইয়া গিয়াছিল? হায় রে, উহার তীব্র আকর্ষণ প্রতিরোধ করিবার মত, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, অটুট চিত্ত-বল যদি তাহার থাকিত!

পার্ব্বতীর মাথায় দু-হাত রাখিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া শঙ্কর বিমনা হইল। পার্ব্বতী তাহার দীর্ঘকাল সঞ্চিত মানসিক ব্যাকুলতা, ব্যর্থ-বেদনার হা-হুতাশ সম্বন্ধে মত্ত উচ্ছ্বাসে অনর্গল বকিতে লাগিল।

শঙ্কর কেমন যেন আড়ষ্ট-শঙ্কিত হইয়া উঠিল। অস্বস্তিপীড়িত চিত্তে পার্ব্বতীর আবেগমত্ততা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সহিল। তার পর চোখ মুছাইয়া দিয়া, কোমল স্বরে অনুনয় করিয়া বলিল, "চুপ কর, মাথা ধরবে। এমন কেঁদে কেটে যদি অস্থির হও, আমি তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌ব না।"

পার্ব্বতী সহসা স্তব্ধ হইল।

কিছুক্ষণ দু'জনে নীরব।—উভয়ের উত্তেজিত হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন শব্দ উভয়ের কাণে পৌছিতে লাগিল।

দৃঢ় শক্তিতে চিত্ত স্থির করিয়া, খন্তর উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা-চাঞ্চল্য দমন করিল। পার্ব্বতী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা অধীর ভাবে বলিল, "তুমি যেন আমার জন্ম জন্মান্তরের দুষমণ্ ছিলে। দু-চক্ষে দেখ্‌তে পার না, তবু কেনই যে মরতে তোমায় ভালবেসেছিলাম, তাও জানি না। বিয়ের আগে আমাকে দেখ্‌লে অমন করে মুখ ফেরাতে কেন বল ত?"

তন্দ্রাবিষ্ট ভাবে ঈষৎ হাসিয়া খন্তর বলিল, "মতিচ্ছন্ন তখন ধরে নি বলে। কিন্তু আবার মগজে ঝগড়াব নেশা ঘনিয়ে আস্‌ছে, নয়? উগ্রচণ্ডা দেবি, এবার সংহারমূর্ত্তি ছাড়।"

উৎসুক হইয়া পার্ব্বতী বলিল, "আচ্ছা, গেল বছর যখন তোমার সঙ্গে সাগার কথা হয়েছিল, রাজি হও নি কেন বল ত?"

"ও বাবা! সে কৈফিয়ৎ আজ দিতে হবে?"

"হ্যাঁ। কি অহঙ্কারীই ছিলে তুমি! সটান্ চলে গেলে জামালপুর! উঃ, কি দুঃখই যে হয়েছিল আমার! শিবমন্দিরে বসে সেদিন পূজা করছিলে, খালি গা, সুন্দর চেহারা! বেশ দেখাচ্ছিল্। আমি না হয় একটু অবাক হয়ে দেখ্‌ছিলুম।—চোখাচোখি হতেই ঝট্ করে মুখ ফিরিয়ে উঠে ঠক্ ঠক্ করে চলে গেলে! মনে পড়ে জামালপুরে যাবার দিনের কথা?"

ভুলিবার কথা নয়।—কিন্তু স্মৃতির কোঠায় আজ উহা অনাবশ্যক আবর্জ্জনা। চাহিয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হয় না। একটু অন্যমনা হইয়া খন্তর বলিল, "খালি গায়ে যাওয়া আমার অন্যায় হয়েছিল। তুমি যে

শয়তানি মতলব নিয়ে ওখানে যাবে, তা কি জানি? আমার বাবা বারণ কর্‌তেন, শরীর গড়া হলে বাইরের মেয়েদের সামনে খালি গায়ে কখনো থেক না। সাহেবরা সভ্যতার খাতিরে সে-নিয়মটা বেশ পালন করে।”

পার্ব্বতী মহা কৌতূহলী হইয়া বলিল, “কেন, থালি গায়ে থাক্‌লে কি হয়?”

একটু ইতস্ততঃ করিয়া খন্তর বলিল, “দৈবাৎ কারুর কুদৃষ্টি পড়্‌লে দেহ মনের অনিষ্ট হয়।”

ভ্রূভঙ্গী করিয়া পার্ব্বতী বলিল, “আর পুরুষের কুদৃষ্টি? জানি জানি, তুমি নিজেও বড় সাধু!”

উত্তেজিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল। চটিয়া-মটিয়া বলিল, “এ-দিকে সাগা কর্‌বে না বলে হাঁকিয়ে দিলে! মা সঙ্কটাকে জানিয়ে এলুম, ‘যেন দর্প চূর্ণ হয়, সাগা ওকে কর্‌তেই হয়!’ দেশে এসেই দেখি, তুমি সামনে! গা কেঁপে উঠল! তার পর?···ওই মোড়ের মাথায়, সেদিন ভোর বেলার কথা, মনে পড়ে? নিজেই গিয়ে সাগার কথা তুল্‌লে। বেশ বুঝলাম এবার নিজেই লোভে পড়েছ!··কথা বল্‌লে ভাল মানুষের মত,—কিন্তু নেশার তোমার চোখ যেন মাতাল!···হঠাৎ নজর পড়তে ভয় পেয়ে গেলুম! ভাব্‌লুম কি রে বাপু? লোকটা ডাকাতি কর্‌বে না কি?”

হাঁ হাঁ স্মরণ আছে! মনের সেদিনকার সেই উচ্ছৃঙ্খল অবৈধ অসংযমকে—কোন গভীর রহস্যময় ‘অপরূপ প্রেমলীলা’ আখ্যা দিয়া আজ আত্মপ্রবঞ্চনা করিবে না। বেশ জানে, একদল লুব্ধ দস্যু সেদিন মনের ভিতর আচম্‌কা জাগিয়া মত্ত আবেগে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়াছিল। পরস্ত্রীর সম্বন্ধে সেরূপ মনোভাব আর যাহার রুচির পক্ষে মধুর রসোদ্দীপক নির্দ্দোষ ব্যাপার সাব্যস্ত হয় হউক, খন্তরের ধারণা অন্যরূপ। নিজেকে মার্জ্জনা

করিতে সে প্রস্তুত নয়। সেদিনের কথা মনে পড়িলে আজও লজ্জা বোধ হয়।

একটু ভাবিয়া খন্তর বলিল, "পাড়ার ছোঁড়াগুলা যদি তোমায় ত্যক্ত না করত, তুমি যদি কান্নাকাটি করে দেশ ছেড়ে না যেতে,—তাহলে হয়ত তোমার জন্যে কিচ্ছু দরদ বোধ কর্‌তাম না। স্ত্রীলোকের উপর বিশেষতঃ যে বেচারা অসহায়, আর নিরপরাধ—তার উপর অত্যাচারের কথা শুনলে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আগুন জ্বলে ওঠে! ওই সব খবর কাণে যাওয়ায় মনটা খারাপ হয়েছিল,—তোমার উপর একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। ভাবলাম, তোমার একটা মুরুব্বি দরকার, ঘটকালি করে একটা বর জুটিয়ে দিই।"

বিষম আপত্তির সহিত পার্ব্বতী বলিল, "তুমি যাকে তাকে বর জুটিয়ে দিলেই আমি খুশী? আহা—"

বাধা দিয়া খন্তর সবিদ্রূপে বলিল, "তবে কি? বিয়ের কনে ঘটকের গলায় মালা দেবার জন্যে বায়না কর্‌বে? এমন অন্যায় আব্‌দার্‌ত কখনো শুনি নি। কোথায় সঙ্কটা, কোথায় বিশ্বনাথ,—ওই সব দরখাস্ত করে বেড়াচ্ছ, আগে যদি টের পেতুম, আমিও পিছু নিতাম। তোমার সব বাহানা পণ্ড করে দিতাম! বলে আসতুম, খবর্দ্দার দেবদেবীর দল—শুনো না।"

চাহিয়া দেখিল পার্ব্বতীর মুখ অপ্রসন্ন গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। চকিতে খন্তর আত্মদমন করিল। সটান সোজা হইয়া শুইয়া পার্ব্বতীর কোলে মাথা রাখিল। দু-হাত বাড়াইয়া তাহার গ্রীবাদেশ শৃঙ্খলিত করিয়া সাদরে মুখখানা নিকটে টানিল। কৌতুকস্মিত মুখে বলিল, "সেদিন আমাকে ডাকাত ভেবে ভয় পেয়েছিলে, আজ ভয় কর?"

পলকে পার্ব্বতীর মুখ সলজ্জ অনুরাগের মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিল। বলিল, "না। তুমি ত মাতাল, গাঁজাখোর, বোম্বেটে, বদমেজাজি, গোঁয়ার-গোবিন্দ নও। কেন ভয় কর্‌ব? কিন্তু এবার যদি আমি মুণ্ডুটা দুম্ করে ফেলে দিই? বেহায়া কোথাকার! সেদিন পায়ে মাথা রেখেছিলাম বলে গ্যাঁক্ করে তেড়ে উঠেছিলে নয়? 'ভদ্র হওয়া চাই, পবিত্র মন হওয়া চাই' কি যে সব ফরমাস করলে!"

সকৌতুকে খন্তর বলিল, "খুনে হওয়া চাই, আফিং খাওয়া চাই, ফরমাস করেছিলাম?"

অনুতাপের স্বরে পার্ব্বতী বলিল, "কি করি? বড় মনে দুঃখ হয়েছিল। তুমি পায়ে ঠেল্‌লে কি সুখে বেঁচে থাকি?"

খন্তর হাসিল। বলিল, "ওই ত ভুল! কেবল সুখের লোভে বেঁচে থাক্‌তে চাও! আর সে সুখ চাও, পরের অনুগ্রহের কাছে! তাও নেহাৎ তুচ্ছ ক্ষুদ্র সুখ! সুখের কাঙাল যদি হতে হয়, বড় কিছু সুখের জন্য জিদ্ ধর।····· বাঁদ্‌রামি করে রাগের মাথায় আফিং খাওয়া কেন? সুখের লালসা তৃপ্ত হোল না বলে যারা নিজেকে খুন করে তারা ত নেহাৎ ক্ষুদ্রচেতা, অপদার্থ, আহাম্মক্।"

খন্তর অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বুঝাইল। পার্ব্বতী স্বীকার করিল সে ভুল বুঝিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়াছিল।

খন্তর অনেক মিষ্ট কথা বলিল, অনেক আদর করিল। অনেক তোষামোদের পর বলিল, "আমার গা ছুঁয়ে 'কিরিয়া' কর, আর কখনো এমন দুর্ব্বুদ্ধি কর্‌বে না।"

পার্ব্বতী তখন উল্লাসে বিভোর! ভাবিল খন্তরের মাথাটা এবার কিনিয়া ফেলিয়াছে! আহ্লাদে গদগদ হইয়া সদর্পে বলিল, "হ্যাঁ কর্‌ব। করলে এম্নি আদর পাওয়া যাবে, ভালবাসা পাওয়া যাবে। তুমি জব্দ হয়ে আমার মুঠোর মধ্যে থাক্‌বে!"

খন্তরের ঘৃণা বোধ হইল। বলিতে ইচ্ছা হইল, 'তুমি নিতান্ত অপদার্থ, মূঢ়-প্রকৃতির নারী! শঠতার জালে আমাকে বন্দী করিতে চাও? দুর্ব্বুদ্ধির উপদ্রবে আমার হৃদয় জয় করিতে চাও? প্রতারণার মূল্যে প্রেম কিনিতে চাও? তোমাকে ধিক্!'

হীনচেতা লুব্ধ-মানুষ, যোগ্যতার জোরে যাহা অধিকার করিতে পারে না, ফন্দি ফিকিরের কৌশলে তাহা আয়ত্ত করিতে চায়। খন্তরের প্রকৃতিগত উচ্চতার নাগাল ধরা পার্ব্বতীর পক্ষে যতই দুঃসাধ্য বোধ হইতেছিল, খন্তরকে জয় করিবার লুব্ধ কামনা তাহাকে ততই পীড়া দিতেছিল। নিজের মূর্খতা-সৃষ্ট কল্পনা বশে, খন্তরের চিত্ত সংযম-শক্তিকে অনুরাগহীনতা, প্রেমহীনতা ইত্যাদি ভাবিয়া নানা বিভীষিকার আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব খন্তরকে কিনিয়া ফেলিতে সে 'মোরিয়া' রূপে ব্যগ্র! কিন্তু মূল্য দিবে মাত্র—কানা কড়ি!

পার্ব্বতীর বুদ্ধির ওজন বোঝা গেল। ইহার কাছে সরল ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রবৃত্তি বা সাহস আর খন্তরের রহিল না,—অন্ততঃ আজ ত নয়-ই।

গোঁফে তা দিয়া হাসিমুখে বলিল, "আচ্ছা তাই হবে। মুঠোর মধ্যে কেন? এবার থেকে তোমার পায়ের কাদা হয়ে থাকব।"

ঘোরতর অবিশ্বাসের সহিত পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ বলিল, "ছাই থাক্‌বে! আজ দায়ে ঠেকেছ, তাই ভিজে বিড়ালটি সেজেছ। দায় উদ্ধার হলেই গা-ঝাড়া দেবে। দু-পায়ে আমাকে ছুঁড়ে ফেল্‌বে।"

খন্তর লজ্জিত হইল। মনের ভিতর ওইরূপ একটা দুরভিসন্ধির ভগ্নাংশ লুক্কায়িত ছিল বটে। কপটতা তাহার সহে না, সহজেই ধরা পড়ে। পার্ব্বতীর মত নির্ব্বোধও তাহার চাতুরী ধরিয়া ফেলিল!

মনে মনে অপ্রস্তুত হইল। আত্মাভিমান জাগিল। না—হীনচেতা

স্বামীর মত ছল-চাতুরীর সাহায্যে স্ত্রীকে ঠকাইবে না। পার্ব্বতীর স্বেচ্ছাচার, অশিষ্টাচার থামাইতে পারুক চাই না পারুক,—পার্ব্বতীকে সুখী করিবার জন্য, তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য অকপটে আত্মসমর্পণ করিবে। তার পর ভাগ্যে যা আছে—থাক! পার্ব্বতীকে আত্মঘাতের উত্তেজনা হইতে বাঁচাইতে হইবে।

উদ্বেলিত হৃদয়ে পার্ব্বতীকে স্পর্শ করিয়া বলিল, "শোন, প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—তুমি যা চাইবে, যাতে সুখী হবে, যা হুকুম কর্‌বে, তাই মান্‌ব। এক-বিন্দু ক্ষমতা থাক্‌তে তোমার মতের বিরুদ্ধে চল্‌ব না।"

হতভাগ্য বুঝিল না, সে কাহার স্বেচ্ছাচারের নিকট আত্মবিক্রয়ের শপথ করিল! জানিল না, ইহার জন্য ভবিষ্যতে তাহাকে কত বড় অনুতাপের সহিত কত ক্ষতির দণ্ড বহন করিতে হইবে!

কিন্তু আবেগের ঝোঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়াই সে মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তির স্পর্শ চমক উপলব্ধি করিল।...মনে পড়িল শনিচরকে! আঃ! সে যদি এ সময় উপস্থিত থাকিত তবে হয়ত আহ্লাদে বিভোর হইয়া ভাবিত আহা কি মহিমময় প্রেমলীলা! কি বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় প্রণয়! এর মাঝে কোথাও বিবেক বিরুদ্ধ দুর্ব্বলতার বা যথেচ্ছাচার চরিতার্থতার লেশমাত্র কলুষচিহ্ন নাই। ইহার সমস্তটা স্বর্গীয় ইন্দ্রধনুর বিচিত্র রঙে রঙীন,—অপরূপ রসসৃষ্টির রসব্যঞ্জনায় পীযূষসিক্ত!

খস্তর সন্ত্রস্ত হইয়া নিজের চিন্তাগতি রোধ করিল!—থাক থাক!... ইহার অন্যবিধ তাৎপর্য্যের দিকে এখন আধখানা অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া রাখিলে, এখনি সব রসাবেশের নেশা চটিয়া যাইবে! চিত্ত বিদ্রোহী হইবে! দোহাই নারায়ণ, অন্তরে যাহা আছে, অন্তরে থাক। আপাততঃ—...পার্ব্বতীর মনোরঞ্জনের জন্যে তাহাকে প্রস্তুত করিয়া দাও! হউক সঙ্কল্পভঙ্গ, থাক সন্তানদের মঙ্গল কামনা,—পার্ব্বতীর প্রসন্নতা আগে চাই।

দু'জনের উন্মত্ত-মুখর প্রলাপে কক্ষের বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত বিহ্বল হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত উন্মাদ কলরব চলিল। · বিস্তব সাধ্য সাধনার পর মহা খুসি হইয়া পার্ব্বতী প্রতিজ্ঞা করিল, · এর পর যত দুঃখই আসুক, আত্মহত্যার দুশ্চেষ্টা আর করিবে না।·· সে আজ সুখী, মহা সুখী!

খন্তরের মনে হইল পার্ব্বতী তাহার অন্তরের প্রেমকে হত্যা করিয়া আজ অতি স্থূল বস্তুতান্ত্রিক ভালবাসার লৌহ নিগড় চরণে পরাইল। এর পর পার্ব্বতীর প্রতি স্থূল-প্রীতি—যতই স্থূলতর হউক—শ্রদ্ধার স্থান আর রহিল না।

২৮

মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল।

নবানুরাগের প্রবল বন্যায় পার্ব্বতীর চিত্ততল প্রচণ্ড বেগে আলোড়িত পরিপ্লুত! তাহার চাঞ্চল্য-উন্মাদনার গতিবেগে খন্তরের জীবনে আসিল দারুণ পরিবর্ত্তন। উচ্চ তত্ত্বের আলোকরশ্মি পর্য্যবেক্ষণ-উন্মুখ চিত্ত, নামিল নিম্নস্তরে। অনির্ব্বচনীয় রহস্য-সন্ধানী সূক্ষ্ম-নিভৃত আত্মিক শক্তি, অন্তরের অভ্যন্তরে স্তম্ভিত মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িল!

গৃহজীবনের সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনের বাহিরে তাহার বা খন্তরের কোন কর্ত্তব্য আছে, এ কথা পার্ব্বতী দিনে দিনে গভীর স্বার্থপরতায় ভুলিতে লাগিল। লোকের দায়ে-ঘায়ে বুক পাতিয়া দাঁড়ানো খন্তরের বন্ধ হইল। ওভার টাইম খাটা বন্ধ হইল, চাকরিতে কামাই সুরু হইল। খন্তরকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখিবার জন্য, দৈহিক সংস্রবের আয়ত্তে পাইবার জন্য পার্ব্বতী অষ্টপ্রহর আদর সোহাগ জানাইয়া অধীর উন্মাদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইল!

শনিচর বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "ভাল, ভাল খন্তরা! একেবারে ভেড়া বনে গেলি!"

সুমার অনুযোগ করিয়া বলিল, "ভেইয়া, তুই না আমাদের শাসন করতিস!...তোর উপর কি আমাদের এতটুকু দাবি নেই? ছুটির দিনে একবার চোখের দেখাও পাই না যে!"

পাইবার উপায় ছিল না। পার্ব্বতীর শাসন এতই নির্লজ্জ কঠোর!

দিনে দিনে মাত্রা বাড়িয়া চলিল।

পার্ব্বতীকে অস্বাস্থ্যকর মনোভাবের কবলগ্রস্ত দেখিয়া খন্তর প্রমাদ গণিল। দাম্পত্য-জীবনে যে সকল শাস্ত্রীয় অনুশাসন, স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবার জন্য আজীবন প্রাণপণে সতর্ক ছিল, পার্ব্বতীর কুতর্কের ঝড়ে এবং উপদ্রবের প্রলয় প্লাবনে তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া কোথায় ভাসিয়া গেল।

খন্তর শ্রান্ত বিরক্ত হইল। নানা ছল ছুতায় পার্ব্বতীর অযথা উপদ্রবগুলা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিল। পার্ব্বতী রাগিল, কাঁদিয়া কাটিয়া সোরগোল বাধাইল। খন্তরকে অন্য কোন নারীর প্রতি আসক্ত বলিয়া সন্দেহ করিল। নানা উৎপাতে অস্থির করিল!

উভয়ের মনোবৃত্তির বিভিন্নতায়, প্রবৃত্তির পার্থক্যে দাম্পত্য-জীবনের সুখ-শান্তিতে ক্রমে ক্রমে নরকের আগুন জ্বলিল। খন্তর উৎসাহ হারাইল, উদ্যম হারাইল। হতাশ হইয়া গ্লানি-ভার-পীড়িত চিত্তে, অদৃষ্টের নিকট—তথা পার্ব্বতীর স্বেচ্ছাচারের চরণে আত্মসমর্পণ করিল। নচেৎ কেলেঙ্কারীর আশঙ্কা!

কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে—এরূপ মূঢ়তার ফল ভাল হয় না। কয়েক মাসেই খন্তরের সুদৃঢ় স্বাস্থ্য ভাঙিল। চাকরি বজায় রাখা দুঃসাধ্য হইল।

পার্ব্বতী ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "অসুখ না ছাই! ও সব তোমার ছল-চাতুরী।"

ছোট ডাক্তারবাবু আসিলেন। খন্তরেব অবস্থা দেখিয়া তিরস্কার করিলেন। ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, "তুমি চল তো বাপু দিনকতক আমার বাসায়। নয় তোমার ভাইয়ের কাছে। সবল-চেতা মানুষ, মনের জোরে সুনিয়ম পালন করে। দুর্ব্বল-চেতাকে গায়ের জোরে পালন করানো উচিত। আমার চোখেব সামনে থাকবে চল।"

খন্তর স্বীকৃত হইল। ডাক্তার প্রস্থান করিলেন।

পার্ব্বতী আড়ালে থাকিয়া সব শুনিল। উগ্র মূর্ত্তি ধরিয়া ছুটিয়া আসিল। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া এমন তর্জ্জন গর্জ্জন জুড়িল যে, সে সব কথার উল্লেখ করা চলে না। সব শেষে মত প্রকাশ করিল খন্তরকে সে কিছুতেই যাইতে দিবে না। অসুখ-বিসুখ ও সব কিছুই নয়। খন্তরের অবস্থা এবং ডাক্তারের ব্যবস্থা আদ্যোপান্ত ভণ্ডামি, ধৃষ্টতা ও দুশ্চরিত্রতার পরিচায়ক!

বিপন্ন বিব্রত খন্তর স্বীকার করিল 'ডাক্তার ভুল করিয়াছেন। পার্ব্বতীর তত্ত্বাবধানে না থাকিলে সে কিছুতে সুস্থ হইতে পারিবে না। বাস্তবিক স্ত্রীর মত সেবা-যত্ন কে করিবে? অতএব স্ত্রীকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইবে না।'

ভাবিল এইরূপে অশান্তি এড়াইবে। কিন্তু এড়ান গেল না। বুদ্ধিমতী পার্ব্বতী এমন জোর জুলুমের সঙ্গে তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল, যাহা আদৌ স্বাস্থ্যতত্ত্বের অনুমোদিত বিধি নয়। স্বাস্থ্য আরও মন্দ হইল। হতভাগ্য খন্তরের ক্লান্ত অবসাদ-পীড়িত মস্তিষ্কে এবং দুর্ব্বল হৃদপিণ্ডের মধ্যে শতসহস্র আত্মধিক্কারের বজ্র ঝঞ্ঝনা ধ্বনিত হইতে লাগিল!

খন্তরের মত কঠিন পরিশ্রমের চাকরি পার্ব্বতীর ছিল না, প্রচুর

আহার বিশ্রামের সুযোগ ছিল। অতএব খন্তরের মত দ্রুত স্বাস্থ্যক্ষয় তাহার হইল না, ধীরে ধীরে অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ সুরু হইল। সংযম সদাচার পালনের অনুরোধ উপরোধ সে উদ্ধত অবজ্ঞায় উড়াইয়া দিল। অহরহ উপভোগ-পিপাসু কুচিন্তা চর্চ্চায় চিত্তে গরল ফেণাইত, উষ্ণ মস্তিষ্ক ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিত। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মোহ, এবং দুর্জ্জয় ক্রোধ সময় সময় তাহাকে এত বিভ্রান্ত করিত যে দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে খন্তরের জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠিল।

মানসিক অশান্তিতে খন্তরের অসুস্থতা আরও বাড়িল। হৃদ্‌পিণ্ড ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় শয্যাশায়ী হইয়া মাঝে মাঝে চাকরিতে এত কামাই করিল যে বেতন কাটা ত গেলই, চাকরিও টলমল করিতে লাগিল। দারিদ্র্য বাড়িল।

আত্মগ্লানি ও কেমন একটা অস্বাভাবিক লজ্জা ভীরুতায় বাহিরের লোকসমাজের সংস্রব ছাড়িয়া দিল। ছোট ডাক্তারবাবুর দিক মাড়ানো বন্ধ করিল। জয়পালকে প্রথম প্রথম অসুস্থতার সংবাদ দিয়াছিল, ইদানিং লজ্জায় ঘৃণায় পত্রাদি লেখাও বন্ধ করিয়াছিল। মাসান্তে মাহিনা পাইলে ভাইপো দু'টির স্কুলের মাহিনা, বই, খাতার খরচ জন্য গুটি পাঁচ সাত টাকা পাঠাইত, পার্ব্বতীর তর্জ্জনে এবং অভাবে পড়িয়া তাও বন্ধ করিল।

লোক-পরম্পরায় খন্তরের অসুস্থতার খবর কাণে পৌছিতেই জয়পাল ছুটিয়া আসিল। খন্তরের অবস্থা দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল। সভয়ে বলিল, "এ কি চেহারা হয়েছে? তুই বাঁচবি কি করে?"

অসংযমের ফলে অস্বাস্থ্য ও অভাবের পীড়ন যতই বাড়িতেছিল, সমগ্র মানবসমাজের প্রতি খন্তরের বিদ্বেষ ও বিরক্তি ততই বাড়িতেছিল। জয়পালকে দেখিয়া মনে নিগূঢ় অভিমান ও অন্তর্দ্দাহ জাগিল,—ইহারাই

ত পাঁচজনে জুটিয়া জবরদস্তি করিয়া তাহার স্কন্ধে পার্ব্বতীকে চাপাইয়াছে! পার্ব্বতীর উন্মত্ত-বর্ব্বর ভালবাসার অত্যাচারে, আজ তাহার প্রাণশক্তি দ্রুত ক্ষয় হইতেছে, দিনে দিনে সে মানুষ নামের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে, —ইহারাই ত সেজন্য দায়ী!

খন্তর ভুলিয়া গেল, তাহার নিজের দায়িত্ব! ভুলিয়া গেল তাহার স্ত্রীর দায়িত্ব!

দুঃখের সহিত বলিল, "তোমরা সখ করে সাগা দিয়েছিলে, এখন ভুগছি আমি কর্ম্মফল!"

চোখের জল চাপিয়া জয়পাল বলিল, "চল আমার কাছে। নে দু মাসের ছুটি। বহু দিনকতক ওর বোনের কাছে গিয়ে থাক।"

সসঙ্কোচে খন্তর বলিল, "তা কি করে হবে? ওর মা নেই, বাপ নেই। পরের বাড়ীতে এ সময় থাকা কি পোষায়? শরীরও ভাল নেই।"

পার্ব্বতীর স্থানান্তর বাসের বিরুদ্ধে খন্তর এমন সব যুক্তি তর্কপূর্ণ ওকালতি জুড়িল যে জয়পাল অবাক হইয়া গেল। বুঝিল আসক্তির মাত্রা এতই প্রবল যে ভ্রাতৃবধূকে দুই দিন ছাড়িয়া থাকিবার পক্ষেও ভ্রাতার চিত্ত, শক্তিহীন! কিন্তু খন্তর যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পার্ব্বতীর মত ব্যক্ত করিতেছে, তাহা ঠাহর পাইল না।

কথায় কথায় আরও জানিল—ভ্রাতৃবধূ সন্তান-সম্ভবা।

হর্ষ বোধ হইল না। বিষাদভরে বলিল, "এই ত দু'জনের শরীরের অবস্থা। এ সময় যে ছেলে আসছে, সে বাপ-মায়ের কোন্ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে?"

খন্তর জবাব দিল, "রোগ, নির্ব্বুদ্ধিতা, দারিদ্র্য! বাঁচবে না, ভোগাতে আসছে।"

অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিয়া জয়পাল বলিল, "এ সময় গিন্নি-বান্নি মানুষদের কাছেই বহুর থাকা উচিত। দু'জনে চল গুজন্তি। তুই একটু সেরে-স্থুরে চলে আস্‌বি, বহু তোর ভৌজির কাছে থাক্‌বে। ছেলে-পুলে হলে, তার পর আসবে।"

অর্থাৎ নিজেদের কাছে লইয়া, কৌশলে ইহাদের যথেচ্ছাচারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে।

প্রস্তাবটা থন্তর সমীচীন বোধ করিল। কিন্তু পার্ব্বতী আড়ালে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কথনো না। পরের ঘরে গিয়ে বাঁধাবাঁধি নিয়মে আমি থাক্‌তে পারব না। ভাইয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছ। সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমার ভাই ভাজ আমাকে ছলছুতা করে মেরে ফেলুক, এই চাও, না?"

থন্তর হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত! তাহার মন বুদ্ধি দিনে দিনে এত নিস্তেজ নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, যে, নিষ্কপট স্নেহশীল আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে পার্ব্বতীর এই অর্ব্বাচীনতা নীরবে সহিল। প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইল না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "তবে আমিই দিন কতক ঘুরে আসি। দেখি শরীরটা যদি সারে।"

"না। তোমাকে কোথাও যেতে দেব না। শরীর সারবার হয়, আমার কাছেই সার্‌বে। যেতে পাবে না।"

দৃঢ় আদেশ!

মোহাচ্ছন্ন চিত্তে থন্তর নির্ব্বাক রহিল।

বিদায়ের সময় ভাইকে বলিল, "বিস্তর কামাই করেছি। আর ছুটি নিলে চাকরি টিক্‌বে কি? দেখি চেষ্টা করে।"

কিন্তু চেষ্টা সে করিল না। গুজন্তিও গেল না।

একদিন শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে চাকরি স্থান হইতে ফিরিতেছিল, পথে দৈবাৎ ছোট ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ! ডাক্তার তাহার সামনে দাঁড়াইলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খন্তরের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া গভীর আক্ষেপে বলিলেন, "খন্তর, কোথায় গেল তোমার মুখের সে প্রফুল্লতা, চোখের সে পবিত্রতা? একেবারে জড়ত্ব লাভ করেছ? জেনে শুনে আত্মহত্যা করছ?"

খন্তরের মনে হইল তাহার অধঃপতনের প্রত্যেক ছিদ্রটি এই চরিত্রবান, পবিত্রচেতা শক্তিশালী ব্যক্তি নখদর্পণে দেখিতে পাইতেছেন। লজ্জায় মরিয়া গেল। নিষ্ফল অন্তর্দ্দাহে দগ্ধীভূত হইল। স্ত্রী যে তাহার কল্যাণ-বুদ্ধি ভুলিয়া, ধ্বংস-বুদ্ধিতে নির্ভর করিয়াছে, এ কথা লোকের কাছে প্রকাশ করা চলে না। নিরুপায় হইয়া আজ অদৃষ্টবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। নির্জ্জীব ভাবে বলিল, "অদৃষ্ট বাবু, সবই অদৃষ্ট!"

কথাটা বলিয়াই মনে পড়িল সে যেদিন চিত্তসংযমী, ইন্দ্রিয়সংযমী, ভগবৎনির্ভরশীল ছিল,—সেদিন পুরুষকার-শক্তির প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সীমা ছিল না। সেদিন পুরুষ-সিংহের মত আন্তরিক শক্তি বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রাণপ্রদ উপদেশে কত শত দুর্ব্বলচেতা হতভাগ্যকে সৎপথে টানিয়া আনিয়াছে!…মনে পড়িল অনেকের কথা, সুমারের কথা! অনাচারের পথ হইতে তাহাকে ফিরাইবার জন্য যখন তাড়া দিয়াছিল, সুমার ঠিক এমনিভাবে ক্লান্ত নির্জ্জীবের মত অন্ধ অদৃষ্টবাদের দোহাই দিয়া নিজের মূঢ়তা ঢাকিতে চাহিয়াছিল!

আজ সে চাহিতেছে! কর্ম্মফলের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ!

হাঁ, দুর্ব্বলের সান্ত্বনার সম্বল—অন্ধ-অদৃষ্ট-নির্ভরতা! চিত্তসংযমীর মস্তিষ্ক স্বভাবতঃ বলবান, সুবুদ্ধিমন্ত। অন্ধ অদৃষ্টবাদ লইয়া সে আত্ম-প্রবঞ্চনা করে না।

ডাক্তার অনেক জেরা করিলেন। খন্তর নিষ্কপটে সব মূঢ়তা স্বীকার করিল।

ডাক্তার বলিলেন, "শীঘ্র কোথাও বদ্‌লি হও। ঘর ছেড়ে না বেরুলে তোমার নিস্তার নাই।"

খন্তর তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিল, "যোগাড় করে দিন হুজুর। স্ত্রীপুত্রের অন্ন আমাকে জোটাতেই হবে।"

চেষ্টা চরিত্র করিয়া ডাক্তার ব্যবস্থা করিলেন। মোগলসরাইয়ে বদলির হুকুম আসিল।

পার্ব্বতীর কাছে সংবাদ পৌঁছিল। যখন দেখিল খন্তর তাহাকে শনিচরের ও সুমারের মাতা প্রভৃতি বর্ষীয়সীগণের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া একা বিদেশযাত্রার উদ্যোগ করিতেছে, তখন ভীষণ ক্রোধে মারমূর্ত্তি হইয়া এমন উপদ্রব জুড়িল যে খন্তরের দিনের আহার রাত্রের নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। গৃহিণীরা আসিয়া তাহার অবস্থার কথা স্মরণ করাইলেন, সদুপদেশে শান্ত করিতে চাহিলেন। পার্ব্বতী ভয়ানক জেদের সহিত নির্লজ্জভাবে জানাইয়া দিল 'সে কাহারও কোন উপদেশ চাহে না। নিজের বুদ্ধিতে যাহা ভাল বোঝে, তাই করিবে। যেহেতু তাহার প্রচুর পরিমাণে বুদ্ধি আছে, ইহা সে সুনিশ্চিত জানে। খন্তরের মত নির্ব্বোধের রান্না খাওয়া নিদ্রা বিশ্রামের হেফাজতের ভার কাহারও হাতে দিয়া সে বিশ্বাস করে না। অতএব সঙ্গে যাইবে-ই। নচেৎ সেখানে একা থাকার সুযোগ পাইলে খন্তর অধঃপাতে যাইবে, মনোমত কোন প্রণয়িনী সংগ্রহ করিবে। পার্ব্বতীর প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিবে।' তখন পার্ব্বতীর এবং সন্তানের দশা কি হইবে ?··· না, লোকের কথা শুনিয়া সে কিছুতে স্বামীকে একা ছাড়িয়া দিবে না। তাতে চাকরি থাক, চাই যাক।···'

বাকবিতণ্ডার মাঝে সে ইহাও জানাইয়া দিল 'তাহার মা চাকরির

জন্য স্বামীকে বিদেশে যাইতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ফলে বিদেশে কাঁচা পয়সা হাতে পাইয়া পিতা এমন উচ্ছৃঙ্খল হন যে, পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব ভুলিয়া যান। শেষে আত্মীয়গণ একপাল পুত্রকন্যাসহ তাহার মাতাকে সেখানে পৌছাইয়া দেন, তবে পিতা 'বার-মুখো' প্রবৃত্তি ছাড়েন; বাধ্য হইয়া সকলের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় পার্ব্বতীর জন্ম হয়। এ কথা জননীর মুখে সে শুনিয়াছে।···অতএব সে আর ঠকিতে ইচ্ছুক নয়।' ইত্যাদি!

গুরুতর পুরাতন কাহিনী প্রকাশ হইল! খন্তরের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইল!···দুশ্চরিত্র পিতার অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অবস্থায় পার্ব্বতীর জন্ম! হয়ত তাহার মাতার মানসিক অবস্থাও সে সময় অসংযমী স্বামীর প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়াছিল! সে অবস্থায় যে জন্মলাভ করিয়াছে তাহার মন, বুদ্ধি এমন শোচনীয় ইন্দ্রিয়াসক্তির মোহগ্রস্ত হইবে না ত কি?

দুর্ভাবনা-বিমূঢ় চিত্তে খন্তর অনেক ভাবিল। পার্ব্বতীর গর্ভস্থ শিশুটার জন্য দুশ্চিন্তার অবধি ত ছিল না। আজ আরও আতঙ্ক জাগিল! উঃ, যদি সে বাঁচে, যদি তাহার মাতার জঘন্য-মানসিক প্রকৃতির উত্তরাধিকারী হয়, তবে সমাজে ভবিষ্যতে সে কি দারুণ বিভীষিকা সৃষ্টি করিবে?···

আশা সান্ত্বনা দিল,—অদৃষ্টবশে সে অন্যরূপও হইতে পারে।

অভাগা ভুলিয়া গেল প্রত্যক্ষদৃষ্ট কর্ম্ম-সমষ্টিই অদৃষ্টের জনক।

পার্ব্বতীর প্রচণ্ড কোপন স্বভাবের উত্তেজনায় পাছে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, সেই আশঙ্কায় শেষ পর্য্যন্ত যাইতে সাহস করিল না। অনেক কাঠ খড় পোড়াইয়া বদলির হুকুম রদ করাইল।

প্রাণপণে চেষ্টা করিল, পার্ব্বতীকে কিছুতে মিতাচারী করা গেল না। তাহার মূর্খতা, কুসংস্কার, অনাচারের ফলে একদিন দুপুরে অসময়ে হঠাৎ গর্ভস্রাব হইল।

মেয়েরা আসিয়া সময়োপযোগী শুশ্রূষা করিল। চিরাচরিত প্রথামতে নিয়ম পালনের ব্যবস্থা হইল।

খন্তর কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া দুঃসংবাদ শুনিল। দুর্ঘটনার জন্য গৃহিণীরা হা হুতাশ করিলেন। খন্তর গুম্ হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল ; কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিল না।

পার্ব্বতী বিছানায় পড়িয়া ছিল, খন্তরকে দেখিয়া অধীর উচ্ছ্বাসে কান্না আরম্ভ করিল। খন্তর তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতে যাইতে শুষ্ক স্বরে বলিল, “ভগবান যা করেন, ভালর জন্যে। বেঁচে থাক্‌লে হয়ত তাকে অনেক রোগ, অনেক শাস্তি কষ্ট ভুগ্‌তে হোত, তার চেয়ে এই বেলা গেছে,—সব নিশ্চিন্ত। কেঁদ না।”

যে সন্তানদের কল্যাণ কামনায় খন্তর শত বিধি-নিষেধের বাঁধনে নিজেদের স্বেচ্ছাচার-উন্মাদনাকে বাঁধিতে চাহিয়াছিল,—পার্ব্বতী আরাম লালসায় দর্পভরে যে বন্ধন অস্বীকার করিয়া আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত হইয়াছিল, সেই সন্তানের প্রাণ অপচয় ব্যাপারটা খন্তর এতখানি নির্লিপ্তভাবে অবহেলা করিল দেখিয়া পার্ব্বতীর যেন চমক লাগিল। নিজের মূঢ়তার কথা ভাবিল না, তাহা উপলব্ধির ক্ষমতাও হয়ত ছিল না। নিষ্ফল ক্ষোভে দারুণ আক্রোশ বোধ করিল—খন্তরের উপর! খন্তরের চরিত্রের বিরুদ্ধে হিংস্র ক্রূর সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল, কটু মন্তব্য শুনাইতে লাগিল। তাহার যন্ত্রণা-পীড়িত অবস্থা স্মরণ করিয়া সহিষ্ণু খন্তর নীরব রহিল।

পার্ব্বতীর কয়েকটা জটিল উপসর্গ দেখা দিল। এ সব রোগে, অশিক্ষিত-সমাজে ডাক্তার বৈদ্যের নাম উচ্চারণ করা নিষেধ। কিন্তু খন্তর মানিল না, ডাক্তার আনিল। ডাক্তার প্রাথমিক তদন্ত করিয়া একজন মহিলা চিকিৎসক আনাইলেন। তোড়জোড় করিয়া চিকিৎসা চলিল। পার্ব্বতীর পিতৃবংশ, মাতুলবংশ, পূর্ব্ব স্বামীর বংশ-বৃত্তান্ত এবং

নৈতিক চরিত্রের খোঁজ চলিল। তার পর শ্বশুরের ও পার্ব্বতীর রক্ত পরীক্ষা করা হইল। জানা গেল শ্বশুরের রক্ত নির্দ্দোষ। কিন্তু পার্ব্বতীর রক্তে প্রচ্ছন্নভাবে পারার বিষ রহিয়াছে, এবং তাহার পরিমাণও আশঙ্কাজনক। সম্ভবতঃ সেটা তাহার চরিত্রহীন পিতা ও পূর্ব্ব স্বামীর উপার্জ্জিত সম্পদ।

মানুষ মরে, কিন্তু তাহার কৃত কর্ম্মের ফল বাঁচিয়া থাকে। একজনের পাশব আনন্দ চরিতার্থতার ঋণ,—অনেক নিরপরাধকে আজীবনব্যাপী শাস্তির মূল্যে পরিশোধ করিতে হয়।

শ্বশুর সশঙ্ক হইয়া বলিল, "তাহলে উপায় ?"

ডাক্তার দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "শ্রেষ্ঠ সদুপায়, আত্ম-সংযমের জোরে বংশ সৃষ্টি বন্ধ করা। নয়ত, কতকগুলা জখ্‌নি ঘায়েল্‌, বিষাক্ত ব্যাধির আসামী সৃষ্টি করে যাবজ্জীবন নিজে ভোগ, তাদের ভোগাও, সমাজের অনিষ্ট কর।"

শ্বশুর মর্ম্মাহত হইয়া মাথা হেঁট করিল! হায় রে, সৎসন্তান সৃষ্টির আশার কুহক!

গভীর পরিতাপের সহিত ডাক্তার বলিলেন, "নির্দ্দোষ স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র যুবা তুমি! বিধবা বিবাহ করেছ তাতে দোষ দিই নে। কিন্তু ব্যাপারটার দায়িত্ব বিবেচনা করা উচিত ছিল। প্রথমেই নেওয়া উচিত ছিল পাত্রীর বাপ মায়ের প্রকৃতিগত বিশেষত্বের খবর। তার পর যে লোকটার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে সে দীর্ঘকাল কাটিয়ে এল, তার সন্তানদের মা হোল,—সে লোকটার দেহ মনের স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যের খবর তন্ন তন্ন করে জানা বড় দরকার ছিল। আজ তোমার বর্ত্তমান চাইছে তার কৈফিয়ৎ! জেনে নাও, কত বড় প্রবল আশঙ্কা তোমার ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্যে অপেক্ষা করছে। সব দিক বিবেচনা করে পথ বেছে নাও, বাবা।"

এই দারুণ বিয়ের ক্রিয়াফল কিরূপে পুরুষানুক্রমে বংশাবলীকে

অভিশপ্ত করে, সমাজকে অসুস্থ করে, তার বৈজ্ঞানিক বিবরণ ডাক্তার বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

খন্তর উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে সমস্ত তত্ত্বের সঠিক অর্থ ধারণা করিতে পারিল না। শুধু এইটুকু বুঝিল তাহার সংসার জীবনের সোনার স্বপ্ন ভাঙিল! প্রত্যক্ষ বাস্তব তাহার সমস্ত ছলনাময় ছদ্মবেশ ছাড়িয়া, আজ বীভৎস নিষ্ঠুর মূর্ত্তিতে সামনে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহার কাছে দাম্পত্য-প্রেমের দোহাই, তথাকথিত ভালবাসার দোহাই, মনের দুঃখ দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া আত্ম-প্রতারণা চলিবে না। এই নির্ম্মম বাস্তবকে ইহার ন্যায্য প্রাপ্য—হাতে হাতে মিটাইতে হইবে!

ডাক্তার বলিলেন, "মনোবিজ্ঞানের কুতর্কের হেয়ালিতে মানুষের নৈতিক জীবনের ব্যভিচারকে সমর্থন করে অনেকেই স্বাধীন-চিন্তার দম্ভ করেন। ভাববিলাসিতা,—অদূরদর্শিতা, রসালো গল্পের ঝাঁঝালো মসলা হতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবনটা ভাববিলাসের স্বপ্ন নয়। স্পষ্ট দেখছি,—একজনের নৈতিক জীবনের অপবিত্র উচ্ছৃঙ্খলতা, তার নিজের জীবনে, বংশের জীবনে, সমাজের জীবনে সৃষ্টি করে যাচ্ছে চিকিৎসার অসাধ্য, দৈহিক ব্যাধি, দুশ্চিকিৎস্য মানসিক ব্যাধি। ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক অকল্যাণের নাম কর্‌ব না। জানি, এঁদের বিচারে সেগুলা, মূর্খতা কুসংস্কার বলে সাব্যস্ত হয়েই আছে। আজ তোমার শ্বশুর-বাবাজী বেঁচে থাক্‌লে কৈফিয়ৎ চাইতুম।—দেখাতুম তাঁর মেয়ের অবস্থা।"

ম্লান হাস্যে খন্তর বলিল, "ভুল ডাক্তারবাবু, মনোরূপ ভাসাস্রোতে যারা ভেসে গেছে,—তাদের বিচারে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়াসক্তির রঙীন্ নেশাই—প্রেমের পবিত্র আলো! আসুরিক দম্ভই—বিবেক-শক্তি! দিন্ পায়ের ধূলো আমার মাথায়। পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে, নিজেদের মঙ্গলের জন্যে বংশ-সৃষ্টি বন্ধ করাই আমাদের উচিত। তাই কর্‌ব।"

ডাক্তার একটু অন্যমনা হইলেন। আর একটা বহি লইয়া তার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু তোমার স্ত্রীর মানসিক অবস্থার কথাও বিবেচনা করা উচিত। আত্ম-সংযমে অক্ষম—"

প্রতিবাদের সুরে খন্তর বলিল, "ভুল ডাক্তারবাবু, আমার বিশ্বাস,—তেমন ইচ্ছাশক্তি থাকলে, পৃথিবীর সব নরনারীই আত্মসংযমে সক্ষম।"

ডাক্তার দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু দেখেছি—সে ইচ্ছাশক্তি সকলের নাই। অসংযমী বাপ মায়েদের দোষে কলুষিত-চেতা নরনারীর সংখ্যা পৃথিবীতে যথেষ্ট বেড়েছে। তুমি ত রামায়ণ পড়, রাবণের জন্ম বৃত্তান্তের অর্থ টা বুঝেছ?"

খন্তর স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ডাক্তার বলিলেন, "ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যকে আজ আমরা ভেংচি কাট্‌তে শিখেছি। ডেঁপোমি আর বাকচাতুরী-সর্ব্বস্বতাকে ভাব্‌ছি—সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-বিশ্লেষক বুদ্ধির বাহাদুরী। মনোবিকারের বিভিন্ন অবস্থার জঘন্য অনুভূতিকে মোহমত্ততাকে ভাবছি—মনোবিজ্ঞানের মহামূল্য আবিষ্কার! গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য,—যা একদিন ইন্দ্রিয়-বিজয়ের পবিত্র উপায় বলে নির্দ্দেশিত হোত, তা আজ কলুষিত-চিত্ত মানুষের বিচারে উপহাসকর দুর্নীতি বলে সাব্যস্ত হয়েছে! হাঁ হয়েছে।—যাঁদের আমরা শিক্ষিত ভদ্র বলি,—তাঁদের অনেকের মুখেও এ কথা শুনেছি।"

বিস্মিত হইয়া খন্তর বলিল, "তাহলে বুঝ্‌তে হচ্ছে তাঁদের মনের অবস্থা—"

ডাক্তার বলিলেন, "আলোচনা বাহুল্য। মোট কথা,—স্পষ্ট দেখছি আত্ম-সংযমে অক্ষম বল্‌ব না,—অনভ্যস্তই বলি,—দুর্ব্বল-চেতা নরনারীর সংখ্যা প্রচুর। পৃথিবীর কর্ম্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ শক্তিশালী জাতগুলি সমাজের

দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের জন্যে বংশবৃদ্ধি-নিবারক নানা উপায় উদ্ভাবন করছে। আমাদের দেশেও সে উপায় আমদানি হচ্ছে। কিন্তু বলিষ্ঠ শক্তিশালী জাতের ভোগ উপভোগের আদর্শ আমাদের দেশের এই ক্ষীণ জীবীদের ক্ষীণ স্বাস্থ্যের পক্ষে,—মনের দুর্ব্বলতা, দেহের রোগ-প্রবণতা আরও বাড়াবে বলে আশঙ্কা হয়। তবু বলছি অসংযম লুব্ধ মানুষদের পক্ষে একপাল রুগ্ন নির্জ্জীব সন্তান সৃষ্টি করে রোগে দারিদ্র্যে জড়িয়ে মারার চেয়ে—সেও ভাল। এতে মরে,—শুধু নিজেরাই মরবে।"

খন্তর বলিল, "উপায়টা কি ?"

ডাক্তার কৃত্রিম উপায়—তথা বৈজ্ঞানিক উপায়ের কথা বলিলেন। অনিচ্ছা-পীড়িত স্বরে বলিলেন, "অসংযমীর পথ ! মহা অনাচার !"

খন্তর বিষাদভরে হাসিল! বলিল, "এ যে ব্রহ্মহত্যা পাপ! শাস্ত্র অনেক ঠুকে অনেক বাজিয়ে,—দেখিয়ে গেছে ব্রহ্মচর্য্যই ব্রহ্মবল! চাই কায়মনে ব্রহ্মচর্য্য। ও সব ফাঁকির কারবার নিয়ে অসংযমীর দল যা ইচ্ছা করুক। যার আত্মসংযম ক্ষমতা আছে, সে কেন দেহ, মন, আত্মার সর্ব্বনাশ করতে ও পথে ছুটবে? অকৃত্রিম উপায়ই—নিজের উন্নতির, সমাজের উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায়। আত্মসংযম এত শক্তই বা কি? অভ্যাসে ত জগৎ জয়!"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে ডাক্তার বলিলেন, "তোমার মুখে এমন কথা আবার শুনতে পাব, আশা করি নি। ভয় হয়েছিল—জিরের দামে হীরে বুঝি,—একেবারে বিকিয়ে গেছে! শোন তবে—মহামনস্বিনী, স্থিরচিত্ত, ব্রহ্মবাদিনী মহিলার মন্তব্য—"

ডাক্তার "উপাসিকা চরিত" খুলিলেন। ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি ও আনি বেশান্তের পরিচয় দিয়া,—বহির এক স্থান হইতে পড়িয়া শুনাইলেন—

"ব্লাভাটস্কি যখন বেশান্তের সামাজিক দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনোদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত বংশবৃদ্ধি নিবারক উপায়ের কথা শুনিলেন, তখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহা কতদূর অসম্পূর্ণ তাহা বুঝাইলেন। ব্লাভাটস্কি এ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, বেশান্ত নিম্নলিখিতরূপে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন—

"তুমি যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহা আধিভৌতিক উপায় মাত্র। কিন্তু যে রোগের মূল রহিয়াছে অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে, তাহার মূলোচ্ছেদ উক্ত উপায়ে হইতে পারে না। উহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়—**নরনারীর প্রবৃত্তি-সংযম**। সংযম অভ্যাস করিতে করিতে তাহারা ক্রমে ক্রমে উচ্চতর চিন্তাপ্রসূ মস্তিষ্ক ও দেহ লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাতেই দুঃখ নিবৃত্তি হইবে।"

খন্তর আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলিল, "অতুলনীয় উক্তি! জ্ঞানীর চোখ আর অজ্ঞানীর চোখের তফাৎ—এই দেখুন।"

ডাক্তার বলিলেন, "অসাধারণ দূরদর্শী দৃষ্টি,—এ কেবল মহা সংযমীর প্রতিভাতেই সম্ভব! বিবেকানন্দও একদিন দৃঢ়কণ্ঠে বলে গেছেন "জগতের দুঃখ সমস্যার একমাত্র মীমাংসা **মানবজাতিকে পবিত্র করা**।" "দুঃখ হয় হে,—আধ্যাত্মিক শক্তি আজ উপেক্ষিত। তাই আধিভৌতিক উপায়, ভৌতিক উৎপাত, ভূতুড়ে কাণ্ড—এই সবের পায়ে মানুষ নিজেকে বিকিয়ে দিতে ব্যস্ত।"

খন্তর ধীরভাবে বলিল, "চিত্তশুদ্ধির অভাব,—পুরুষকারের অভাব। কর্ম্মফল যাবে কোথা? উঠি এখন, দিন্ পায়ের ধূলা। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার কথায় কাযে সামঞ্জস্য থাকে। শয়তানের ফাঁদে যেন আর না পড়ি।"

খন্তর প্রণাম করিয়া ডাক্তারের পায়ের ধূলা লইল। ডাক্তার বলিলেন,

"হয়ত শক্তি নেই—তবু আশীর্ব্বাদ করি সত্যাশ্রয়ী নিষ্কপট ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হও। কিন্তু একটি অনুরোধ, স্ত্রীকে ত্যাগ কোর না।"

বেদনার হাসি হাসিয়া খন্তর বলিল, "যাদের পাপের দণ্ড সে ভুগ্‌ছে, তাদের আত্মার মঙ্গল হোক। আমি ওকে সাধ্যপক্ষে কোন কষ্ট দেব না। সন্তানের মা, সসম্মানে প্রতিপালন কর্‌ব। ধর্ম্মসাক্ষী করে ভার নিয়েছি যে। তার পর তার ধর্ম্ম—তার কাছে!"

আশঙ্কা ওইখানে! পার্ব্বতী যে একান্তভাবে পশুবুদ্ধির অধীন! তাহার অসংযত মন এবং বিশৃঙ্খল কলুষিত বুদ্ধি যে কোন সুযুক্তি-সঙ্গত কল্যাণ-সাধনার পথ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়!

বিদায় লইয়া খন্তর বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইল। ডাক্তার চক্ষু বুজিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কষ্টের সঙ্গে কিছু যেন ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "যোগীদের সূক্ষ্ম সাধনা নাদ-বিন্দু যোগের স্থূল উপায়—বাহ্য সাধনার প্রণালী তুমি সাধকদের দলে মিশে শিখেছিলে, নয় খন্তর? চেষ্টা কর না, স্ত্রীর অসংযত মনকে যাতে উচ্চতর চিন্তায়, সংযম পবিত্রতার দিকে নিয়ে যেতে পার—"

বিষাদভরে হতাশ কণ্ঠে খন্তর বলিল, "চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। ছাগল দিয়ে কি যব মাড়ানো চলে? এরা আত্মহত্যা চায়,—আত্মরক্ষা নয়!"

খন্তর প্রস্থান করিল।

২৯

খন্তরের স্বভাবতঃ বৈরাগ্য-প্রবণ চিত্ত, সহজেই সব আসক্তির নেশা কাটাইল। নিজের জন্য বেশ একটা সুখময় নিরাশার অবস্থার সৃষ্টি করিল। মনঃস্থির কবিবার জন্য একান্ত আগ্রহে, দৃঢ়তার সহিত সাধন ভজনে লাগিল। পূর্ব্বের মত উৎসাহের সহিত উপার্জ্জনে মন দিল। শরীরের উন্নতি সাধনে দৃষ্টি রাখিল।

ঘোরতর দৈহিক অবস্থা বিপর্য্যয়ে. এবং বোধ হয় নিজের মূঢ়তার নিঃশব্দ অনুশোচনায় পার্ব্বতী কয়েক দিন নিঝুম ম্রিয়মাণ রহিল। তাহার চিকিৎসা শুশ্রূষার ব্যবস্থা যাহা করা উচিত খন্তর সব করিল, কিন্তু এবার আর তাহাকে দিল না—অযথা প্রশ্রয়। পার্ব্বতীর অন্যায় আবদারগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া বেশ ধীর গম্ভীর ভাবে জানাইয়া দিল, স্বাস্থ্য ভাল নাই, দেনায় মাথা বিকাইয়াছে। এখন দেনা পরিশোধের জন্য স্বাস্থ্য বাঁচাইতে হইবে, প্রাণপণে খাটিতে হইবে। দায়িত্বহীন ভাবে অলস আরামে প্রমোদরঙ্গ করিবার সময় নাই। এবার পার্ব্বতী কোনরূপ গোল-মাল করিলে সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তার পর যেখানেই থাক, পার্ব্বতীর ভরণ-পোষণের খরচ পাঠাইবে। আর কোন সম্পর্ক রাখিবে না।

শরীরের শক্তি হ্রাসের সঙ্গে মানুষের ঔদ্ধত্য দর্পও কমে,—বিশেষতঃ যাহারা একান্ত ভাবে দেহজ্ঞানসর্ব্বস্ব জীব। দুর্ব্বল-দেহ পার্ব্বতী প্রথমে ভয় পাইল, তার পর নীরবে দুই দশ দিন কাঁদিল। তার পর যতই সুস্থতা লাভ করিতে লাগিল—ততই র‍্যাগিয়া ঝাঁজিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল, খন্তর নিশ্চয় গুপ্ত প্রণয়িনীদের লইয়া বাহিরে আনন্দে বিহার করিতেছে। সেই জন্যই পার্ব্বতীর প্রতি আর আসক্তি নাই।

খন্তর অবিচলিত ভাবে জবাব দিল, "হাঁ, অনাসক্তির চেষ্টাই দেখছি। যথেচ্ছাচার ভোগের ফলে রোগ জুটিয়েছি, দেনা করে চিকিৎসা চালিয়েছি। এবার দেনা শোধের জন্যে প্রাণপণে খাটা চাই। পাওনাদারকে ত ফাঁকি দিতে পারি না।"

পার্ব্বতী বলিল, "দু' দণ্ড আমার কাছে বস্‌লে—"

"ঘরে বসে স্ত্রীর আঁচল ধরে ন্যাক্‌রা করে সময় কাটালে, সময় বেশ কাট্‌বে। দেনা শোধ হবে না। কাল যদি আমি হঠাৎ মরে যাই, তোমার মাথায় দেনা চাপিয়ে যাব?"

স্বার্থবোধ পার্ব্বতীর যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। অতএব ভয়ে নিরুত্তর রহিল।

খন্তর, বিশুয়ার মা, শনিচরের স্ত্রী ও মাতার সম্মিলিত সেবাযত্নে পার্ব্বতী আবার ধীরে ধীরে সুস্থ সবল হইল। গৃহস্থালীর ভার হাতে লইল। আবার ধীরে ধীরে খন্তরের আহার বিশ্রাম সাধনভজনের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিল। খন্তর শান্ত দৃঢ়ভাবে প্রশ্ন করিল, "আমায় এখানে টিক্‌তে দেওয়া কি তোমার ইচ্ছা নয়? তাহলে থাক তুমি একা, আমি সরে পড়ি।"

পার্ব্বতী এ প্রস্তাব মোটে সহিতে পারিত না। খুব কাঁদিল। খন্তরের যে গুপ্ত প্রণয়িনী 'গুণতুক্' করিয়া তাহার চিত্ত অধিকার করিয়াছে, তাহার উদ্দেশে খুব গালাগালি দিল। খন্তরের সেই অদৃশ্য প্রণয়িনীটার অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্য ঘরে, বাহিরে, জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, সর্ব্বদা সন্দেহ দৃষ্টি হানিতে লাগিল। সর্ব্বত্র অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। খন্তরের প্রতি সর্ব্বদা কড়া প্রহরীর মত দৃষ্টি রাখিল। খন্তর কখন কোথায় কি ভাবে প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হয়, সে রহস্য উদঘাটনের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইল।

খন্তর প্রথমে ধীরভাবে সহ্য করিল। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বাড়িতে

লাগিল। নিরতিশয় উত্ত্যক্ত হইয়া শেষে বলিল, "নিষ্কর্ম্মার নানা ব্যাধি জোটে। দিদিমণির কাছে যখন ছিলে, পূজা অর্চ্চনায় যেমন মন দিয়েছিলে, তেমনি করে সাধনে মন লাগাও। দেহ মনে বেশ উপকার পাবে। এ সব কদর্য্য চিন্তা ভুলে যাও।"

ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইয়া পার্ব্বতী বলিল, "বটে, আমি সাধন ভজন নিয়ে থাকি, আর তুমি যা খুশী তাই কর। এতেই আট্‌কাতে পারছি না। কোথায় যাওয়া-আসা করছ ধর্‌তে পারি না। কখন যে তাকে চুপি চুপি ঘরে আন্‌ছ, টের পাচ্ছি না। আবার সাধন ভজন?"

পার্ব্বতীর অসুস্থতার পর হইতে খন্তর পাশের ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল। নিজের সমস্ত জিনিসপত্র সেইখানে লইয়া গিয়াছিল। যেদিন রাত্রে ছুটি থাকিত, সেই ঘরে ঘুমাইত। বিশুরার মা রাত্রে পার্ব্বতীর কাছে থাকিত। মনে পড়িল বৃদ্ধা সকালে উঠিয়া প্রায়ই বিড়্ বিড়্ করিয়া জানাইত, পার্ব্বতীর এক জঘন্য বাতিক হইয়াছে। গভীর রাত্রে উঠিয়া, দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া খন্তরের বন্ধ দুয়ারে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। প্রশ্ন করিলে বলে 'খন্তরের প্রণয়িনীটা আসিয়াছে কি না, উহারা কথাবার্ত্তা বলিতেছে কি না সন্ধান লইতেছে।' এক একদিন দুপুর রাত্রে অকারণ উত্তেজনায় হাঁকাহাঁকি করিয়া খন্তরের ঘুম ভাঙাইত, দুয়ার খোলাইত। প্রখর দৃষ্টিতে ঘরের সমস্তটা খানা-তল্লাসী করিয়া যাইত।

খন্তর অটল ধৈর্য্যে সহিত। ভাবিত, প্রথম স্বামীর দুশ্চরিত্রতার স্মৃতি তাহার মূঢ় চিত্তকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়াছে। সেই জন্যই খন্তরের চরিত্রনিষ্ঠা সে বিশ্বাস করিতে পারে না। অতএব যেরূপে ইচ্ছা, তদন্ত করিয়া সন্দেহ মিটাইয়া লউক। বাধা দিয়া উহার সন্দেহটা কোনরূপে বাড়িবার সুযোগ দেওয়া অনুচিত।

কিন্তু বাড়াবাড়িটা ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। সেদিন সন্ধ্যায় কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিবার সময় দেখিল পার্ব্বতী পথের মোড়ে একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া আছে। হেতু জিজ্ঞাসা করায় অতিশয় গম্ভীর ভাবে জানাইল, পথে আসিবার সময় খন্তর কোন প্রণয়িনীকে কিছু সঙ্কেত করিয়া আসে কি না, সেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করিবার জন্য ওখানে অপেক্ষা করিতেছিল। সুমার দূর হইতে উভয়কে দেখিল,—হাসিল, কাশিল। ভেইয়ার প্রতি ভৌজির প্রবল অনুরাগ যে বিরহিনী প্যারিজীর কৃষ্ণ দর্শন উৎকণ্ঠাকেও হার মানাইয়াছে, তাহা মনে প্রাণে ধ্রুব সত্য মানিয়া সকৌতুকে পরিহাস করিল। খন্তর কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, পার্ব্বতীর 'প্রবল অনুরাগ'ই অঙ্গীকার করিল। দুর্ব্বল শরীরে হিম লাগানোর জন্য ভৎর্সনা করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে আনিল।

কিন্তু ক্রমাগত এই অহেতুক ইতর সন্দেহের অত্যাচার সহিতে সহিতে তাহার অন্তর অপমানে আহত হইতেছিল। পার্ব্বতীর প্রকৃতিগত নীচতার প্রতি ঘৃণা জমিতেছিল। আজ আর সহিতে পারিল না। রুদ্র-দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "তোমার এই কুৎসিত সন্দেহের জন্যে, লোক-সমাজের সংস্রব ছেড়েছি। চাকরি বাজিয়ে এসে, সব সময় তোমার চোখের সামনে রয়েছি। স্বচক্ষে দেখছ ঘরের কোণে নিজের কায নিয়ে সময় কাটাচ্ছি। তবু তোমার সেই সন্দেহ? অসংযম-ক্ষিপ্ত বাপ-মায়ের সব কুসংস্কার, সন্তানের জীবনে মূর্ত্তিমান হয়। দূষিত রক্তে জন্মগ্রহণ করেছ, পারার বিষে তোমার মগজ ছারখার হয়ে আছে। তুমি এখন আকাশে বাতাসে আমার উপপত্নী তল্লাস করবে বৈ কি!"

খন্তরকে রুষ্ট হইতে দেখিয়া পার্ব্বতী একটু দমিল। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া গভীর বিজ্ঞতার সুরে বলিল, "তোমার পাপ না থাক্‌লে আমার ছেলে গেল কেন?"

রক্ত পরীক্ষার ফল, ডাক্তারের মন্তব্য, খন্তর সাবধানে পার্ব্বতীর কাছে চাপিয়া গিয়াছিল। আশঙ্কা ছিল, ভবিষ্যৎ আশা একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলে, তাহার মন ভাঙিয়া যাইবে। হতাশার আক্ষেপে হয়ত বা মরিয়া যাইবে। আজ নির্ম্মম আঘাতে উত্যক্ত হইয়া বলিল, "ছেলে গেল কেন? সে খবর জিজ্ঞাসা কর তোমার বাপকে, তোমার আগেকার স্বামীকে! দুশ্চরিত্রতার ফলে তাঁরা খারাপ ব্যায়রাম যোগাড় করেছিলেন, জান সে কথা?"

নির্ব্বিকার মুখে পার্ব্বতী বলিল, "তা তো জানি, কিন্তু আমার তো কিছু হয় নি!"

"ফুটে বেরোয় নি, কিন্তু রক্তে মজুত আছে। জিজ্ঞাসা কর ডাক্তারকে।"—নিষ্ঠুর চিত্তে খন্তর ডাক্তারের সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিল।

পার্ব্বতী জড়ের মত বসিয়া অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। যেন এগুলা নিতান্ত তুচ্ছ কথা। ইহার সহিত তাহার জীবন ব্যাপারের কোন সম্পর্ক,—কোন দায়িত্ব নাই। শুধু খন্তর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছে, ইহাই একটু নূতন দ্রষ্টব্য!

উপসংহারে খন্তর কঠোর ভাবে বলিল, "আমিও অজিতেন্দ্রিয় পাপিষ্ঠ। তাই তোমার লক্ষ্মীছাড়া খেয়ালের পায়ে দাসখৎ লিখেছিলাম; বুঝি নি, খেয়ালটা তোমার বংশগত জঘন্য রোগের ফল। সাবধান করে দিচ্ছি,—ঘরের গিন্নি হয়ে আছ, ওই পর্য্যন্ত থাক। ইচ্ছা হয়, সাধন ভজন কর, দশজনের আপদ বিপদে উপকার কর; আমি প্রাণপণে তোমার ভালর চেষ্টা করব। কিন্তু ছেলেপিলের কথা আর কোন দিন আমার কাছে তুলো না। সে চিন্তাও মনে ঠাঁই দিও না। কতকগুলো,—সমাজের গলগ্রহ বিষাক্ত রোগী সৃষ্টি করার চেয়ে নির্ব্বংশ হওয়াই ভাল। আমি তাই চাই।"

খস্তর উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দুয়ারে খিল বন্ধ করিল।

অনেকক্ষণ পরে পার্ব্বতী গিয়া দুয়ারে ঘা দিল। বলিল, "রাত হয়েছে। খাবে চল।"

ধরা গলায় খস্তর জবাব দিল, "মাথা ধরেছে, খাব না। তুমি খেয়ে শোও গে।"

"তাহলে বাইরে এসে বস। একা রান্না ঘরে যেতে আমার ভয় কর্‌ছে। বিশুয়ার মা এখনো আসে নি।"

"ভয় কি? আমি ত জেগে রয়েছি। যাও, খাও।"

"না। তুমি বাইরে না এলে আমি খাব না।"

মনে পড়িল পার্ব্বতী ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না। না খাইলে রাত্রে ঘুমাইতে পারিবে না। পার্ব্বতীর আচরণগুলাকে যতই ঘৃণা করুক, তবু এই দৈহিক-চিন্তা-সর্ব্বস্ব মানুষটা—ভগবানের জীব। খস্তরের দোষে ক্ষুধায় কষ্ট না পায়, সেটা দেখা কর্ত্তব্য।

একটা কম্বল গায়ে জড়াইয়া বাহিরে আসিল। রান্নার চালায় গিয়া গরম উনানের পাশে বসিল। দারুণ শীত পড়িয়াছে।

পার্ব্বতী আলো হাতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল খস্তরের চোখ মুখ লাল হইয়াছে, চোখের পাতা ফুলিয়াছে। বুঝিল সে এতক্ষণ নির্জ্জনে চোখের জল বিসর্জ্জন করিতেছিল। এইমাত্র চোখ মুছিয়া, আসিতেছে।

ক্ষণেক আড়ষ্ট হইয়া রহিল। ধীরে ধীরে নিজমনে বলিল, "কে যে এমন তুক্ তাক্ কর্‌লে তোমায়, কি বিষ যে ঢেলেছে তোমার মনে,—আমায় তোমার চক্ষুশূল করে দিলে! আচ্ছা আমিও বলছি, আমার যে এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লে, তার যেন সর্ব্বনাশ হয়!"

দু'হাতে মাথা চাপিয়া শান্ত স্বরে খন্তর বলিল, "বাজে বকুনি রাখ, খেয়ে নাও।"

পার্ব্বতী আলো রাখিল। সহসা সবলে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "খাবে এস দেখি। না খেয়ে খেয়ে মরে যাবে, এই ফন্দী করেছ! বুঝ্‌তে পারি না কিছু? মর, মরবে। তার জন্যে দুঃখ নাই। আমার ব্যবস্থা করে, তা'পর মর। তুমি যে আমায় গাছতলায় রেখে যাবে, সে হবে না। খাও, খেতে হবে।"

বড় দুঃখে খন্তর হাসিল!—অভাগিনী কি নির্ব্বোধ! জীবনের দায়িত্ব, গুরুত্ব, কিছুই তাহার জড়তাচ্ছন্ন অনুভূতিকে স্পর্শ করে না।... সে জানে শুধু অনাবশ্যক আড়ম্বরে প্রলাপ চর্চ্চা, এবং অতি স্থূল দৈহিক উপভোগ স্পৃহা ও নির্লজ্জ স্বার্থপরতা! একবেলা না খাইলে খন্তর মরিবে, এবং সে মৃত্যু শুধু তাহার বৈষয়িক স্বার্থহানির জন্য আপত্তিকর! অতএব খন্তরকে তাহার আর্থিক স্বার্থের খাতিরে খাইতে হইবে, বাঁচিতে হইবে!

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অনুতাপ হইল। এই একান্ত অন্তঃসারশূন্য, আত্মপরায়ণ নারীর মধ্যে কি দেখিয়া একদিন অতখানি ভালবাসা—তথা আসক্তিতে আত্মহারা হইয়াছিল? কেন ইহার সব বর্ব্বরতা নির্ব্বিচারে পরম আগ্রহে ক্রীতদাসের মত মানিয়াছিল?..

তখনি মনে হইল—নিজের চিত্তের কলুষে নিজেই যে মোহান্ধ হইয়াছিল!...কেন আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক হয় নাই? কেন বাসনা সংযত করে নাই? কেন কদাচারে আসক্ত হইয়াছিল? কেন ইহাকে পত্নীর আসন দিয়াছিল?

কিন্তু দিয়াছে যখন, তখন দায়িত্বজ্ঞানের মর্য্যাদা রাখা চাই। একটা

ভুলের ধাক্কায় যেন আরও অনিষ্টকর ভুলের গহ্বরে না পড়ে, সে দিকে কঠোর সতর্কতা রাখা চাই।

হাত ছাড়াইয়া, ধীরভাবে বলিল, "এক বেলা উপবাসে মানুষ মরে না—"

বাধা দিয়া তীব্র জিদের সহিত পার্ব্বতী বলিল, "মরে, তুমি জানো না। আমায় চেয়ে কি তুমি বেশী বোঝ?"

যাহার বুদ্ধিমত্তার আতিশয্য এত বেশী, তাহার সহিত তর্ক করিতে গেলে ধৈর্য্য থাকে না। বার কয়েক আপত্তি করিয়া শস্তুর দেখিল তাহার নিজের মস্তিষ্কও উষ্ণ হইতেছে, পার্ব্বতীও উগ্র হইতেছে। শ্রান্ত হইয়া বলিল, "দাও।"

আজ অপ্রিয় সত্যের নিষ্ঠুর আঘাতে পার্ব্বতীকে যা ব্যথা দিয়াছে, সেটা পার্ব্বতীর কতখানি লাগিয়াছে জানে না, কিন্তু নিজের লাগিয়াছে মর্ম্মান্তিক। পার্ব্বতীর জন্য বড় কষ্ট হইতেছিল।

আহারে প্রবৃত্তি ছিল না। একখানা রুটি খাইয়া উঠিয়া পড়িল। পার্ব্বতী সখ করিয়া ডালপুরী বানাইয়াছিল, কপির তরকারী রাঁধিয়াছিল, সব পড়িয়া রহিল।

রাগে পার্ব্বতী ক্ষেপিয়া উঠিল। চীৎকার করিতে লাগিল 'পার্ব্বতীর রান্না যখন শস্তুরের পছন্দ হইতেছে না, তখন মতলব তাহার ভাল নয়। মনে সে গূঢ় ষড়যন্ত্র পাকাইতেছে,—নিশ্চয় অপর কোন নারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে। তাহাকে দিয়া 'তারিপের রান্না' রাঁধাইয়া খাইবে, সেই জন্য...' ইত্যাদি নানা অসংলগ্ন উক্তি!

আঁচাইতে আঁচাইতে শস্তুর বলিল, "ভোজনবিলাসিতায়, ইন্দ্রিয়-বিলাসিতায় তোমার মন জড়ীভূত। তুমি এর বেশী ভাব্‌তে পার না। কিন্তু আমার শরীর ভাল নেই। গুরুপাক জিনিস খেয়ে পাকস্থলীর

গোলযোগ ঘটাব, বিছানায় পড়ে থাকব—সে সাহস নেই। চেঁচিও না। এমন কর ত, কাল থেকে বাড়ীও ঢুকব না, খাবও না।"

মুহূর্ত্তে পার্ব্বতী নীরব। তাহার যত ভয় ভাবনা এইখানে। খন্তর বাড়ী না ঢুকিলে, তাহার শাসন-কসনের অধীনস্থ হইয়া না থাকিলে,—দুশ্চরিত্র হইবে, মরিয়া যাইবে—এমনি একটা গুরুতর আতঙ্ক মনে পোষণ করিত। কিন্তু সে সরিলে বা মরিলে পার্ব্বতীর ক্ষতির সীমা থাকিবে না, ইহা বেশ বুঝিত।

পার্ব্বতী কিছু দিন চুপ-চাপ রহিল। খন্তর নিরুপদ্রবে সাধন ভজন ও ওভারটাইম-খাটা চালাইল। অস্বাস্থ্য ও আর্থিক দুশ্চিন্তায় যে বিরক্তিকর আবহাওয়া সংসারের চারিপাশে জমিয়া উঠিতেছিল, প্রাণপাত পরিশ্রমে তাহা দূর করিতে লাগিল। কিন্তু অভাগার মুখে-রক্ত-ওঠা পয়সায়, এক দেনা শোধ হইতে না হইতে—দায়িত্বজ্ঞানহীন অমিতব্যয়ী পার্ব্বতী নূতন দেনা করিতে লাগিল। খন্তর বিব্রত হইয়া বলিল, "এত খরচ কোর না। দেনা শোধ কর্‌তে দাও।"

পার্ব্বতী রাগ করিয়া বলিল, "বেশ। আমিও এবার চাকরি কর্‌ব।"

বড় বাবুর বাড়ী গিয়া ঠিকা-চাকরি লইল। খোকার তখন অসুখ করিয়াছিল, পার্ব্বতীকে পাইয়া গৃহিণী ও কর্ত্তা মহা সমাদরে রাখিলেন। ছেলের সমস্ত ভার পার্ব্বতী লইল। বেশ সুশৃঙ্খলে কাযকর্ম্ম করিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাড়ী আসিত, রাঁধা বাড়া করিত, গম্ভীরভাবে খন্তরকে প্রয়োজনীয় জিনিস আনিবার হুকুম দিত। পরম গম্ভীরভাবে খাইতে দিত। বকাবকি বন্ধ করিল।

খন্তর দেখিল খোকাবাবুর কাষ লইয়া পার্ব্বতী আছে ভাল। শান্তি বোধ করিল। পার্ব্বতীর কাযে বাধা দিল না। গোপনে গিয়া গৃহিণীকে জানাইয়া আসিল যদি পার্ব্বতীর মত পরিবর্ত্তন হয়, যদি চাকরি ছাড়িতে

চায়, তিনি যেন না ছাড়েন। বাড়ীতে একা থাকিয়া তাহার মেজাজ বিগড়াইয়া যাইতেছে। এখানে খোকাবাবুকে লইয়া পাঁচজনের কাছে গোলমাল করিয়া থাকিলে সে থাকিবে ভাল।

গৃহিণী আগ্রহের সহিত সম্মতি জানাইলেন। বলিলেন, "বাড়ীতে এখন একটা বাচ্চা চাকর ও বাসন মাজিবার দাইটা ছাড়া কেহ নাই। কানহাইয়ালাল মদ গাঁজার অনুগ্রহে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া দুই মাস পূর্ব্বে চাকরি ছাড়িয়াছে। পার্ব্বতী যদি দিনের মাথায় দু'তিন ঘণ্টার জন্য আসিয়া ছেলে দেখে, তবে যথেষ্ট উপকার।"

সন্ধান লইয়া জানিল মনোরমা এখন কাশীতে। বৃদ্ধা দিদি-শাশুড়ীর কাছে থাকিয়া, কি সব কঠিনতর সাধন-ভজন অভ্যাস করিতেছে। কাযের ক্ষতি হইবার ভয়ে এখন আর সংসারীদের হট্টগোলে আসিতে চায় না। তাহার শ্বশুর দেশে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, বড় বাবু গয়ায় আনিতে চাহিয়াছিলেন, সে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

গৃহিণী খুব দুঃখ করিয়াই কথাটা বলিলেন। কিন্তু কথাটা শুনিয়া খন্তর অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি বোধ করিল। সানন্দে বলিল, "দুঃখ কর্‌বেন না মা, কি হবে সংসারের হট্টগোলে এসে? এ তো কেবল তাঁর ক্ষতি। গোলমালের বাইরে গিয়ে কায কর্‌বার সুবিধা যখন পেয়েছেন, বাধা দেবেন না। কারুর সাধনায় ব্যাঘাত করা মহা অকল্যাণ। দিদি-মণির খবর শুনে বড় খুশী হলুম।"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া হর্ষ-বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় লইল। মনে পড়িতেছিল—নিজের ঐকান্তিক সাধন-নিষ্ঠ পূর্ব্বজীবনের কথা। কেহ শুদ্ধ চিত্তে সাধন ভজনে ব্যাপৃত রহিয়াছে শুনিলে নিজের পূর্ব্ব স্মৃতিটা মনে পড়ে। আবার সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্য মন অধীর হয়।

কিন্তু নিজের ভিতরে বাহিরে এখন অনেক গোলমাল, অনেক দায়িত্ব জুটাইয়া ফেলিয়াছে! মন এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে, তাতে তাকে নিরাসক্ত করা সহজ, কিন্তু নিশ্চিন্ত অসতর্ক করা চলে না।

মনে হইল পার্ব্বতী তাহার জীবনের অঙ্কে আসিয়াছে, আসুক, সে কেন আসক্তির নেশায় মাতাল হইয়াছিল? আসক্তিটা ছাড়িয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিলেই ত বাঁচিত!

অনেক কথা মনে পড়িল। খস্তর নিজ মনে মাথা নাড়িল। চলিবে না, চলিবে না! ইন্দ্রিয়াসক্তির ছিটে-ফোঁটা অবশিষ্ট থাকিতে, চিত্তের ঊর্দ্ধগতি অচল! পার্ব্বতীব মন ও মস্তিষ্ক যে অস্বাস্থ্যকর উপাদানে গঠিত,—আন্তরিক ভাব সংশোধনের জন্য কোন তপস্যায় যখন তাহার প্রবৃত্তি নাই, তখন উহার উপর বিশ্বাস নির্ভরতা রাখা চলে না। করুক সে যাহা ইচ্ছা, করুক সে যত ইচ্ছা খস্তরের কুৎসা। আত্মশুদ্ধির তপস্যা রক্ষার দায়িত্ব খস্তরের নিজের!

সে মাসে মাহিনার টাকা পাইয়া সকলের আগে কিনিল একখানা হিন্দী যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। দেনায় কিছু টাকা দিল, ভাইপো দু'টির পড়ার খরচ কিছু পাঠাইল। বাকী টাকা সংসার খরচের জন্য রাখিয়া, মনকে নিশ্চিন্ত করিল। তার পর প্রাণপণ আগ্রহে সাধন-ভজন শাস্ত্র পাঠে, অবকাশ সময় কাটাইতে লাগিল। পার্ব্বতী কি বলিতেছে, কি করিতেছে, সে সকলে মনোযোগ দিয়া চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটাইতে ইচ্ছা করিল না।

কিন্তু কায কর্ম্মের ফাঁকে সহসা পার্ব্বতীর দিকে লক্ষ্য পড়িলে সশঙ্ক হইত। দেখিত, দিনের পর দিন পার্ব্বতীর চোখে-মুখে একটা রুক্ষ ক্রুর হিংস্র ভাব উগ্র প্রতাপে ফুটিতেছে। কথাবার্ত্তা উত্তরোত্তর অসংলগ্ন হইয়া উঠিতেছে। কাযকর্ম্ম চালচলন কেমন যেন ব্যস্ত বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ।

অকারণে এবং কাল্পনিক কারণে খন্তরের উপর তাহার ক্রোধের মাত্রা উদ্দাম অসংযত হইয়া উঠিতেছে।

কখনও কখনও দেখিত, একা বসিয়া নিজের মনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে তর্জ্জন করিতেছে। খন্তর বিস্মিত হইত। নীরবে চাহিয়া দেখিত, ভাবিত কি অদ্ভুত স্বভাব!

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বাহিরের লোকজনের সঙ্গে আচার ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় পার্ব্বতীকে বেশ সংযত প্রকৃতিস্থ দেখা যাইত। আর একটা ব্যাপারে পার্ব্বতীর প্রখর মনোনিবেশ ছিল,—সেটা রন্ধন ও ভোজন-বিলাসিতার উৎসাহে। রাঁধিয়া বাড়িয়া একে-ওকে ডাকিয়া আনিয়া, খাওয়াইবার আগ্রহ ছিল খুব। সে ব্যাপারে সময় সময় এমন বাড়াবাড়ি হইত যে হতভাগ্য ঋণগ্রস্ত খন্তর অধিকতর ঋণগ্রস্ত হইত। ভয়ে ভয়ে যদি বা কখন প্রতিবাদ করিত, ভোজন-বিলাসের আড়ম্বর কমাইয়া, ঋণ শোধের প্রস্তাব তুলিত, তবে ক্রুদ্ধ পার্ব্বতী রাগে রণমূর্ত্তি ধরিত। খন্তরকে কৃপণ ইতর নাচাশয় বলিয়া গালি দিত। জানাইত, সে দুই টাকা মাহিনায় ঠিকা চাকরি করিতেছে, ইহাই যথেষ্ট। তার পর তাহার যাহা প্রয়োজন, খন্তর যেখান হইতে যে উপায়ে হউক, জুটাইতে বাধ্য। কোথা হইতে কি উপায়ে টাকা যোগাড় করিবে, তাহা সে জানে না। কিন্তু খন্তরকে টাকা জুটাইয়া দিতেই হইবে। নচেৎ তাহার চলিবে না।

লোক-সমাজের নিন্দা বিদ্রূপের ভয়ে স্ত্রীর দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ খন্তর নিঃশব্দে সহ্য করিত। অপরের কথা দূরে থাক, তাহার নিজের ভাই জয়পালও কিছু টের পাইত না। সে মধ্যে মধ্যে আসিত, খন্তর বা পার্ব্বতী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ সবল হয় নাই বলিয়া উদ্বেগ বোধ করিত। উভয়কে

কিছু দিনের জন্য গুজস্তি যাইয়া থাকিতে পীড়াপীড়ি করিত। কিন্তু পার্ব্বতীর সেই দৃঢ় পণ,—নিজেও কোথাও যাইবে না, খন্তরকেও যাইতে দিবে না।

নিজে অশান্তি ভোগ করিতেছে ইহাই যথেষ্ট। ভ্রাতৃপরিবারেও সেই অশান্তির জের টানিতে খন্তরেরও উৎসাহ ছিল না। চাকরির দোহাই দিয়া ভাইকে নিরস্ত করিত।

দিনে দিনে পার্ব্বতীর সহিত তাহার সম্পর্কটা দাঁড়াইল এই, খন্তর না-খাইয়া না-ঘুমাইয়া টাকা আনিবে প্রাণপণে খাটিয়া, এবং পার্ব্বতী তাহার খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য সে টাকা অপব্যয় করিয়া আবার নূতন ঋণ যোগাড় করিবে প্রাণপণ আগ্রহে!

দুঃখের মধ্যে খন্তরের সান্ত্বনা রহিল এই যে, পার্ব্বতী আর কোন দুঃ খেয়ালের দিকে না ঝুঁকিয়া, শুধু তাহার বিলাসিতা, অর্থাৎ অমিতাহার অহিতাহার এবং তার জন্য পাকস্থলীর গোলযোগে ভোগাই আপাততঃ জীবনের পরম সুখ বলিয়া মানিয়াছে। ঔষধপত্র খাওয়াইয়া তাহার অজীর্ণ রোগ দূর করিবার বিস্তব চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। চিকিৎসক হতাশ হইয়া বলিলেন, "আহারের সংযম ব্যতীত উহা ভাল হইবে না।"

বলা বাহুল্য পার্ব্বতী সে কথা গ্রাহ্য করিল না।

বহুবর্ষের সাধনায়, নিজের যে সুদৃঢ় ঘাতসহ, কঠিন শ্রমপটু স্বাস্থ্য খন্তর সঞ্চয় করিয়াছিল, কয়েক মাসের অত্যাচারে তাহা সেই-যে ভাঙিল, আর তেমন ভাবে সুগঠিত হইল না। পিতামাতার দীর্ঘকালব্যাপী সংযম পুণ্যের দান, দেহটা কোনরূপে টিকিল। কষ্টে সৃষ্টে কার্য্যক্ষম হইল বটে,—কিন্তু আজকাল মাত্রা ছাড়াইলে কিবা পরিশ্রম কিবা শীত গ্রীষ্ম বর্ষার প্রকোপ, আগের মত আর সহ্য হইত না। সহজেই অসুস্থ হইত।

পার্ব্বতীর চালচলন দেখিয়া সময় সময় মন গভীর বেদনার অবসাদে ডুবিত। চাকরির খাটুনি খাটিয়া আসিয়া, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংহত করিবার জন্য বাকী সব সময় নীরবে শাস্ত্র-চর্চ্চায় ও ভগচ্চিন্তায় নিযুক্ত থাকিত।

লোকে বলিত, "সাগা করিয়াও খন্তর শুধ্রাইল না।"

পার্ব্বতী বলিত, "বিবাহিত জীবনে খন্তরের এই সংযম ও সাধন-ভজন —আদ্যোপান্ত দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতার নিদর্শন।"

কটু মন্তব্য শুনিতে শুনিতে সময় সময় মন মুহ্যমান হইত! বেদনা-ভরা দৃষ্টি ঊর্দ্ধে তুলিয়া খন্তর মনে মনে প্রশ্ন করিত, "মানুষের বিচার ত এই পর্য্যন্ত! নারায়ণ, তোমার বিচার?"

৩১

পর বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের কথা।

কয়দিন হইতে অসহ্য গরম পড়িয়াছে। অতিরিক্ত গরমে অসুস্থ হইয়া কয়জন মিস্ত্রী ছুটি লওয়ায় খন্তরের উপরি-খাটুনি খুব বাড়িল। দিন রাত্রির অধিকাংশ সময় কর্ম্মক্ষেত্রে কাটাইতে লাগিল।

দারুণ সন্দেহে পার্ব্বতী মারমূর্ত্তি ধরিল! ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় সে এমন কাণ্ড করিতে লাগিল যে, পাড়া প্রতিবেশীদেরও কাণে সংবাদ পৌছিতে লাগিল। যে শনিচর-দম্পতী একদিন পার্ব্বতীর পক্ষে ওকালতি করিবার সময়, তাহার পত্নীজনোচিত আদর-যত্ন না পাওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল, তাহারাই আজ বিরক্ত হইয়া বলিল, "নেয়ের কুকুর মাথা উঠে। পার্ব্বতীর মত কাণ্ডজ্ঞানহীন পত্নীকে অতটা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নাই।

খন্তরের অত্যধিক আদর-যত্নেই পার্ব্বতীর মেজাজ বিগড়াইয়াছে। একেবারে 'আহ্লাদে গোপাল' হইয়া উঠিয়াছে।"

সহিষ্ণু সুমার অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "ভেইয়ার পেটে বিদ্যা আছে, তাই অতটা সহ্য করে। আমি হইলে মারিয়া উহার হাড় গুঁড়া করিতাম। নেক্‌ড়ে বাঘ লাঠির চোটে সিধা হয়। রামলীলা শুনিয়া ভক্তি-বিগলিত হইবার পাত্র নয়।"

বাস্তবিক পার্ব্বতীর প্রকৃতিটা দিনে দিনে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মতই হিংস্র-অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল।

খন্তর অতিষ্ঠ হইল!

উপরওলা ডাক দিলেন। জানাইলেন, "টেলিগ্রাম আসিয়াছে। ধানবাদে একজন সুদক্ষ মিস্ত্রী পাঠাইতে হইবে। উচ্চ বেতনে দিন কুড়ি পঁচিশের জন্য খন্তর যাইতে প্রস্তুত আছে কি?"

খন্তর অভিবাদন করিয়া সম্মতি জানাইল। দেনা মজুত, পরিশোধের জন্য টাকা চাই। সত্যই ত, যদি কাল মৃত্যু হয়?

এবার পার্ব্বতীকে কিছু জানাইল না। তাহার খরচপত্র শনিচরের মাতার হাতে দিল। পার্ব্বতীকে দেখাশোনা করিবার ভার তাহাদের উপর রাখিয়া নিজের জিনিষপত্র লইয়া নিঃশব্দে পলাইল।

কিন্তু পঁচিশ দিন পরে ফেরা গেল না। একটার পর একটা জরুরি কায আসিল। তাহার দক্ষতায় এবং শ্রমকুণ্ঠাহীনতায় কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলেন। উচ্চ বেতন উচ্চতর হইল, খন্তর আটক পড়িল।

পার্ব্বতীর ঘোরতর অশান্তিকর সংস্রব ছাড়িয়া নূতন স্থানে আসিয়া খন্তর যেন নবজীবন লাভের স্ফূর্ত্তি প্রফুল্লতা বোধ করিল। মানসিক শান্তিতে নিরুদ্বেগে আহার, নিদ্রা, পরিশ্রম করিবার সুযোগ পাইয়া,

খুব সন্তর্পণে তিনি পার্ব্বতীর চালচলনের, আহার নিদ্রার গোলমালের সম্বন্ধে কতকগুলা কথা বলিলেন।

খস্তর কিছুমাত্র বিস্ময় বোধ করিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এ স্বভাব তো বরাবরই ছিল। নতুন নয়। ডাক্তার বলেছিলেন—বিষাক্ত রক্তের জন্য মাথার গোলমাল আছে।"

পার্ব্বতী বাহিরে আসিল। অকারণ চঞ্চলতায় আঙিনায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বৃদ্ধা বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্‌? বরাবর কি এতটা ছিল?"

খস্তর প্রশান্ত ধৈর্য্যে পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিতে করিতে নিম্নস্বরে বলিল, "ছিল। এতটা নয়। আমি বেকুব, আগে মোটে বুঝ্‌তে পারি নি। উঃ, এক একটা খেয়াল নিয়ে, আমার প্রাণান্ত ঘটাবার যো করেছে। কি দিনই গেছে, এক একটা—কি বল্‌ব?"

দূর হইতে হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে পার্ব্বতী ধমক দিল, "রাত হয় নি? খেতে শুতে হবে না?"

"আমি গাড়ীতে খেয়ে এসেছি। শুধু এক গ্লাস জল দাও। যাও চাচি, শোও গে।"

বৃদ্ধা সন্ত্রস্ত হইয়া নাতিকে উঠাইয়া বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিলেন। খস্তর বাধা দিল। জানাইল তাহার সঙ্গে বিছানা আছে, পাশের ঘরে সে থাকিবে। বৃদ্ধা নাতিকে লইয়া যেখানে ছিলেন স্বচ্ছন্দে থাকুন।

পাশের ঘরে গিয়া সে বিছানা পাতিল। পার্ব্বতী থর চরণে আসিয়া এক গ্লাস জল রাখিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। খস্তর বলিল, "যেও না। বসো, কথা আছে।"

দু' চক্ষু পাকাইয়া, কতকগুলা ঘৃণিত কটূক্তি করিয়া পার্ব্বতী পাশের

ঘরে গেল। বৃদ্ধার সহিত তাহার কি একটা অস্পষ্ট কথাবার্ত্তার শব্দ পাওয়া গেল।

বৃদ্ধা তিরস্কার করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন, "হ্যাঁরে খন্তরা, বহুকে তাড়িয়ে দিলি কেন? এতদিন নিয়ে ঘর সংসার করলি, এখন ওকে পছন্দ হচ্ছে না বলেছিস্?"

বৃদ্ধা প্রকারান্তরে আরও জানাইলেন বধূ অভিযোগ করিতেছে, খন্তরের দুশ্চরিত্রতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এইমাত্র সে স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছে! —খন্তরের একটা প্রণয়িনী না কি ঘরে লুকাইয়া রহিয়াছে!···স্বচক্ষে দেখা,···অতএব মিথ্যা নয়!

খন্তর স্তম্ভিত!···যাক, পার্ব্বতীর অশেষবিধ উন্নতি হইয়াছে! ক্রূর সন্দেহে শানাইয়া শানাইয়া, এবার তাহার ঘনীভূত মনোবৃত্তি, বাতাসেও সাকার মূর্ত্তি দেখিতে সুরু করিয়াছে।

কণ্ঠ শুকাইয়া গেল। একটু জল খাইয়া ক্ষুব্ধ ভাবে বলিল, "তুমি বুড়ো মানুষ, আমাদের মা। কি আর বলব? দুঃখ এই, তুমিও ওর মিথ্যা কথা বিশ্বাস করলে?"

বৃদ্ধা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, "তাই ত বলি, খন্তর আমাদের সে ছেলেই নয়! পাগলী বলে কি? যা বাবা, বুঝিয়ে-পড়িয়ে ডেকে নে। দেখ, তোকে দেখে যদি ঠাণ্ডা হয়। বল, পাঠিয়ে দিই?"

একটু ভাবিয়া অধোমুখে খন্তর বলিল, "দাও।"

বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন।

একটু পরে পার্ব্বতী আসিল। কট্‌মট্ চক্ষে একবার খন্তরের দিকে তাকাইয়া, ঘরের এক কোণে গিয়া মুড়ি দিয়া শুইল।

খন্তর গিয়া নিকটে বসিল। সশঙ্ক চিত্তে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া

রহিল। কোন কথা বলিলে পাছে পার্ব্বতী রাগিয়া চেঁচাইয়া গোলযোগ করে, দুর্ভাবনা হইতেছিল।

পার্ব্বতী অস্থির-চাঞ্চল্যে ছটফট করিতে লাগিল। ফিস্ ফিস্ করিয়া অস্ফুট স্বরে ঠাকুর দেবতা এবং ভূত প্রেতগণের উদ্দেশে নানা কথা বলিতে লাগিল।

পুরাতন অভ্যাস! মাত্রাটা উগ্রতর—পার্থক্য এই।

খন্তর নিঃশ্বাস ছাড়িল। ডাক্তারের মন্তব্য বার বার মনে পড়িতে লাগিল।…অভাগিনী! কাহার পাপের দণ্ড কে ভোগ করে! উহারও কর্ম্মফল!

পার্ব্বতী আড় চোখে চাহিয়া বারকতক তাহাকে দেখিল। হঠাৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ধমক দিল, "উঠে যাও এখান থেকে।"

খন্তর সবিনয়ে বলিল, "তুমিও চল।"

"না, যাব না। বেরোও বল্‌ছি।"

খন্তর অতি নম্রভাবে তাহার বিদেশ যাবার কৈফিয়ৎ—বাজার দেনা, ডাক্তারখানার দেনা, ইত্যাদি নানা কথা তুলিল। পার্ব্বতী কোন কথায় কাণ দিল না, হিংস্র আক্রোশে শুধু কটূক্তি করিল।

খন্তর নিজের সঙ্গত অসঙ্গত সব অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিল। পার্ব্বতী তাহার কাল্পনিক লাম্পট্যের বিরুদ্ধে কুৎসিত মন্তব্য করিল।

খন্তর তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "চল, তোমার মাথা ধুয়ে দিই।"

অস্বাভাবিক শক্তির সহিত প্রচণ্ড ঝট্‌কা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া পার্ব্বতী খন্তরের চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্দেশে জঘন্য গালাগালি দান করিল।

খন্তর অসীম ধৈর্য্যে নির্ব্বাক। পার্ব্বতীকে যাহাই বলা যাক, সে শুনিবে না। শুধু ক্ষিপ্ত-উত্তেজনা বাড়িবে মাত্র, বুঝিল। অগত্যা নিরস্ত হইল। মাথা ধুইয়া নিজের বিছানায় গিয়া শুইল।

কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। পার্ব্বতী ক্ষণে ক্ষণে শুইয়া বসিয়া, দাঁড়াইয়া ছুট্‌পাট্ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুয়ার খুলিয়া গিয়া আঙিনায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল। আবার আসিয়া পূর্ব্বস্থানে শুইল। উৎকণ্ঠিত খন্তর বিনিদ্র নয়নে তাহার আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল। নিঃশব্দ যন্ত্রণায় মর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল! উঃ পার্ব্বতীর জ্ঞান-বুদ্ধি সব লুপ্ত! জীবনের কি শোচনীয় অবস্থা!

ভোরের দিকে পার্ব্বতী ঘুমাইয়া পড়িল। খন্তর নিঃশব্দে বাহিরে আসিল।

বৃদ্ধা বাহিরে বসিয়া ছিলেন। খন্তরের মুখপানে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন। দুঃসহ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, এবং অব্যক্ত মর্ম্মভেদী যাতনায় একরাত্রে খন্তরের বয়স যেন পাঁচ বৎসর বাড়িয়াছে!

সহানুভূতি-কোমল কণ্ঠে বৃদ্ধা বলিলেন, "আহা মরে যাই বাছা, তোর বরাত!···ভাবিস্ নি, ওঝা বলেছে ও আবার ভাল হবে।"

কি দুর্ল্লভ আশ্বাস! ব্যাকুল হইয়া খন্তর বলিল, "কোন ওঝা?"

বস্তির প্রান্তে যে ধূর্ত্ত লোকটি শিকড়-বাকড় তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে লোক ঠকাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিত, তাহার নাম করিয়া বৃদ্ধা জানাইলেন সে গণিয়া-গাঁথিয়া বলিয়াছে, পার্ব্বতীকে এক শক্তিশালী পিশাচ আশ্রয় করিয়াছে। শনিচর তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া সুলভ মূল্যে পিশাচ ছাড়াইবার ব্যবস্থা করে। ওঝা টাকা লইয়া কি সব ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, পার্ব্বতীকে একটা তেল মাখাইতে দেন। কিন্তু ফল হয় নাই। কিন্তু ওঝা প্রবল দর্পে জানাইয়াছেন পার্ব্বতী সুস্থ হইয়াছে। যেটুকু দুষ্টামি করিতেছে, স্বামীর সহিত মিলন হইলে,—উহা দূর হইবে।

খন্তর ক্ষুব্ধ যাতনায় ঘৃণাভরে নির্ব্বাক রহিল।···শুধু পার্ব্বতী একা বিকৃত-মস্তিষ্ক নয়। ইহাদের সকলেরই মস্তিষ্ক আংশিক ভাবে বিকৃত!

এই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বর্ব্বরগুলার নিকট রোগের হেতুও যেমন সুলভে আবিষ্কৃত, প্রতিকার ব্যবস্থাও তেমনি সহজে নির্দ্ধারিত !

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পিশাচ ?···হবে। কিন্তু ডাক্তার অনেক আগে রোগটা ধরেছিলেন, যাই তাঁর কাছে।"

সংক্ষেপে স্নানাহ্নিক সারিয়া আসিয়া থন্তর বাড়ী ঢুকিল। দেখিল পার্ব্বতী জাগিয়াছে। শান্ত শিষ্ট ভাবে বাসন মাজিয়া, ঘর-দুয়ার ঝাঁট দিতেছে। উন্মত্ততার কোন চিহ্ন নাই।

অভাগা বুঝিল না, গভীর নিদ্রার পর উন্মাদগণ কিছুক্ষণ শান্ত সুস্থ ভাবাপন্ন থাকে।

আশাতীত আনন্দে বলিল, "ও সব থাক। বিশুয়ার মা আসে নি এখনো ? তাকে ডেকে দিচ্ছি। তুমি নাও, খাও।"

পার্ব্বতী কঠোর দৃষ্টিতে চাহিল। জবাব দিল না। নিজ মনে কাব করিতে লাগিল।

থন্তর পুনশ্চ বলিল, "আমি ডাক্তার আন্‌তে যাচ্ছি। তুমি নেয়ে এস। আগে চিকিৎসেপত্র করে সুস্থ হও—"

উগ্র গর্জ্জনে পার্ব্বতী বলিল, "চিকিৎসে ? কেন ? কি হয়েছে আমার ? আক্রোশ করে আমায় পাগল বল্‌ছ ? ফাঁশি দেবে ?"

অসংলগ্ন ভাষায় নানা কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

থন্তর ন্যায়ধর্ম্মের দোহাই দিল। তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, পার্ব্বতীর প্রতি তাহার কিছুমাত্র আক্রোশ থাকা অসম্ভব। কাহাকেও ফাঁশি দিবার অধিকার তাহার আদৌ নাই।—কিন্তু কে শোনে ? যুক্তি-তর্ক মানিবার মত, পার্ব্বতীর মস্তিষ্কের অবস্থা নয়।

থন্তরের প্রত্যেক কথার উত্তরে সে ভয়াবহ মূর্ত্তিতে উত্তরোত্তর উগ্র উত্তেজিত হইতে লাগিল। কুৎসিত কটূক্তি করিতে লাগিল।

খন্তর বিপদে পড়িল। সে সরিয়া পড়িলে যদি পার্ব্বতী শান্ত হয়, এই ভরসায় তাড়াতাড়ি বাহির হইল।

পথে শনিচরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সময়োচিত কথাবার্ত্তার পর সে তীব্র তিরস্কার করিল। বলিল, "ও তো পাগল হোত না। তুই ওকে পাগল করেছিস্। তোর দোষেই ও পাগল হোল!"

দুর্ব্বল মস্তিষ্কের সুলভ বিচার! অবিবেচকের সদম্ভ বিবেচনা সশব্দে ঝঙ্কৃত হইল!

হতবুদ্ধি খন্তর অভিভূতপ্রায়!

মনে পড়িল এই শনিচর একদিন এমনই দম্ভের সহিত বাজি রাখিয়া বলিয়াছিল, 'যে কোন একটা মেয়েকে বধূরূপে ঘরে আনিলেই খন্তরের পরম কল্যাণ হইবে!'·· মনে পড়িল, পার্ব্বতীর যথেচ্ছাচার আদর্শের সে যখন প্রতিকূলতা করিয়াছিল, তখন ইহারাই পার্ব্বতীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল। পার্ব্বতীর যথেচ্ছাচারের নিকট তাহার সদাচার আদর্শ বলিদানে ইহারাই আংশিকভাবে তাহাকে বাধ্য করিয়াছিল!·· ফল?···

উহাদের জ্ঞানবুদ্ধির পরিমাণ যতটা, উহারা ততটাই বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, এবং করিবে। উহাদের অভিনব বিচারপদ্ধতি লইয়া উহারা আস্ফালন করুক, নিরুপায়!

বিশুয়ার মাকে ডাকিতে গেল, সে জানাইল পার্ব্বতী তাহাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়াছে। খন্তর অনুনয় করিয়া তাহাকে পুনরায় কাযের জন্য পাঠাইল। নিজে ডাক্তারের কাছে ছুটিল।

রোগীরা কেহ তখনও আসে নাই। ডাক্তার একা বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত-ব্যাকুল খন্তরকে দেখিয়া চমকিত হইলেন। বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

খন্তর এক নিঃশ্বাসে সমস্ত সংবাদ বলিয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন, "আমি প্রথম দেখেই বুঝেছিলাম, তুমি পাগলা গারদের আসামীর পাল্লায় পড়েছ। বলেছিলাম নয় ?"

তীব্র ক্লেশের সহিত খন্তর বলিল, "হাঁ। সেই জন্যেই আগে আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু ওরা কেউ বল্‌ছে পিশাচ আশ্রয় করেছে, কেউ বল্‌ছে—আমার দোষ !"

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিল।

ডাক্তার নিঃশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন "হাঁ, এ ক্ষেত্রে পিশাচই বটে। তার নাম, পারার বিষ !"

"তাহলে আমার,—আমার অপরাধ ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "নিষ্কপট ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা, সদাচার নিষ্ঠাশীলা হিন্দু বিধবা অনেক ঘরেই আছেন। খোঁজ নাও, সংযম-দৃঢ়তায় ক'জনের মস্তিষ্ক বিকৃত ?"

খন্তর স্তব্ধ। দপ্‌ করিয়া মনশ্চক্ষের সামনে প্রথমে জাগিল—মনোরমার প্রশান্ত পুণ্যোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি !...

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "আসল কথা অসংযতচিত্ত মানুষ, নানা উপায়ে নিজেকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে পারে। মানি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। কিন্তু ইহজন্মের কর্ম্মদোষও প্রত্যক্ষ ফলদাতা। মদ, গাঁজা, জুয়া,

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তি,—ত্যাখো পাগলা গারদের অধ্যক্ষের রিপোর্ট ;—
'অসংযত-ক্রোধের শেষ ফল, পরিণামে—অনেক মানুষ দুর্দান্ত উন্মাদ !'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ডাক্তার বিষাদভরে হাসিলেন। বলিলেন, "কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের বিচার-বুদ্ধি কি ভয়ানক! সংযমের ফলে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়? তাহলে শাস্ত্র মিথ্যা! বিজ্ঞান মিথ্যা! ···মানুষ ক্ষিপ্ত হয়—অসংযমে। যাও জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের কাছে, কর খানাতল্লাসী রোগীর মনবুদ্ধির অবস্থা। দেখবে অশুভ শনির কোপপীড়িত চন্দ্র, ওর মনকে উচ্ছৃঙ্খল অসংযমী ভাবাপন্ন নির্দ্দেশ কর্‌ছে। বুদ্ধির অধিপতি হয় অসুস্থ, নয় দুর্ব্বল। কোষ্ঠি গুরুচণ্ডালী যোগযুক্ত। যাও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কাছে, শুন্‌বে গোড়ার কথা—"তমোগুণের আতিশয্য ভিন্ন কেউ পাগল হয় না!"

খন্তর নির্ব্বাক। তাহার অনিদ্রা-পীড়িত দৃষ্টিতে, বেদনাভার-ক্লান্ত আকুল মানসিক-উদ্‌ভ্রান্ততার চিহ্ন ফুটিল।

ডাক্তার তাহার পিঠে হাত রাখিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "খন্তর, তোমার অনুভূতি তীব্র। সাবধান! মানসিক যন্ত্রণায় পাগল হলে ত তোমার চল্‌বে না। আত্মসংযমী হও।"

মাথা নাড়িয়া ভগ্ন বিকল কণ্ঠে খন্তর বলিল, "অসহ্য উদ্বেগ উৎকণ্ঠাপূর্ণ রাত্রি যাপন করেছি। এমন অবস্থা জীবনে কখনো আসে নি। মায়ের মরণেও না,—স্ত্রীপুত্রের মরণেও না।··· এ যে—মরার বাড়া গাল! ডাক্তারবাবু একবার চলুন, দেখুন। যা-হোক চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। আমার আফসোস্ মিটে যাক্!"

ডাক্তারকে লইয়া বাড়ী আসিয়া দেখিল ঘর দুয়ার সমস্ত খোলা। গোটাকতক ছাগল ও কুকুর উঠান হইতে শোবার ঘর পর্য্যন্ত নির্ভয়ে চরিয়া বেড়াইতেছে। পার্ব্বতী নিরুদ্দেশ!

ডাক্তারকে বসাইয়া পার্ব্বতীর সন্ধানে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। শনিচরের বধূ বিরক্ত হইয়া জানাইল, পার্ব্বতীর তত্ত্বাবধান করা তাহাদের সাধ্যাতীত। সে এবং বিশুয়ার মা গিয়াছিল। পার্ব্বতী ঘৃণিত কটূক্তি করিয়া, প্রহার দিয়া তাহাদের তাড়াইয়াছে। তার পর কোথা গিয়াছে, কি করিয়াছে,—তাহারা জানে না।

নানা স্থানে খোঁজ করিল। শেষে বড়বাবুর বাড়ীতে পার্ব্বতীকে পাইল। সে তখন গৃহিণীর কাছে উত্তেজিতকণ্ঠে অভিযোগ করিতেছিল—খন্তরের ব্যভিচারের অত্যাচারে সে অতিষ্ঠ হইয়াছে। শনিচরের মাতা, বধূ—এমন কি বিশুয়ার মা পর্য্যন্ত সকলেই খন্তরের গুপ্ত প্রণয়িনী। পার্ব্বতীকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার ঘর গৃহস্থালী সব দখল করিয়া লইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি—বিবিধ অদ্ভুত সংবাদ!

কলুষিত মনোবৃত্তির কি তীব্র উৎপীড়ন! জঘন্য কল্পনার হিংস্র দংশনে, তাহার চিত্তের অবস্থা অতি ভয়ানক প্রতিহিংসায় আক্রোশ-ক্ষিপ্ত!

গৃহিণী ভদ্র কন্যা। এই সব কুৎসিত প্রসঙ্গের উত্তরে স্তব্ধ নির্ব্বাক রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অদূরে বসিয়া একটা নিম্নশ্রেণীর নারী, উল্লসিত-কৌতুকে লুটাপুটি খাইয়া হাসিতেছে। মহা আহ্লাদে নানারূপ কঠিন বিদ্রূপ করিতেছে। পার্ব্বতী আরও উত্তেজনা-ক্ষিপ্ত হইতেছে। স্ত্রীলোকটি আরও রঙ্গভঙ্গ করিতেছে!

খন্তর নিকটে আসিয়া চিনিল—স্ত্রীলোকটি সেই গয়লাবুড়ির বোনঝি। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

ইহার আজ ব্যর্থ আক্রোশ চরিতার্থতার শুভদিন আসিয়াছে বটে! এ তো মহৎ শত্রু নয়,—নীচভাবে প্রতিহিংসা সাধন করিবে বই কি!··· নীচতা ছাড়া ইহারা জানে কি?

খন্তরকে দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইল। দুধের যোগান দিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল।

খন্তর অনেক অনুনয় বিনয় করিল, গৃহিণীও অনুরোধ করিলেন—পার্ব্বতী বাড়ী ফিরিল না। গৃহিণীর সামনে, তাহার গালাগালির বহর ভয়ানক অসংযত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া খন্তর অতিশয় বিব্রত হইল। বাড়ী ফিরিয়া হতাশভাবে ডাক্তারকে বিদায় দিল।

মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল, অতঃপর সারাটা জীবন কি করিবে? অন্নচেষ্টা, না পার্ব্বতীর তত্বাবধান?

সুমার আসিয়া বলিল, "চল্ আজ আমার ঘরে খাবি।"

ম্লান হাসিয়া খন্তর মাথা নাড়িল—না। পার্ব্বতীর সন্দেহ অতি ভয়ঙ্কর হিংস্র ক্রূর! খন্তর ওখানে খাইতে যায় ত পার্ব্বতী এখনি সুমারের মাতা পত্নীর সম্মান আক্রমণ করিয়া কদর্য্য কটূক্তি করিবে। সে এখন নিজের শত্রুতা সাধনে,—আত্মীয় স্বজনের শত্রুতা সাধনে সিদ্ধহস্ত।

সুমারের তাড়ায় খন্তর নিজেই রুটি তরকারি করিল। পার্ব্বতীকে খাইবার জন্য ডাকিতে গেল, তিন ঘণ্টা বসিয়া সাধিল। পার্ব্বতীর মস্তিষ্কে কি একটা খেয়াল চড়িয়াছিল। এবার সে কথাও কহিল না, খাইতেও আসিল না। গৃহিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "তুমি যাও বাছা, আমি ওকে বুঝিয়ে দেখি। এখানে পারি ত খাওয়াব।"

অতীতের অনেক কথা, পার্ব্বতীর উদ্দাম মায়া মমতা, সেবা যত্ন,—অন্ধ উন্মত্ত অনুরাগস্মৃতি, মনশ্চক্ষের সামনে উদয় হইয়া আজ নিষ্ঠুর পরিহাসে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল! সে উদ্দামতা, সে উত্তপ্ত অনুরাগ-উচ্ছলতা আজ যেন ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল—"হিসাব লও, হিসাব লও! সেগুলা প্রকৃতিস্থের অপ্রমত্ত স্বাস্থ্য-সুন্দর চিত্তের প্রেমের

দান নয়। উহা আত্মোপান্ত—এই অস্বাস্থ্য-পীড়িত মস্তিষ্কের উত্তেজনা কুহকের খেয়াল!···তাই অত উদ্দাম অনাচার···।”

অনিদ্রায় উগ্র-দুশ্চিন্তায় খন্তরের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। কোন রকমে কিছু খাইয়া শুইয়া পড়িল। আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

ক্লান্ত অবসন্ন মস্তিষ্কে ধীরে তন্দ্রাঘোর আসিল।

সহসা প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা দিয়া কে দুয়ার খুলিল! খন্তরের মস্তিষ্কে সে শব্দ যেন বজ্রঝঞ্ঝনার মত বাজিল! যন্ত্রণাসূচক একটা শব্দ করিয়া চাহিল,—দেখিল ক্রোধোন্মত্ত মূর্ত্তিতে পার্ব্বতী ঘরে ঢুকিতেছে!

স্মরণ হইল, মানসিক উৎকণ্ঠায় সদর দুয়ারে খিল দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

কয়দিন বৃষ্টি হয় নাই, ভয়ানক গুমট। এই প্রখর রৌদ্রে তাতিয়া পুড়িয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক পার্ব্বতীকে আসিতে দেখিয়া খন্তর উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

পার্ব্বতী বিনাবাক্যে ঝড়বেগে আসিয়া তাহার গায়ের চাদরখানা উল্টাইয়া ফেলিল। বিছানার চাদর উল্টাইল, তোষকের চার কোণ তুলিয়া দেখিল। তক্তপোষের তলায় উঁকি দিল। সর্ব্বত্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। শেষে আনলার কাছে গিয়া, খন্তরের জামার পকেটগুলা খুঁজিতে লাগিল।

খন্তর শান্তভাবে বলিল, “কি খুঁজ্‌ছ?”

উত্ত্যক্ত কঠোর-কণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, “মেয়েমানুষটাকে লুকুলে কোথায়, তাই দেখ্‌ছি। এখানে লুকিয়েছিলে কি?”

“জামার পকেটে? মানুষ?···মানুষ খুঁজছ?”

“হুঁ।—আমাকে দেখে কোথা লুকুলে তাকে?”

অযৌক্তিকতা বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। খস্তর নীরবে বালিশে মুখ গুঁজিল। ভয়ানক হতাশা বোধ হইল!

পার্ব্বতী ছুটিয়া আসিয়া খস্তরের পিঠে প্রবল ধাক্কা দিল। উগ্রভাবে বলিল, "ওই বাচাল মেয়েগুলো বড়বাবুর বাড়ী গিয়ে এত হাস্‌ছিল কেন? কি বলেছ তাদের?"

"কিছু না। এস, ঠিক দুপুরের সময় ঘুমোও একটু"—পার্ব্বতীর হাত ধরিয়া খস্তর নিকটে বসাইবার চেষ্টা করিল।

উন্মাদের দেহে দৈত্যবল আবির্ভূত হয়। এক টানে খস্তরের সুদৃঢ় মুষ্টিবন্ধন ছাড়াইয়া লইয়া পার্ব্বতী কটূক্তি করিল। উগ্র জিদের স্বরে বলিল, "কেন তারা অত হাসাহাসি কর্‌ছিল? বল কেন? কি বলেছ তাদের?..."

কথার উত্তর পাইবার জন্য পার্ব্বতী পুনঃ পুনঃ জিদ করিতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া খস্তর বিনীতভাবে বলিল, "কি মুস্কিল! আমি ঘরে ঘুমুচ্ছি, কে কোথায় কেন হাস্‌ছে—আমি তার কি জানি?"

পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে স্নানাহার করিয়াছে। কিন্তু মুখে চোখে যেন উগ্র অসন্তোষের রূঢ় জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনে একটা বীভৎস কঠোর ভঙ্গী। দৃষ্টিভঙ্গী এত ভীষণ যে চাহিয়া দেখিতেও আতঙ্ক হয়!

দাঁতে দাঁত চাপিয়া পার্ব্বতী ক্রূর কণ্ঠে বলিল, "তুমি তাদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি কর নি? খানকাই তারা হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছিল? কেন দিচ্ছিল?"

অপরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন! কাণ্ডজ্ঞান পার্ব্বতীর লোপ পাইয়াছে, কোন যুক্তি-তর্কের অর্থ বুঝিবে না। উত্তর দেওয়া বিড়ম্বনা।

দু'হাতে নিজের কপাল চাপিয়া, ক্লিষ্ট মুখে খস্তর বলিল, "মাথায় যন্ত্রণা

হচ্ছে, কাল রাত্রে ঘুমুতে পাই নি। তুমি স্থির হয়ে একটু শোও, আমি ঘুমিয়ে বাঁচি।"

পার্ব্বতী উত্তর দিল না। ভ্রূকুটি-বদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

যদি কোন সূত্রে পার্ব্বতীর মনে করুণ রসের উদয় হয়,—যদি তাহার মনের এই একরোখা ঔদ্ধত্যের উত্তেজনা অন্ততঃ সাময়িকভাবেও শান্ত হয়,—সংশোধিত হয়,—এই ভরসায় মৃদু অনুযোগের সুরে খন্তর বলিল, "এত দিনের পর বাড়ী এলুম, এম্নি করে অশান্তি দিচ্ছ।…খাওয়ার সময়ও একবার দেখ্‌লে না?"

"দেখার গরজ?"

"আগে কোন গরজে দেখ্‌তে?"

"ছিল গরজ, তাই দেখতুম। এখন তুমি আমার কে?"

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া খন্তর বলিল, "কেউ নই, না? কেন পাগ্‌লামো করছ? নিজে রণমূর্ত্তি ধরেছ, সবাইকে যাচ্ছেতাই কর্‌ছ। কাণে শুন্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়, আমার নামে এমন সব কুৎসিত বদনাম রটাচ্ছ? এতে আমার কষ্ট হয় না?"

তীব্র আক্রোশে ক্রূর কণ্ঠে পার্ব্বতী বলিল, "কষ্ট হবার জন্যেই কর্‌ছি এসব! এখন হয়েছে কি তোমার? আরও ঢের শাস্তি দেব।"

কুৎসিত ভেংচি কাটিয়া কাটিয়া বলিল, "লোকে মনে করে তুমি বড় সৎ, বড় চরিত্রবান!…গায়ে আমার বিষ ছড়িয়ে দেয়, মাথায় আগুন জ্বলে! অত সুখ্যাতি? সইতে পারি না, পারি না। সব্বাইকে এবার বলে বলে বেড়াব,—আমি নিজের চোখে দেখেছি, তুমি ভয়ানক দুশ্চরিত্র!… হাঁ বল্‌ব! বেশ কর্‌ব, বল্‌ব! তোমার মুখ পোড়াব, তবে আমার নাম!"

শুধু পাগ্‌লামি নয়, ঈর্ষা-বিদ্বেষ-প্রতিহিংসাজাত নষ্টামিও যথেষ্ট! তমোগুণের আধিক্য কি ভয়ানক!

একটু বিরক্তির সহিত শ্বশুর বলিল, "মারধোর, গালমন্দ---এসব ইংরামি আমার দ্বারা হবে না। এমন উপদ্রব কর ত সব ফেলে চম্পট দেব। তোমার কোন সম্পর্কে থাক্‌ব না।"

পার্ব্বতী হঠাৎ শান্ত হইল। কঠিন গাম্ভীর্য্যে বলিল, "বেশ, বেশ—তাই হবে। বক্‌ বক্‌ কোর না, ঘুমতে দাও।"

বালিশ লইয়া ঘরের মেঝেয় শান্তশিষ্ট ভাবে শুইল।

যদি ঘুমায়, যদি উত্তেজনাক্ষিপ্ত মস্তিষ্ক একটু শান্ত হয়, এই ভরসায় শ্বশুর বিনাবাক্যে তৎক্ষণাৎ চোখ বুজিল।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

পার্ব্বতীর উন্মাদ মস্তিষ্কে কি হিংস্র-আক্রোশ জাগিল কে জানে। নিঃশব্দে উঠিল।—হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া প্রচণ্ড শক্তিতে শ্বশুরের বুকে মাথায় মুখে কিল চড় বর্ষণ করিতে লাগিল। ভয়াবহ উগ্র কণ্ঠে বলিল, "টের পাচ্ছি না মনে করেছ? সব—সব টের পাচ্ছি।—এখান থেকে চুপি চুপি তাদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করছ? কেন—কেন—কেন?"

ব্রহ্মতালুতে হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত বাজিল,—নিমেষে শ্বশুর সংজ্ঞা হারাইল! পার্ব্বতী কি করিতেছে ক্ষণকাল কিছুই বুঝিতে পারিল না। —যখন চেতনা ফিরিল, তখন অনুভব হইল,—বুকে পিঠে পার্ব্বতীর খাড়ু পৈঁছা সমেত হাতের কঠিন আঘাত বাজিতেছে!

আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় উঠিল। অতি কষ্টে পার্ব্বতীর হাত দু'টা ধরিল।

কিন্তু উন্মাদের ভীষণ পরাক্রমের নিকট, তাহার মত বলিষ্ঠ ব্যক্তিরও সব শক্তি পরাস্ত হইল। আঁচড় কামড় লাথির সাহায্যে পার্ব্বতী তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিল।

শ্বশুর চীৎকার করিয়া সুমারকে ডাকিল।

ঘুম ভাঙিয়া পিতাপুত্র ছুটিয়া আসিল। পার্ব্বতীকে বাঁধিল। ইঁদারা হইতে বাল্‌তি বাল্‌তি ঠাণ্ডা জল আনিয়া তাহার মাথায় ঢালিল। পার্ব্বতী কদর্য্য ভাষায় চীৎকার করিয়া গালাগালি দিতে লাগিল।

সোরগোল শুনিয়া পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল। কেহ ব্যঙ্গ করিল, কেহ বিদ্রূপ করিল, কেহ কৌতুক দেখিতে লাগিল!

মাথার যন্ত্রণায় হতবুদ্ধি বিহ্বল খন্তর কি ব্যবস্থা পার্ব্বতীর জন্য করিবে ভাবিয়া পাইল না। বৃদ্ধকে বলিল "ছোট ডাক্তার বাবুকে ডাক।"

সুমারের পিতা ছুটিলেন। একটু পরে আসিয়া জানাইলেন উর্দ্ধতন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার আসিতেছেন।

সকলে একটু অন্যমনা হইয়াছে,—আক্রোশ-ক্ষিপ্ত পার্ব্বতী হঠাৎ এক পদাঘাতে সামনের বাল্‌তিটা এমন জোরে ছুঁড়িল যে, সেটা গিয়া বৃদ্ধের পায়ে সজোরে লাগিল। পা কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। আর্ত্তনাদ করিয়া বৃদ্ধ শুইয়া পড়িলেন।

এতক্ষণ পার্ব্বতীর সব অত্যাচার সহিয়া খন্তর সদয় ভাবে সংযত করিতে চাহিতেছিল,—এবার বুঝিল ভুল করিয়াছে! যে নারী এমন দুর্দ্দান্ত, এত হিংস্র অত্যাচারপরায়ণা,—তাহার সম্বন্ধে ক্ষমা-ধর্ম্ম পালনের অর্থ—তাহার অত্যাচার-স্পৃহাকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র! খন্তরের অমার্জ্জনীয় মূঢ়তা-দোষেই পার্ব্বতীর এত স্পর্দ্ধা! জনসমাজের নিরপরাধ মানুষের উপর কোন উৎপীড়ন করার অধিকার পার্ব্বতীর নাই,—এ সত্যটা কঠোর শাসনে পার্ব্বতীকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল!

ক্ষিপ্ত চিত্তে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া ঘা কতক চড় বসাইয়া দিল। মুহূর্ত্তে পার্ব্বতী স্তব্ধ! নিজের অন্যায় যেন বুঝিল। ক্ষণকাল হতভম্ব হইয়া রহিল!

তাহাকে টানিয়া ঘরে পুরিল, দুয়ারে শিকল তুলিয়া বন্দিনী করিল।

পার্ব্বতী ক্ষিপ্ত আক্রোশে আবার ফুঁসিয়া উঠিল। যত কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল। দুয়ার ভাঙিবার জন্য হাতা বেড়ি খুন্তি লইয়া দুয়ার ঠেঙাইতে লাগিল।

খন্তর কোন দিকে চোখ কাণ দিল না। অনুতপ্ত চিত্তে প্রাণপণ যত্নে আহত বৃদ্ধের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

ডাক্তাররা আসিলেন। খন্তরের ব্যাকুলতায় আগে আহত বৃদ্ধের যথোচিত চিকিৎসা করিলেন। খন্তরের আঘাতগুলা লক্ষ্য করিয়া আফসোস্ করিলেন, অনেক তিরস্কার করিলেন,—এমন দুর্দ্দান্ত পাগলকে সে কোন্ সাহসে ছাড়িয়া রাখিয়াছে? যে এমন নৃশংস আঘাত করিতে পারে, সে ত যে কোন মুহূর্ত্তে স্বচ্ছন্দে মানুষ খুন করিতে পারে!

অনেক সতর্কতায় অনেক কৌশলে পার্ব্বতীকে বন্দিনী করিয়া ডাক্তাররা যথারীতি পরীক্ষা করিলেন। পার্ব্বতীর ভয়াবহ দুর্দ্দান্ততা লক্ষ্য করিয়া ডাক্তাররা স্তম্ভিত হইলেন। বাঁধিয়া রাখার ব্যবস্থা করিলেন।

কয়েক দিন ডাক্তারী চিকিৎসা চলিল, কিন্তু নিষ্ফল। পার্ব্বতীর দুর্দ্দান্ততা এত বাড়িয়া উঠিল যে, চিকিৎসকদের জীবন পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন হইল, খন্তরের অবস্থা বলাই বাহুল্য। দেখা গেল, ক্ষিপ্তের অত্যাচারে সেও দিনে দিনে, মানসিক যন্ত্রণায়, তীব্র আতঙ্কে অর্দ্ধক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে।

ছোট ডাক্তারবাবু টেলিগ্রাম করিয়া জয়পালকে আনাইলেন।

জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ, আসিল। অনেক পরামর্শ অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। অনেকে অনেক মুরুব্বিয়ানা করিল। তন্ত্র মন্ত্র শিকড় বাকড়ের সাহায্যে মানুষের চিত্ত-বিকৃতি দূর হওয়ার লম্বা লম্বা গল্প অনেকে করিল।

ডাক্তাররা বলিলেন, "চিত্ত বিকৃতি তাতে দূর হতে পারে। পারার

বিষদুষ্ট মস্তিষ্ক-বিকৃতি কোন মন্ত্রকে মান্‌বে সে আশা, ভুল। একে পাঠাও—মানসিক চিকিৎসালয়ে। খন্তরের অর্থবল নাই, জনবল নাই। এ দুর্দ্দান্ত অত্যাচারীকে ঘরে রাখলে—হয় কোন দিন খন্তরের প্রাণ যাবে, নয় রোগী বেঘোরে মারা যাবে। নয়·ত জনসমাজ বিপদগ্রস্ত হবে, সেটা উচিত নয়।”

জয়পাল হতাশ হইয়া বলিল, “ঠিক বাবু, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে খন্তরা শুধু প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু রোগীর কোন উপকার করবার ক্ষমতা ওর আর নাই।”

ডাক্তাররা যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া পার্ব্বতীকে মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠাইলেন।

৩৩

বৎসরের পর বৎসর কাটিল। পার্ব্বতীর দুর্দ্দাম উন্মত্ততা আর আরোগ্য হইল না। তাহাকে যথাসাধ্য সুব্যবস্থায় রাখিবার জন্য খন্তর প্রতি মাসে খরচ দিত। মাঝে মাঝে গিয়া দেখিয়া আসিত। কিন্তু আর তাহাকে আনিয়া কাছে রাখিতে সাহস করিল না।

অনেক ইতস্ততঃ করিয়া আত্মীয় বন্ধুগণ বলিল, “খন্তর, ফের বিয়ে কর।”

খন্তর গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, “স্ত্রী বর্ত্তমান। আর ত তোমাদের সামাজিক শান্তিভঙ্গের হেতু নাই।”

“ও কি আর মানুষ আছে?”

“তবু—আছে ত!”

খন্তর লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করিল। শুধু ছাড়িল না ছোট ডাক্তার

বাবুর সঙ্গ। অবকাশ কালে প্রায়ই দেখা যাইত এই দুইটি মানুষ নির্জ্জনে বসিয়া আত্ম-গঠন, চরিত্র-গঠন, জাতি-গঠন তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিতেছেন। কখনও কখনও দেখা যাইত, নিম্ন শ্রেণীর পল্লীতে পল্লীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, ধর্ম্ম ও নৈতিক উন্নতি প্রচারের কাযে দুইজনে একসঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

একে একে কয়জন উচ্চচেতা ধনী ও চরিত্রবান কর্ম্মঠ যুবা আসিয়া তাহাদের দলে যোগ দিলেন। দেখিতে দেখিতে, উদার আদর্শ নিষ্ঠ, সমাজ-সেবা উৎসাহী, এক শক্তিমান কর্ম্মীদল গঠিত হইল। দলের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে লাগিলেন চিরকুমার পবিত্র চরিত্র সদানন্দ ডাক্তার, এবং অল্প শিক্ষিত কঠোর অধ্যবসায়ী, নীরব-কর্ম্মী খস্তর।

ইহাদের প্রধান লক্ষ্য দেখা গেল—মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের চেষ্টায় এবং ভবিষ্যৎ মাতৃজাতির সুশিক্ষা ও সৎপ্রকৃতি গঠনের গভীর অধ্যবসায়ে।

* * * * *

ছয় বৎসর পরে পার্ব্বতীর শোচনীয় জীবনের অবসান হইল। খস্তর সৎকার শেষ করিয়া আসিয়া অবিচলিত শান্ত চিত্তে নিজের নিত্যকর্ম্ম করিতে লাগিল।

সেই সময় ছোট ডাক্তারবাবু পশ্চিমবঙ্গে বদলি হইলেন। খস্তরও তাড়াতাড়ি যোগাড় যন্ত্র করিয়া এলাহাবাদে বদলি হইল।

জয়পাল সংবাদ পাইয়া ব্যাকুল হইল। কাছাকাছির মধ্যে বদলি হইয়া আসিতে খস্তরকে অনেক লেখালেখি করিল। খস্তর সবিনয়ে উত্তর দিল, "সে চেষ্টায় লাভ নাই। এখানে মাহিনা বাড়িয়াছে, স্বাস্থ্য

ভাল আছে, ভগবানের কৃপায় মনের শান্তি বজায় আছে, নির্জ্জনে সাধন-ভজনের সুবিধা পাইয়াছে। অতএব এখান হইতে নড়িতে অনিচ্ছুক।”

জয়পালের দুশ্চিন্তা ঘুচিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বড় ছেলে রামসেবককে সঙ্গে লইয়া একদিন খন্তরের বাসায় উপস্থিত হইল।

কুলি-বস্তির বাহিরে খন্তর বাসা লইয়াছিল। পাশে এক হিন্দু হোটেল। সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া সব সময় সাধন-ভজনে মগ্ন থাকে। প্রতিবেশীদের গুটিকতক ছোট ছেলে ছাড়া, আর কোন বন্ধু বান্ধবকে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না। লোকসঙ্গের ভয়ে পরোপকারের নেশা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। নিতান্ত নিরুপায় কেহ দৈবাৎ সামনে পড়িলে, যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় দেয়। কাহারও সংস্রবে আর নিজেকে জড়ায় না।

সাধুসঙ্গের নেশা? না, সে কৌতূহল আর নাই। যাহা জানার প্রয়োজন ছিল, ভগবান জানাইয়া দিয়াছেন! এখন নির্জ্জনে নিঝঞ্ঝাটে নামানন্দে মগ্ন থাকিতে পাইলে পরম তৃপ্তি পায়। বেশ আছে, কোন অসুবিধা নাই।

দুই ভ্রাতায় অনেক কথা হইল।

জয়পাল লক্ষ্য করিল খন্তরের চারিদিকে যেন এক প্রশান্ত স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করিতেছে। ক্ষোভ, ক্ষতি, দুঃখ, শোক কোন কিছুতে সে দৃকপাত করিতেছে না। শুধু যেন চায়, নিজের মাঝে তন্ময় নিঝুম হইয়া কিছু ধ্যানানন্দে মগ্ন থাকিতে!

অনেক কথার পর জয়পাল বলিল, “খন্তর অনেক দিন হোল। এবার সাগার সম্বন্ধে মনঃস্থির কর ভাই।”

খন্তর যোড় হাত করিল। কিছু বলিল না। চোখ বুজিয়া, মাথা হেঁট করিয়া অন্য চিন্তায় ডুব দিল।

এবার দম্ভ নয়, দর্প নয়,—সবিনয় প্রত্যাখ্যান মাত্র।

জয়পাল পুনশ্চ বলিল, "এখন তোর রোজকার বেড়েছে, স্বাস্থ্য ভাল আছে। বয়সও তেমন হয় নি—"

খস্তর মাথা নাড়িল। ধীরভাবে বলিল, "বয়সের কথা ছেড়ে দাও। বাজে তর্ক। ঢের দেখেছি। মন সংযত রাখ্‌তে পার্‌লে, পূর্ণ যৌবনে সব প্রলোভনের মধ্যে থেকেও মানুষ আত্মজয়ে সক্ষম হয়। কিন্তু অসংযতমনা মানুষ, রোগ শোক জরা বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হয়েও, লালসার তাড়ায় উন্মাদ! লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই। কুবাসনা-বলে নূতন প্রলোভন সৃষ্টি করে, নূতন করে অধঃপতনের পথে ছোটে। আসল কথা—বাসনা, আসক্তি। ঢের শাস্তি ভুগেছি, আর নয়।"

"এমনি সন্ন্যাসী হয়ে থাক্‌বি?"

খস্তর আবার যোড় হাত করিল। ক্ষোভের সহিত বলিল, "কেন অপরাধী কর? সন্ন্যাস,—সে ত মহাভাগ্যবানের সম্পত্তি। আমি অতি হতভাগা, গরীব পতিত, বদ্ধজীব। খেটে খাচ্ছি। সন্ন্যাসের কোন চিহ্নই ত নাই!"

"বাইরের চিহ্নই কি সব? তোর মনের অবস্থা কি বুঝ্‌ছি না? ঠকাবি আমায়?"

প্রণাম করিয়া ভ্রাতার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া খস্তর দীন কণ্ঠে বলিল, "অভিমানের নরক কাঙালের চিত্তে জাগিও না। অহঙ্কারেই— সর্ব্বনাশ। বহুরূপে নারায়ণ সামনে, তাঁর মহিমার চরণে আত্মনিবেদন করে যেন ধন্য হই, অভাগাকে আশীর্ব্বাদ কর। সন্ন্যাসী বল্‌তে হয় ত বল, ওই স্বার্থত্যাগে শক্তিমান, ছোট ডাক্তারবাবুর দলকে। আমি অধম, কাঙাল!"

অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। খস্তর আর বিবাহে স্বীকৃত হইল না।

হতাশ হইয়া জয়পাল বলিল, "কিন্তু তোকে এ অবস্থায় একা দূরে রেখে আমি যে সুস্থির হতে পারছি না। আমার শান্তির জন্যে বল্‌ছি। রামসেবক এখন সাবালক, লেখাপড়া শিখেছে তোরই পয়সায়। এবার খেটে খাবে, কাযকর্ম্ম ওকে শেখা। ও চিরদিন তোর অনুরক্ত, একে রাখ তোর কাছে।"

"জিম্মাদার!" খন্তর হাসিল। বলিল, "কিন্তু আমার কাছে কি শিখ্‌বে? অত লেখাপড়া শিখে শেষে ইঞ্জিনের মিস্ত্রী? না, না।—তোমার খুশীর জন্যে ওর জিম্মায় নিজেকে ছেড়ে দিতে রাজি আছি, কিন্তু ওর খেটে খাবার পথ আরও বড়। কি বল্ রামসেবক?"

রামসেবক এতক্ষণ চুপ করিয়া এক পাশে বসিয়া ছিল। ছেলেটি লেখাপড়া একটু শিখিলেও, নিজের সম্বন্ধে বৃথাগর্ব্ব শিখে নাই। নিজের ওজন বুঝিত। ধীরে বলিল, "খেটে খাবার পথ ছোটই হোক, বড়ই হোক্, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। ভণ্ডামি, জোচ্চুরি, দাগাবাজি, শঠতা, শয়তানি, ধাপ্পাবাজির মালমশলা দিয়ে, এ দুনিয়ায় অনেকেই নিজের অনেক অপরূপ চরিত্র গড়েছে, শুনেছি। তোমার মাঝে দেখ্‌ছি আর একটা—অন্য কিছু। নিজেকে সুস্থ স্বস্থ মানুষ করে গড়ে তোলার পথটাই সব চেয়ে বড় পথ। তোমার পায়ের তলায় বসে সে পথের সন্ধানটা পেতে চাই;—ধন্য হতে চাই।"

"সে কি বাপ্, তুই যে আমার মুরুব্বি!" সস্নেহে ভাইপোকে বুকে টানিয়া লইয়া খন্তর গাঢ়স্বরে বলিল, "আত্ম-গঠনের শিক্ষা চাস? রাখ্ ভগবানে নিষ্কপট নির্ভরতা, ধর সুদৃঢ় পুরুষকার! দেখ্‌বি, ভগবান নিজে পথ দেখানোর ভার নেবেন। এমন সহজ কৌশল আর দেখি নি।"

খন্তর আরও কয়েকটা কথা বলিল। রামসেবক শ্রদ্ধার সহিত পরম আগ্রহে শুনিল।

ঠিক হইল, রামসেবক খন্তরের কাছে থাকিয়া আরও কিছুদিন লেখাপড়া শিখিবে। পরে চাকরি লইবে।

বিদায়ের সময় জয়পাল বলিল, "শোন খন্তর, বলে যাই। মনে রাখিস্, রামসেবক তোরই। ও রোজকার করতে শিখুক, তার পর ইচ্ছা হয়,—ভাল বুঝিস্, বিয়ে দিস্। না হয় দিস্ না।"

সন্ত্রস্ত হইয়া খন্তর বলিল, "না, তা হবে না। নিজেকে সুগঠিত করুক, জীবনের দায়িত্ব জ্ঞানে পাকা হোক, বলিষ্ঠতর সুসন্তান গঠনের দায়িত্বভার ওদের নিতে হবে বৈ কি। জাতের উন্নতিভার ওদের উপর! শুধু একটি কথা, কদাচারী অনাচারীর ঝাড় থেকে দেহ মনে ব্যাধিগ্রস্ত মেয়ে এনো না, বা তেমন বংশে মেয়ে দিও না। তাতে জাতের অধঃপতন।"

"তুই নিজে তল্লাস করে সদাচারী বংশ থেকে স্বাস্থ্যবতী সুবুদ্ধিমতী পুত্রবধূ আনিস্। সে ভার তোর।"

খন্তর হাসিল। অসংসারীর স্কন্ধে সংসারীর দায়িত্ব! আর কেন, আর কেন?

অন্তরে বিবেক বলিল—নিষ্কাম কর্ত্তব্য।

স্নেহময় দৃষ্টিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের নিষ্কলুষ সুন্দর, পৌরুষ-উদ্যম-দীপ্ত, নবীন মুখের দিকে চাহিল। মনে হইল, সামনে ইহাদের অজানা রহস্যময় ভবিষ্যৎ। হয়ত তাহা অনন্ত কল্যাণসম্ভাবনাপ্রসূ, মহান সৌভাগ্যদায়ক। হে নারায়ণ, রক্ষা করিও, যেন ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল রচিত রঙীন ফানুসের রঙের খেলায় ইহাদের চোখ না ধাঁধিয়া যায়, লক্ষ্য না হারায়! স্বপ্রকাশ সত্য-মঙ্গলময় সূর্য্যরশ্মি—বিশ্ব জীবনের সব রূপ, রস, আনন্দ চেতনার মূলে প্রাণশক্তি যোগায়, সে বিজ্ঞানের মর্ম্মরহস্য যেন ইহাদের জ্ঞানগোচর হয়।

চকিতে অন্তরে নূতন চিন্তা চমক হানিল! নিজের জন্যও চাই,—শুধু

ভগবানের রূপের পূজা নয়, শক্তির পূজা। ব্যর্থ বেদনার মূল্যে অতীত জীবনে যে অভিজ্ঞতা কিনিয়াছে,—এই অনভিজ্ঞদের বিবাহিত জীবনের উচ্চতর উচ্চতম উদ্দেশ্য চরিতার্থতায় সহায়তা করিতে,—হয়ত বা তাহাই একটা মহা সার্থকতার ভিত্তি হইবে!

কে জানে কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা!

৩৪

দশ বৎসর পরের কথা।

রাত্রি তিন প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। সহরের কোলাহল স্তব্ধ।

আলোকোদ্ভাসিত বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন। তত রাত্রেও সোরগোলের বিরাম ছিল না। থাকিয়া থাকিয়া ট্রেণ যাওয়া আসার উগ্র উৎকট আওয়াজ, উৎকণ্ঠিত যাত্রীদলের ওঠা-নামার ব্যস্ততা, বিনিদ্র কুলি ও ফেরিওয়ালা দলের ছুটাছুটি হট্টগোল। তার পর কিছুক্ষণের শ্রান্ত বিশ্রাম। —আবার কর্ম্ম কোলাহল, সমানে চলিতেছিল।

এঁদিকের প্লাটফরমের এক প্রান্তে আব্ছায়ায় একটু জন-বিরল স্থানে বেঞ্চিতে থস্তর আধা-শোওয়া অবস্থায় একা বসিয়াছিল। হাতে জপের মালা, মুখে রাত্রি-জাগরণ-শুষ্কতা সত্ত্বেও বেশ একটা প্রশান্ত নিশ্চিন্ত ভাব। কাছাকাছি হট্টগোলের মাত্রা উগ্রতর হইয়া উঠিলে, এক একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। আবার চোখ বুজিয়া নিজের চিন্তায় তন্ময় হইতেছিল।

একখানা ট্রেণ আসিয়া ওদিকের প্লাটফরমে দাঁড়াইল। ব্যস্ত কোলাহলে যাত্রীদল ওঠা নামা করিল। লটবহর লইয়া যে যাহার নিজ পথে চলিল। ষ্টেশনের বাহিরে ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী শেষ রাত্রে বেশী

ছিল না। যে কয়খানা ছিল, তৎক্ষণাৎ যাত্রী জুটাইয়া ছুটিল। বিলম্বে যাহারা বাহিরে পৌছিল, কেহ এক্কা পাইল, কেহ পাইল না। কেহ হাঁটিয়া চলিল, কেহ বা ষ্টেশনে আশ্রয় লইল।

স্যুটকেশ ও লাঠি হাতে এক সুদর্শন বলিষ্ঠ আকৃতির বাঙালী ভদ্র-লোক এদিক ওদিকে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। হঠাৎ খন্তরের দিকে দৃষ্টি পড়িতে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। খন্তর লক্ষ্য করিল না। উদাস দৃষ্টিতে একবার চাহিল মাত্র।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভদ্রলোক চলিলেন, আবার ফিরিলেন। এদিক ওদিকে পায়চারি করিতে করিতে বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খন্তরকে লক্ষ্য করিলেন, শেষে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "ট্যাক্সির আড্ডা কতদূরে ভাইয়া?"

চেনা গলা! খন্তর চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আপনি! ডাক্তারবাবু?"

ত্রস্তে উঠিয়া মালা গলায় ফেলিল। ভূমে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিল।

ডাক্তার হাত ধরিলেন। বেঞ্চে বসিয়া সহাস্যে বলিলেন, "তবু ভাল, হুঁস্ হোল। সামনে দিয়ে কবার আনাগোনা করলুম, চোখোচোখি হোল, গ্রাহ্য নাই! ধাঁধায় পড়লুম। এ কি ব্রহ্মানন্দের নেশা?"

লজ্জিত হইয়া খন্তর বলিল, "ঠাওর পাই নি। বয়সও তো হোল ঢের।"

"কত?"

"পঞ্চাশে ঘা দিয়েছি।"

"বল কি? বছর কুড়িক চুরি গেছে না কি? এই তেজঃপুঞ্জ দিব্যকান্তি দেখ্‌লে যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশের বেশী মনে হয় না। বসে বসে আল্‌সে-কুঁড়ে হয়ে যোগচর্চ্চা করছ বুঝি?"

স্মিতহাস্যে খন্তর বলিল, "কি চর্চ্চা, মালিক জানেন। বাইরে সেই ইঞ্জিন মিস্ত্রী! খানিক আগে খেটে এসেছি, দেখুন কালীর দাগ এখনো সব সাফ হয় নি।"

খন্তর কড়া-পড়া অপরিচ্ছন্ন করতল দেখাইল। বলিল, "কিন্তু আপনাকে পেয়ে যত না হোক, আপনার চেহারা দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। খাসা লম্বা চওড়া যোয়ান হয়েছেন ত।"

"অনেক দুঃখে। ভুঁড়ি আর টাক যোগাড় করে সোজা বাঙালীবাবু সাজব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বরাতে নেই। দেশে আজ 'যিস্‌কা লাঠি উস্‌কা মাটীর' দিন! আত্মরক্ষায় আর্ত্তরক্ষায় বেকুবির সময় নাই। এখানে বদলি হয়ে এসেছ কত দিন?"

"মাস ছয়েক। ভাইপো রামসেবক এখানে টিকিট কালেক্টার। ওখানে ডিউটি খাটছে। তার জন্যেই বসে আছি, কায শেষ করে এখুনি আস্‌বে। এক সঙ্গে বাসায় যাব। ভাগ্যে ছিলাম,···দেখা হোল। তার পর? এখন দিনকতক থাকা হবে ত? এসেছেন কি সরকারী কাযে?"

আকাশ ফর্শা হইয়া আসিতেছিল। ডাক্তার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া বলিলেন, "হুঁ, সরকারীই বটে! তবে···ঐ সরকারের।" চোখের ইঙ্গিতে উর্দ্ধ লক্ষ্যে দেখাইলেন। ত্রস্তে বলিলেন, "তোমার বাসা কত দূরে?"

"কাছেই। চলুন, চলুন—"

"উহুঁ। আমি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আড্ডা নেব।"

"সন্ন্যাসী ভাইরা ত আছেন। আগে এ ফকীরের সদগতি করুন। আমি ছাড়ব না।"

একটু ইতস্তত: করিয়া ডাক্তার অনিচ্ছুক ভাবে বলিলেন, "গৃহীদের

সংস্রব কি এ অকালকুষ্মাণ্ডের পোষায় ? তাঁদেরও অসুবিধা আমাদেরও অশান্তি। বাসায় রামসেবকের পরিবারবর্গ রয়েছেন ত ?”

খন্তর হাসিয়া বলিল, “তাই ভেবেছেন বুঝি ? না, না, আমি পাশে আলাদা বাসায় থাকি। কোন হট্টগোল সেখানে নাই। রামসেবক স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আলাদা থাকে, আমার খাবার পর্য্যন্ত বাসায় দিয়ে যায়। সাধন-ভজনের ব্যাঘাত কি সয় ?”

ডাক্তার উত্তর দিলেন না। অন্যমনে কি ভাবিতে লাগিলেন।

সানুনয়ে খন্তর বলিল, “গরীবের বাসায় থাক্‌তে আপনার কষ্ট হবে, সন্দেহ নাই। তবু কষ্ট দেব—”

নিজের মাথায় হাত বুলাইয়া ডাক্তাব নিম্নস্বরে বলিলেন, “পাঁচ দিন ট্রেণে খেতে ঘুমতে পাই নি। এখন নিরালায় গাছতলায় পড়ে খানিক ঘুমতে পেলে বাঁচি। কষ্টের ভয় দেখাচ্ছ কাকে ? কিন্তু এই অপদার্থ মুণ্ডুটার উপর জনকতক বন্ধুর স্নেহ-দৃষ্টি পড়েছে—”

“দুষ্‌মণ্‌!—”

“আস্তে। সব বল্‌বার সময় পাই ত বল্‌ব। শিকারহারা ক্ষ্যাপা কুকুরের দল চারদিকে ঘুর্‌ছে। তোমার বাসায় গিয়ে তোমাকে শুদ্ধ বিপদে ফেল্‌ব না ত, তাই ভাব্‌ছি!”

খন্তর প্রশান্ত-হাস্যে বলিল, “ওঃ, এই জন্যে! যদি বা সেবাশ্রমে যেতে দিতাম, আর দেব না। শান্তিপ্রিয় সন্ন্যাসীদের শান্তিভঙ্গ ? উহুঁ। চলুন বাসায়। আমার ঘুসি আছে। তা'পর হাতুড়ি, বাটালি, ছুরি, কাটারি সব মজুত।”

“পুলিশকে ফোন করেছি। তবু সতর্কতা চাই।”

টিকিট বিক্রয়ের অফিস্ হইতে বাহির হইয়া দু'জন ফিরিঙ্গী তরুণী তাহাদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে অদূরে একটা ঝটাপটির

শব্দ! চমকাইয়া উভয়ে সেই দিকে চাহিল। দেখা গেল—আর দু'জন ফিরিঙ্গী-কন্যা অন্য দিক হইতে আসিতেছিল। ইহাদের দেখিয়া তাহাদের একজন ত্রস্তে ঝুঁকিয়া সঙ্গিনীর পিছনে লুকাইবার চেষ্টা করিল। ইহাদের এক তরুণী তদ্দণ্ডে ছুটিয়া গিয়া, লুক্কায়িত মেয়েটির জানুর পাশে পা তুলিয়া জুঁতার গোড়ালি দিয়া মৃদু আঘাত করিল। পরক্ষণে উভয় পক্ষে উচ্ছ্বসিত আনন্দে বিদ্রূপ-চপল, সরল তরল হাসি!

কাছাকাছি লোকজনদের মধ্যে কর্ম্মব্যস্তের দল তাহাদের দিকে না চাহিয়া নিজ কাযে গেল। নিষ্কর্ম্মারা কৌতুক-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিল। তরুণীরা কোন দিকে দৃকপাত করিল না। করমর্দ্দন করিয়া যে যার নিজ পথে চলিল।

খস্তর চকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "রঙ্গ করছে! ডিউটিতে আসতে দেরী হলে অমন ঠাট্টা তামাসা চলেই থাকে ওদের। ছেলেমানুষ সব!"

ডাক্তার প্রসন্নমুখে বলিলেন, "কৃষ্ণের জীব! খাসা আছে। ক্ষমতার জোরে খেটে খুটে খাচ্ছে। না কারুর গলগ্রহ, না কারুর মুখাপেক্ষী, না কারুর কাছে বিনা দোষে লাথি ঝাঁটা সইতে বাধ্য! গায়ের জোরে, মনের জোরে, মাথার জোরে,—চৌকশ! বুদ্ধির দোষে নিজে আত্মহত্যা না করলে কার সাধ্য এদের হত্যা করে? কোন অতি বড় দুর্দ্দান্ত গুণ্ডাও এদের 'পরে গুণ্ডামি ফলাতে যায় না। যত অধঃপতন হয়েছে কি আমাদের! আহাম্মক, নির্ব্বোধ, মাথাপাগলা মেয়েগুলোকে যে খুশী ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে, ভীরু দুর্ব্বলের দল থেকে যে খুশী মেয়ে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, যত খুশী ঘৃণ্য অত্যাচার করছে, বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এতটুকু নেই! লক্ষ্মীমন্ত ঘরেও বৌ-ঝিদের উপর অত্যাচারের কসুর নাই, বলি কাকে? গোটাকতক ছাড়া দেখছি বাকী সব মেয়েরা একধার থেকে জড় মাংসপিণ্ডের দল! দেশের ব্রহ্মবল, ক্ষাত্রতেজ, যেন সব মরেছে!

আছে শুধু দৈত্যশক্তি আর মনুষ্যত্বহীন স্বার্থলোভীদের ঘৃণিত পৈশাচিক উৎসব! কি অধঃপাতেই গেছি আমরা!"

ডাক্তারের উত্তেজিত কণ্ঠের আক্ষেপের অর্থ খন্তর ভাল বুঝিল না। প্রসঙ্গান্তরের জন্য বলিল, "বিবাহ ত করবেন না জানি। এখনো কি রেলকোম্পানীর চাকরিতে রয়েছেন? না ছেড়ে দিয়েছেন?"

"না ভাইরা রয়েছেন, উপার্জ্জন ছেড়ে বাউণ্ডুলে হলে চলে না। চাকরিই করছি।"

"কোথা বদ্‌লি হয়েছেন?"

"পূর্ব্ব বঙ্গে।"

"সেখান থেকে হঠাৎ এতদূরে?"

নিম্নস্বরে ডাক্তার বলিলেন, "একদল নারীনিগ্রহকারীর শ্রাদ্ধ করতে। সন্ধান পেয়েছি, এখানে এসে তারা আড্ডা নিয়েছে। বিশ্বনাথ বড় দয়াল, বড় আশ্রিতবৎসল!"

স্নিগ্ধ হাস্যে খন্তর বলিল, "বিশ্বনাথ অবিবেচক ন'ন। আমি জামিন! চলুন তো আমিও যাব। না হয় দুদিন ছুটি নেব।—দেখি ওদের দৌড়।"

"ব্রহ্মানন্দের আরাম?"

"থাক। হয় ত বা তিনিই আমাদের কিছু শিক্ষা পরীক্ষায় কসে মেজে মানুষ করতে চান। মনে পড়ছে, 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্নর" নজির!"

এদিকের প্লাটফরমে আর একখানা ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্তর যাত্রী উঠিল, নামিল। একদল নবীন বাঙালী যুবা সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সাজিয়া নামিল। বিঁড়ি ও এসেন্সের গন্ধে দিক আমোদিত করিয়া মুখে মুখে সিনেমার গল্পে রাজা বাদশা বধ করিতে করিতে চলিল।

তাহাদের শীর্ণ শ্রীহীন মুখ, পরিচ্ছদের আড়ম্বর এবং হেলিয়া দুলিয়া চলনের সৌখিনতা-ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া ডাক্তার হতাশ ভাবে বলিল, "ভ্রমণবিলাসী বাবুর দল! সিনেমা উপাসনায় বিভ্রান্ত আত্মহারা! কত আশা ভরসাই রেখেছিলাম এদের উপর! হা ভগবন্, এরা কবে মানুষ হবে?"

"বাসনা বিক্ষোভে কায কি? যা হাতের মুঠোয় রয়েছে, সেইদিকে মন রাখুন।"

"খন্তর ছাখো ত, চেনা মুখ,—নয়?"

ডাক্তারের দৃষ্টিলক্ষ্যে খন্তর চাহিল। অদূরে গাড়ীর ইণ্টার ক্লাস হইতে এক জরাজীর্ণ ক্ষীণকায়া বৃদ্ধাকে সাবধানে ধরিয়া এক বাঙালী যুবা ও এক বাঙালী মহিলা নামিলেন। সামনের উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে স্পষ্ট দেখা গেল,—বৃদ্ধার ও সেই মহিলাটির বিধবা বেশ। গায়ে নামাবলী, গলায় জপমালা। উভয়ের মুখে প্রশান্ত পবিত্র ভাব। কিন্তু বৃদ্ধা রোগে, বার্দ্ধক্যে শ্রান্ত, নির্জ্জীব। তাঁহার সঙ্গিনী, অল্পবয়স্কা, স্বাস্থ্য-শ্রীমণ্ডিতা, অসামান্যা সুন্দরী। মুখে চোখে যেন কমনীয় লাবণ্য-দীপ্তি ঝরিতেছে।

একজন সরকার-গোছের লোক তাঁহাদের মালপত্র কুলিদের মাথায় চাপাইয়া গেটের দিকে চলিল। যুবা ও সেই মহিলাটি বৃদ্ধাকে অতি যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে আসিতে লাগিলেন।

খন্তর চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু ডলিল। আবার চাহিল। আবার,—আবার। ধীরে বলিল, "বড় ছেলেমানুষ। নইলে···দেখাচ্ছে যেন মনোরমা দিদিমণির মত।"

ডাক্তার বলিলেন, "তোমাকে দেখেও ভেবেছিলাম বুঝি তুমি খন্তরের ছোট ভাই।—সংযম সদাচারের সৌন্দর্য্যই আলাদা।"

তাঁহারা নিকটে আসিলেন। বৃদ্ধা অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া হাঁপাইতে-

ছিলেন। মহিলাটি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মঞ্জু, ঠাকুমাকে একটু বসাও বাবা।"

ডাক্তার ত্রস্তে উঠিয়া বলিলেন, "আসুন, এই একটা বেঞ্চি। বসুন।"

যুবক ধন্যবাদ দিয়া বৃদ্ধাকে বেঞ্চে বসাইল। মহিলাটি কোন দিকে দৃকপাত করিলেন না। বৃদ্ধার পাশে দাড়াইয়া সযত্নে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

খন্তর ও ডাক্তার একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

খন্তর মনোযোগের সহিত যুবককে লক্ষ্য করিতে করিতে বলিল, "বাবুসাহেবকে গয়ায় দেখেছি মনে হচ্ছে। বড়বাবুর অসুখের সময় আপনার কাকিমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন—মনে পড়ে ?"

কৌতূহলী দৃষ্টিতে খন্তরের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া যুবক সানন্দে বলিল, "চিনেছি—খন্তর !—এই যে কাকিমা ! কাকিমা, দেখুন—খন্তর এখানে।"

ডাক্তার অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "শুধু খন্তর নয়, কাকিমার একটি অকালপক্ক বাবা শুদ্ধ এখানে হাজির। মা লক্ষ্মি, চিনতে পারেন ? নমস্কার।"

মনোরমা এবার দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল। প্রশান্ত স্মিত-মুখে বলিল, "ডাক্তার বাবু ? খন্তর ? নমস্কার। বেশ ভাল আছেন ?"

"খুব ভাল। ইনি ?"

"আমার দিদি শাশুড়ী।"

"তাহলে ত আমাদের মা।" ডাক্তার ও খন্তর বৃদ্ধাকে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিয়া উভয়ের মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে বলিলেন "গোপাল আমার !"

উভয় পক্ষে পারিবারিক কুশল বিনিময় হইল। শোনা গেল প্রপৌত্র

মঞ্জুর বিবাহে বৃদ্ধা, নাৎবৌকে লইয়া দেশে গিয়াছিলেন, এবার নিজেদের ভজন কুটীরে ফিরিতেছেন।

বড়বাবুর খবর শোনা গেল, সপরিবারে কুশলে আছেন। কর্ম্মে অবসর লইয়া এখন দেশে গিয়াছেন।

মনোরমা ডাক্তারের উদ্দেশে বলিল, "কাশীধামে এখন আগমনের উদ্দেশ্য কি? বিশ্বনাথ দর্শন?"

"উহুঁ। ক্ষাত্রবল চর্চ্চা। চলুন আগে আপনাদের গাড়ীতে তুলে দিই।"

খন্তরের হাতে সুটকেস দিয়া ডাক্তার ও মঞ্জু সযত্নে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধাকে বাহিরে আনিলেন। মোটরে তাঁহাদের উঠাইয়া দিয়া, ডাক্তার কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একজন পুলিশ কর্ম্মচারী ছুটিয়া আসিয়া ডাক্তারের কাণে কাণে কি বলিল। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া একটা সংক্ষিপ্ত নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ভিড়ের মাঝে হঠাৎ দেখা, কিছু মনে করবেন না মা-লক্ষ্মীরা। হয়ত আবার দেখা হবে, নয়ত এই শেষ। —খন্তর, সুটকেসটা তোমার জিম্বায় রইল, চল্লুম।"

মঞ্জু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "হঠাৎ? কোন দুর্ঘটনা কি?"

"হাঁ। নারীরক্ষা সমিতির কায।—" ডাক্তার বিদ্যুদ্বেগে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

টিকিট কালেক্টারের পোষাক পরা রামসেবক বাহিরে আসিতেছিল। তাহার হাতে সুটকেসটা দিয়া খন্তর সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিল। তার পর যেদিকে ডাক্তার গিয়াছিলেন, সেইদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

মোটর ছুটিল। মঞ্জু আক্ষেপের সুরে বলিল, "আপনারা ঘাড়ে রয়েছেন তাই। নইলে আমিও ওদের সঙ্গে ছুটতাম। আপনার এই অপদার্থ ঠাকুমাটির জন্যে আমার গতি মুক্তির পথ বন্ধ হোল কাকিমা!"

মনোরমা মৃদু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না।

মঞ্জু পুনশ্চ বলিল, "আচ্ছা, বিকালে এসে ধর্‌ছি। টিকিট কালেক্টারের টা দেখে নিয়েছি। খুঁজে বার কর্‌বই।"

বার্দ্ধক্য-স্তিমিত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া বৃদ্ধা ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বেশ াক। কত যত্ন করে বসালে, নিয়ে এল। বাছাদের একটু জলটলও ওয়াতে পেলুম না। হঠাৎ চলে গেল! কোথা গেল?"

মঞ্জু গম্ভীর হইয়া বলিল, "আপনার বিশ্বনাথের খাস কাছারীর কাযে! টা ফুল ছুঁড়ে বিশ্বনাথকে মোহিত কর্‌বে, সে পাত্র ওঁরা নয়। দস্তুরমত থটে, খুশী করেন।"

বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "ওরা কারা?"

স্নিগ্ধ-কণ্ঠে মনোরমা বলিল, "গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের দল।"

সুগভীর তৃপ্তির সহিত উচ্চারিত হইল, "আহা বেঁচে থাক। বিশ্বনাথ মঙ্গল করুন।"

সমাপ্ত